[illegible] [illegible] সংগীত চর্চা (১৮৩০ - ১৯৯০)

[illegible]

M.Phil

[illegible] এম. ফিল্‌, [illegible]
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর - ১৯৯৯

তত্ত্বাবধায়ক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর - ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

382711

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চা (১৮৫০-১৯৯০)

এম.ফিল গবেষণা পত্র

GIFT

Dhaka University Library
382711

গবেষকঃ শ্রী মিন্টু কৃষ্ণ পাল
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর- ১৯৯৯

382711

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্বাবধায়কঃ ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর - ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকারোক্তি

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, বাংলাদেশে 'রাগ সঙ্গীত চর্চা' (১৮৫০-১৯৯০) এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক এ গবেষণা কাজটি করেন নাই। আন্তর্জাতিক কোন পত্র পত্রিকাতে আমি এ অভিসন্দর্ভ পত্রের কিংয়দংশও প্রকাশ করি নাই।

ঢাকা
ডিসেম্বর -১৯৯৯

গবেষকঃ শ্রী মিন্টু কৃষ্ণ পাল
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382711

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা কর্মটি উপস্থাপনে, দিক নির্দেশনা, সকল প্রকার পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। তাঁর অকৃপণ সাহায্য সহযোগিতা আমাকে এই দুরূহ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম।

শ্রদ্ধেয়া নিলুফার ইয়াসমিন ও রেজওয়ানা চৌধুরী (বন্যা) শিক্ষয়িত্রী, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রদ্ধেয় ডঃ কৃষ্ণ পদ মন্ডল, খন্ডকালীন শিক্ষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপক কুমার পাল ও তপন কুমার সরকার এঁরা আমার গবেষণা কার্যে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার এ দুরূহ গবেষণা কর্মে বাংলাদেশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অঙ্গনে বরেণ্য শিল্পীগণ শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ বারীন মজুমদার, ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন (সরোদ), ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি (তবলা), ওস্তাদ খুরশীদ আলম খাঁন (সেতার), ওস্তাদ সেখ সাদী খাঁন (বেহালা), ওস্তাদ শাহাদাৎ হোসেন খাঁন (সরোদ), ওস্তাদ ওমর ফারুক (পরিচালক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, শিল্পকলা একাডেমী), ওস্তাদ পতিত পাবন নট্ট (তবলা ও পাখোয়াজ), শ্রদ্ধেয় শফিউর রহমান (সম্পাদক শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠী), ও রীনাত ফৌজিয়া (সেতার ও প্রভাষিকা)। তাঁদের সঙ্গীত জীবনসহ কথোপকথনের (যা অডিও ধারনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে) মাধ্যমে এই গবেষণা কার্যে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞা স্বীকার করছি।

যেসব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার থেকে আনুসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেছি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী ও নাট্যকলা সঙ্গীত বিভাগের গ্রন্থাগার। এসব প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার এ দুরূহ গবেষণা কর্মে সবসময় উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছে- আমার সহধর্মিণী বীনা রানী পাল ও স্নেহের পুত্র দেবাশীষ পাল ও ডাঃ অসীত বরণ অধিকারী ও তাঁর সহধর্মিনী ডাঃ সবিতা মন্ডল; বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী, নরোত্তম কুমার শীল। এদের কাছে আমি স্বকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাবু নিত্যানন্দ হালদার ও মোঃ মোজাম্মেল হোসেন (বাহার) আমার গবেষণা পত্রটির কম্পিউটার কম্পোজ এবং মুদ্রণ কার্যে সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন, এ জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে আমার অনিচ্ছকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

382711

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভারতীয় সঙ্গীত ‘মার্গ’ও ‘দেশী’ সঙ্গীত হিসেবে জন্মালগ্ন থেকে দু’টি ধারায় প্রবাহমান।‘মার্গ’ সংগীত আজকের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত,‘দেশী’ হচ্ছে লোকজ সঙ্গীত।

বাংলাদেশের রাগ সঙ্গীত ‘হিন্দুস্থানী’ শাস্ত্রীয় (রাগ) সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এ ভারতীয় সঙ্গীত দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকে “দক্ষিণ ভারতীয়” এবং “উত্তর ভারতীয়” হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের অনুশাসনেই সমৃদ্ধ। কিন্তু বাঙ্গালীর ‘রাগ সঙ্গীত চর্চা’ হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে প্রবাহমান। এর নিদর্শন হচ্ছে ‘চর্যাগান’, মধ্যযুগ বা প্রাকমধ্যযুগে জয়দেবের ‘গীত গোবিন্দ’, বড়ু চন্ডীদাসের ‘শ্রী কৃষ্ণকীর্তন’ ও পদাবলী কীর্তন।

চর্যাপদের শিয়রে রাগ-রাগীনির উল্লেখ আছে। রাগগুলির ভিতর ‘পট মঞ্জুরী’ রাগটি বেশী ব্যবহার হয়েছে। এ রাগে ‘পদের সংখ্যা বারটি। তাছাড়া ভারতীয় ‘মার্গ’ সঙ্গীতে ‘বঙ্গাল’ রাগ এক সময়ে খুব সুপরিচিত ছিল এবং অষ্টাদশ শতকে ‘রাজস্থানী’ চিত্র নিদর্শনে ‘বঙ্গাল’ রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কিভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যায়না।

বর্তমান রাগ সঙ্গীতে এখনো প্রচলিত আছে ‘গীত গোবিন্দে’ ব্যবহৃত রাগ। যেমন ঃ ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত, দেশ প্রভৃতি। তবে

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময়ের রাগ রূপায়ন ও বর্তমানে প্রচলিত রাগ লক্ষন একই রকম কিনা তা আর জানা সম্ভব নয়।

'শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনে' সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ 'পাহাড়ীয়া' বা 'পাহাড়ী' এই রাগে রচিত পদের সংখ্যা সাতান্ন।

বাঙালীর 'রাগ সংগীত চর্চা' হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে প্রবাহমান, এ সব নিদর্শনে তা প্রমান করে।

তাছাড়া, ভারতীয় সঙ্গীতের নব জাগৃতির প্রস্তুতি পর্বে এবং বাংলার পটভূমিতে চারজন গুণী পথিকৃৎ, 'রাগ সঙ্গীত'-রূপে প্রচলিত তৎকালীন ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারাকে বাংলার 'রাগ সঙ্গীত' চর্চার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। তা সম্ভব হয়েছিল, বাংলাদেশে টপ্পা-সঙ্গীতে রচনায় রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯), বাংলায় চারতুকের খেয়াল গানের চর্চার প্রবর্তক দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬), রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আনুমানিক ১৭৬১-১৮৫৩) বাংলায় ধ্রুপদ ও 'বিষ্ণুপুর ঘরানার' জনক এবং রাগভিত্তিক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।

এঁদের অবদান 'বাংলা রাগসঙ্গীতে' চিরদিন অম্লান ও অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে রাগ সংগীত চর্চার অনুকূল ও প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া রাগ সঙ্গীত, তথা সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সে ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম ছিল। সাংগীতিক দিক দিয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ব্রাহ্মনবাড়ীয়া সঙ্গীত ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিল, সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর (১৮৮১ জন্মস্থান বলে)। 'সাধু খাঁ' পুত্রগণ সমীরুদ্দীন খাঁ, আফতাবউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খাঁ, আয়াত আলী খাঁ, ও আলাউদ্দিন খাঁ, এ সঙ্গীত পরিবার বাংলাদেশকে বিশ্বের মাঝে পরিচিতি দিয়েছে।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ শুধু শিল্পীই ছিলেন না, ক্রিয়াসিদ্ধির ব্যাপারেও যে তিনি অন্যতম জ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অবশ্য ভাতখন্ডে, রতন জনকার, কৈলাশ বৃহস্পতি, ঠাকুর জয়দেব সিং বা সুরেশ চক্রবর্তী, বিমল রায় প্রমুখ শাস্ত্র পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা অনুচিত। তিনি অনেকগুলি যন্ত্রে পারদর্শীতা অর্জণ করেছিলেন, যখনই যে যন্ত্র বাজাতেন মনে হত যেন সেটি তাঁরই যন্ত্র।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পরিবারের একমাত্র কন্যা ও ছেলে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও কন্যা অন্নপূর্না, জামাতা পন্ডিত রবিশঙ্কর বিশ্বে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতকে 'সেতার' ও 'সরোদ' যন্ত্রের বাদনে সুপরিচিতি এনে দেন এবং ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের মাহাত্ম ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বর্তমান বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধে মাধ্যমে 'স্বাধীনতা' লাভ করে। এর পূর্বে বাংলাদেশ ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান' (১৯৪৭) নামে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত রাষ্ট্র। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৪৭ এর আগে প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

দু'শত বছর বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারত বর্ষের সাথে সংযুক্ত ছিল।

বাঙালী বিশুদ্ধভাবে রাগ সঙ্গীত চর্চা শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তার মূলে ছিল 'বিষ্ণুপুর ঘরনা'। মিঞা তান সেনের পুত্র বংশীয় রবাবীয়-ধ্রুপদীয়া ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ বিষ্ণুপুরে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি শিষ্য গোষ্ঠি তৈরী করেছিলেন। এঁনারা পরবর্তীকালে ঢাকা-জয়দেবপুর রাজ বাড়ীতে, ঢাকার নবাব বাড়ীতে, ত্রিপুরা রাজবাড়ি সহ প্রভৃতি স্থানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার করেছেন। এসব দৃষ্টান্তে অনুপ্রানিত হয়ে জমিদার-প্রধান ময়মনসিংহ জেলার বেশ কিছু জমিদারিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীর চর্চা শুরু হয়। এদের মধ্যে গৌরীপুর রাজ এস্টেট এবং মুক্তাগাছা রাজ এস্টেটের দানবীর জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও মহা সঙ্গীতজ্ঞ পুত্র কুমার বীরেন্দ্রকিশোরের অবদান এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়।

তাঁরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই কলা-কারুকৃতির প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁরাই প্রথম দুজন মহৎ সেনিয়া কলাবন্তকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের জন্য তাঁদের সংগীত দরবারে অধিষ্ঠিত করেন। এঁদেরই আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে অগনিত সঙ্গীতাচার্য শিক্ষকগন প্রয়োজনে অতি দু:খ বরণ করেও এই মহৎ কলাটির প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়েছেন।

বৃটিশ শাসিত ভারতে বাংলা মুলুকের রাগ সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র ছিল কলকাতা, তবে রাজনৈতিক অস্থিতিশিলতার কারনে ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য প্রদেশের গুণী সঙ্গীতজ্ঞগন বাংলাদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ) অবস্থান করেছেন। এ সকল সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তদানিন্তন রাজা ও জমিদারগণ। কিন্তু বৃটিশ শাসনের অব্যাবহিত পরে জমিদার প্রথার বিলুপ্তি ঘটে (১৯৫৩)। তাতে করে রাগ সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে রাগ সংগীত চর্চা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গণমাধ্যম (বেতার, টেলিভিশন, চলচিত্র), সম্মেলন, সংগীত একাডেমী, সংগীতজ্ঞদের ও সঙ্গীত উৎসাহীদের বিশেষ ব্যবস্থায় রাগ সঙ্গীত চর্চা হতে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলোকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে ওস্তাদ বারীন মজুমদার ঢাকায় 'সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ সঙ্গীত 'মহাবিদ্যালয়টি' সরকারী অনুদানে "সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়" নামে খ্যাত। তৎকালীন সময়ে আরো কিছু বেসরকারী সঙ্গীত একাডেমী ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যসব বিভাগের মত 'নাট্যকলা ও সঙ্গীত' বিভাগ খুলেছে। এ বিভাগে সঙ্গীতে অনার্স ও এম.ফিল (গবেষণা) কোর্স চালু করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অনেক দিনের প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করেছে। "বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যোগ প্রসংশনীয়"।

Dhaka

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ১

চর্যাগানে রাগ-রাগিনীর প্রভাব ৪

গীতগোবিন্দ ৮

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ১৩

কীর্তন ১৭

মঙ্গল কাব্য ২৫

পাঁচালী ২৬

শাক্ত পদাবলী ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে টপ্পা সঙ্গীত ও রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) ২৯

বাংলায় চারতুকের খেয়াল ও রঘুনাথ রায় (১৭৫০- ১৮৩৬) ৩৩

বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারা ও রামশংকর ভট্টাচার্য (আনুঃ ১৭৬১-১৮৫৩) ৩৬

রাগভিত্তিক ব্রহ্মসঙ্গীত ও রামমোহন রায় (১৭৭৪- ১৮৩৩) ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে সেকাল ও একাল ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকায় রাগ সঙ্গীত চর্চা ৭২

পঞ্চম অধ্যায়

অঞ্চল ভিত্তিক বাংলাদেশের রাগসঙ্গীত চর্চা

ময়মনসিংহ ১১৯

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ১৫৪

কুমিল্লা ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ২০২
চট্টগ্রাম ২২৭
রাজশাহী ২৪১
সিলেট ২৪৫
বরিশাল ২৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে বরেণ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার (অডিও ধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে) ২৭৭
ওস্তাদ বারীন মজুমদার ২৭৭
ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি (তবলা) ২৮৩

শফিউর রহমান
সাধারণ সম্পাদক, শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠী ২৮৯

ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন (সুরবাহার) ৩০১
ওস্তাদ খুরশীদ খাঁন (সেতার) ৩০৩
ওস্তাদ শাহাদাৎ হোসেন খাঁন (সরোদ) ৩১৫
ওস্তাদ সেখ সাদী খাঁন (বেহালা) ৩১৭
ওস্তাদ ওমর ফারুখ ৩২০
ওস্তাদ পতিত পাবন নট্ট (তবলা ও পাখোয়াজ) ৩২৫
রীনাত ফৌজিয়া (সেতার) ৩৩১

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ৩৩২
সারাংশ ৩৩৬
সহায়ক গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশীয় সংগীতে দু'টি ধারা বহমান। একটি মার্গ অপরটি দেশী। বর্তমানে প্রচলিত রাগ সংগীত বা উচ্চাঙ্গঁ সংগীতকে বলা যায় মার্গ সংগীতের অনুসারী। এই সংগীতকে রাগ রূপায়ন ও সুরের ভূমিকাই মুখ্য, কথার আবেদন সেখানে গৌন।

মূলত: মার্গ ও দেশী এই উভয় ধারাই প্রাচীন কালের গ্রামজাত সভ্যতা থেকে গড়ে উঠেছে। আমরা জানি যে, প্রাচীন বাংলার সংগীত ও সংস্কৃতি পৌন্ড বদ্ধন, বরেন্দ্র, ও রাঢ় ভূমি এই তিনটি জনপদ নিয়ে গড়ে উঠে। এই সময় বাংলাদেশ নানা প্রকার সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতির আগমনে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীত সমন্বয়ের মহত্ব ও মাধুর্যে পুষ্টি লাভ করেছে।

তবে মৌর্য্য যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে চলেছে। বিশেষ করে সর্ব যুগেই রাগ সংগীত ও দেশী সংগীত যেমন পাশা পাশি চলেছে, কথিত যুগেও রাগ সংগীত ও দেশী সংগীত আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল ভাবে চলেছে। বাংলাদেশের আদিম সভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতার যোগযোগ এই সময়েই বাংলা স্থিতি লাত করেও আর্য সংস্কৃতিকে বাংলা আত্মস্থ করে নেয়। এই সময়ে আদিবাসী ও শবরদের দ্বারা 'শবরোৎসব' ও অন্যান্য উৎসব নৃত্যগীতের মাধ্যমে পালিত হতো,

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রাজড়াদের দরবারে বিশিষ্ট কলাবন্তদের দ্বারা রাগসংগীতের চর্চা হতো। বিশেষ করে আদিবাসীদের কিছু সংগীত এই সময়ে রাগ পর্যায়ে উন্নীত হয় ও রাগ সংগীতের প্রভাবে দেশী সংগীত ও ক্রমশ: সমৃদ্ধতর হতে আরম্ভ করে।

আনুমানিক অষ্টম থেকে দশম ও দাদ্বশ শতাব্দী মধ্যে চর্যাগীতি, নাথ-গীতি, চাচর ও হোলি প্রভৃতি কতগুলি গীতরীতির প্রচলন বাংলাদেশে ছিল যার প্রচলন বর্তমানে নেই। চর্যা গীতিকেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলা গান বলা যায় যা ক্রমবিকাশের পথে বর্তমান যুগে পৌঁছেছে সমৃদ্ধতর রূপে। জয়দেব রচিত গীত গোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলীর বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এখানে রাগ রাগিনীর প্রভাব দেখা যায়। গীত গোবিন্দ ও মঙ্গল কাব্য সংশ্লিষ্ট গান রাগ সংগীত হিসাবেই গীত হতো, যে কারনে রাগ সংগীতের প্রভাবেই সেই যুগে বাংলা গানের উপর বেশী ছিল।

বাংলা গানের ক্রম বিবর্তনের ধারাকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন, মধ্য, ও বর্তমান (আধুনিক)। এই প্রসঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙগীতের পাশা পাশি, বাংলা গানের ধারায় খ্রীষ্টীয় ৮ম থেকে প্রায় ১৫শতক চর্যাগীতি গীত গোবিন্দ বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, ও মঙ্গলগীতির কাল। এই কাল বা যুগকে বাংলা গান সৃষ্টির আদি পর্ব বলা যায়। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ আবির্ভাব কালই বাংলা গানের মধ্যযুগ বা বাংলা গানের মধ্য পর্ব এবং রাম প্রসাদ, কমলা কান্ত, নিধুবাবু দাসরথি লালন, রাধা রমন,

Dhaka University Institutional Repository

হাসন রাজা থেকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিগেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, ও কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত যুগকে আধুনিক কাল বা বাংলা গানের আধুনিক পর্ব হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাগানে রাগ-রাগিনীর প্রভাব

ভাষাবন্ধ সংগীত হচ্ছে গান। বাংলাভাষায় রচিত গানকেই আমরা বলি বাংলা গান। প্রাচীন বাংলাগানে যে সব নিদর্শন আমাদের সামনে আছে চর্যাগান তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই গীতাবলী সংগ্রহ করে আনেন।

চর্যাগীতিগুলি যে সুরে গীত হতো তা গীতারম্ভে রাগের উল্লেখ দেখেই বোঝা যায়।

হরপ্রসাদ প্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথিটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এই পুঁথিটি মুনিদত্ত নামে পন্ডিতের সংস্কৃত টিকা সম্বলিত।

চর্যাগীতি রচনাকালনিয়ে মতভেদ আছে। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমান করেছেন "চর্যাপদে আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এগুলির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই পদগুলি রচিত বলে উল্লেখ করেন।

এভাবে চর্যাগীতি রচনাকাল ভাষা, ছন্দ সবকিছু নিয়ে নানা মুন্সির নানা মত থাকলেও একটি ব্যাপারে সবাই একমত।সেটা হচ্ছে রাগ-রাগিনী। চর্যাপদে যে সব রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে সেগুলো হচ্ছে রাগ পটমঞ্জুরী,মল্লারী, গুঞ্জুরী,(গুজুরী বা কাহ্নু-

Dhaka University Institutional Repository

গুজুরী), কামোদ, বরাড়ী, ভৈরবী, গবড়া(গউড়),দেশাখ,রামক্রী, শবরী, অরু, ইন্দতাল, দেবক্রি, ধনসী, মালসী, মালসী-গবুড়া ও বঙ্গাল রাগ।

এদের মধ্যে বেশী ব্যবহৃত পটমঞ্জুরী রাগটি। এই রাগে পদের সংখ্যা বারটি। বাকী রাগ-রাগিনীতে গেয় পদের সংখ্যা এক থেকে চার পাঁচ পর্যন্ত।

যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হত তার মধ্যে পটহ বা ঢোল এবং একতারা ছিল বলে জানা যায়। এই একতারা ও ঢোলকের প্রচলন লোকসংগীতে বিশেষত! বাউল, মারফতি গানে ব্যবহৃত হত। লক্ষনীয় দিক হলো চর্যাগুলিতে রাগের উল্লেখ থাকলেও তালের নির্দেশ নেই। তবে যে তিনটি চর্যা পাওয়া যায়নি তার একটির অনুবাদে 'ইন্দতাল' নামটি পাওয়া যায়। এই ইন্দতাল নাম থেকে অনুমান করা যায় এটি সম্ভবত কোন তালের নাম রাগের নাম নয়। এই সম্বন্ধে সুকুমার সেন মন্তব্য করেন, "ইহা রাগিনীর নাম না হইয়া তালের নাম হইবে বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কি কোন কোন চর্যায় রাগিনীর সঙ্গে তালের নির্দেশ ছিল"। যেমন জয়দেবের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীতনেও পাওয়া যায়।

চর্যাগীতি রাগ এর প্রভাব জয়দেবের "গীতগোবীন্দে" এবং বড়ু চন্ডদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও" লক্ষ্য করা যায়।

রামক্রী গীতগোবিন্দে হয়েছে রামকিরি এবং বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যে হয়েছে দেশাখ। বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যের ধানুষী পরিবর্তিত মাত্র। মল্লারী রাগ মল্লার নামে আজও সুপরিচিত। কৃষ্ণ লীলায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত গুর্জরী রাগই চর্যাতে সম্ভবত কাহ্নু-গুর্জরী । গবড় (গউরা) রাগ সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে লোচন পন্ডিত তাঁর 'রাগ তরঙ্গীনী' গ্রন্থে গৌরী রাগ নামে একটি রাগের উল্লেখ করেছেন। সেই গৌরী শব্দের পরিবর্তিত রূপ গউড়া বা গবড়া হতে পাবে। কিংবা এমনও হতে পাবে যে, সেকালে কাব্যে যেমন গৌরী রীতি বলে একটি বিশিষ্ট রীতির উল্লেখ ছিল তেমনি রাগের মধ্যেও হয়তো একটি ছিল গৌরী রাগ বা সেই গৌরী শব্দের পরিবর্তিত রূপ ।

চর্যাগীতির রাগ সম্পর্কীত আলোচনায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এর বক্তব্য অনুসারে, "সংগীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল রাগ। শবরী রাগতো নিৎসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটি মার্গীকরন কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি। আগে বা পড়ে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে এই রাগটিও যে একসময গুর্জরী মালবশ্রী, বা মালসী, প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকয়ত রাগই ছিল সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ সংগীতে বঙ্গাল রাগ একসময় সুপরিচিত রাগ ছিল এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্র নিদর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্র ও দুর্লভ নয়। পরে কখন কিভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তা জানা যাইতেছেনা। বস্তুত, চর্যাগীতরি দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া, মালসী-গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্নু গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ রাগতো বোধহয় আজকার

Dhaka University Institutional Repository

দেশরাগে বিবর্তিত বা রূপান্তিত হইয়াছে। অরুরাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।"

উপরের আলোচনা সাপেক্ষে আমরা একটি পদকর্তার পদ ও রাগের নাম উল্লেখ সহ নিম্নে আলোচনা করতে পারি।

(চাটিল পাদানাম/রাগ-গুঞ্জরী)

ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী

দু আন্তে চিখিল মাঝেন থাহ ।। ধ্রু ।।

ড:করুণাময় গোস্বামীর "বাংলা গানের বিবর্তন" গ্রন্থটিতে রাগ পটমুঞ্জরিতে চর্যাগীতির স্বরলিপি সহ পাওয়া যায়। পটমুঞ্জরী নামে দুট রাগের প্রচলন আছে, এ আধুনিক কালে। একটি বিলাবল অপরটি কাফি। করুণাময় গোস্বামীর উল্লেখীত চর্যাগীতিটি কাফি ঠাটের নিম্নে দুটি চরন স্বরলিপি দেওয়া হল,

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল

চঞ্চল চী-এ পইঠো কাল।।

রাগ পটমঞ্জরী

।।রা জ্ঞা রা| জ্ঞা মা| জ্ঞা রা| সা রা সা| ণা ধা |পা সা |

কা ০ আ ত রু ব র প ০ ঞ্চ বি ০ ডা ল

|ণ্া সা রা |ণ্া সা| রা প | ধা পা ধা| মা পা| মজ্ঞা রা||

চ ন্ চ ল ০ চী এ পৈ ০ ঠৌ কা ০ ল ০

চর্যাগানের রাগ-রাগিনীর সাথে বর্তমান কালে রাগ রাগিনীর একটা সাদৃশ্য আছে। তবে এ প্রসঙ্গটিতে দ্বিমত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

জয়দেবের "গীত গোবিন্দ"

চর্যাগীতির পর সঙ্গীত শৈলীর অন্যতম নিদর্শন জয়দেবের "গীত গোবিন্দ" আর এই গীত গোবিন্দের গান যে রাগ তাল সহযোগে গীত হত তা গানের শিয়রে উল্লেখ থেকেই জানা যায়।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ শিল্পী আবার তিনিই সাহিত্য তথা সংগীতের প্রধানতম প্রানপুরুষ। বাংলার গানের প্রানের সুরটি তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। একবাক্যে বলা যায় কবির মধুর কোমল কান্ত সংগীতের পথ রেখায় বাঙালি পেল মধ্যযুগের অনন্য সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী।

তবে প্রশ্ন থেকে যায় কবিকে নিয়ে, এটাই বিচিত্র ! জয়দেব কি বাঙালী? জন্মস্থান কি কেন্দুবিল্ব? এ সংশয়ের ঘোর এখনো কাটেনি। তবে গীত গোবিন্দ হতে জানা যায় তিনি ব্রাহ্মনকুলে জন্ম গ্রহন করেন, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব মাতার নাম বামাদেবী।

এখানে সংস্কৃত গ্রন্থ হতে জানা যায় জয়দেবের রাগ-রাগিনীর উপর তাঁর দখল ছির অলৌকিক, পদ্মাবতী ছিলেন অসাধারন। একটি অসাধারন ও অলৌকিক গঠনার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল। বুঢ়ন মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মন রাজসভায় "পটমঞ্জরী রাগে গান গেয়ে তাঁর পান্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে চাইলেন। তাতে অশ্বত্থ বৃক্ষের সমস্ত পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার প্রসঙ্গে পদ্মাবতী রাজ আজ্ঞায় "গান্ধার" রাগ গেয়ে অলৌকিক নিদর্শন স্থাপন করলেন। তাতে গঙ্গার যত নৌকা ছিল সমস্ত রাজভবনের নিকট চলিয়া আসে।

কিন্তু জয়দেব যখন 'রাগ' রাগে গান ধরলেন, তখন নিস্পত্র বৃক্ষে পুনরায় পত্র উদগত হয় এবং তাতে করে ঐ গানে বৃক্ষে কমনীয় নব পত্রাবলী হতে দেখে সকলে জয় জয় ধ্বনিতে উল্লাস করলেন।

গীত গোবিন্দে আছে বারটি স্বর্গ আশিটি শ্লোক আর চব্বিশটি গান আর রাগগুলি যথাক্রমে মালবগৌড়, বসন্ত, রামকিরি, কর্নাট, দেশাখ, দেশে-বরাড়ী, গোন্ডকিরী (গুনকরী), মালব ভৈরবী, বিভাস। পাঁচ তাল হল রূপক, নিরসার,যতি, একতাল এবং অষ্ট তাল। বর্তমান রাগ সংগীতে এখনো প্রচলিত আছে গীত গোবিন্দে ব্যবহৃত রাগ। যেমন ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত, দেশ প্রভৃতি, তবে সেই সময়ের রাগ রূপায়ন ও বর্তমানে প্রচলিত রাগ লক্ষন একই রকম কিনা তা আজ আর জানা সম্ভব নয়। বিভাস রাগ এখন রাগ সংগীতে ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। আবার বাংলাদেশে শুদ্ধ স্বরের 'বিভাস' রাগ আছে যা আমাদের লোকায়ত সুরে বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

গীত গোবিন্দে যে সব তালের উল্লেখ আছে বাংলা কীর্তনে এখনও তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগীতবিদ ভাতখন্ডে বাংলার কীর্তন শুনে বলেছিলেন, "কীতনের তাল সবই দক্ষিনে প্রচলিত।" জয়দেবের মতো লোচন শর্মাও বাংলাদেশে কর্ণাট রাগের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

যে আছে সে কথা 'রাগ তরঙ্গিনী'তে উল্লেখ্য করেন। তা ছাড়া আমরা জানি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষনসেনের সভা কবি।

"গীত গোবিন্দের গান পঞ্চধাতু ছয় অংঙ্গযুক্ত মেদিনী জাতীয়। নিম্নে বিখ্যাত বহু আলোচিত একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল শিয়রে রাগ ও তালের নাম সহ।

(বসন্ত রাগেন-যতি-তালেন চ গীয়তে)

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরে, মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুটীরে।

বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং

সখি বিরহি-জনস্য দূরন্তে।।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে (১৪৩৩ খ্রীঃ) রানা কুম্ভ মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন। জয়দেবের গীত গোবিন্দে রসিক প্রিয়া টীকা রানা কুম্ভের নামে চলছে। রানা বহু রসজ্ঞ পন্ডিতের সাহায্যে এই টীকা সংকলন করেন, "গীত গোবিন্দ গানে তিনি জয়দেব প্রদত্ত সুর ও তালের পরিবর্তে নতুন নতুন সুর ও তাল সংযোগ করেন।

কুম্ভ ব্যবহার করেন ঝম্পা, বনযতি, পতিমন্ড, নি:সারুক, অড্ড, মঠ, রূপকপ্রভৃতি, ত্রিপুটক, পঞ্চজয়মঙ্গল, বিজয় নন্দ এবং জয়শ্রী শাস্ত্রানুমোদিত তাল।

এক্ষেত্রে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ, শ্রী রাজেশ্বর মিত্রলিখিত মহারাজ কুম্ভকর্ন পরিকল্পিত-"শ্রী গীত গোবিন্দ রাগাদির

Dhaka University Institutional Repository

সম্বন্ধে কি বলতে পারিনা। তবে শ্রী গীত গোবিন্দ যেন এইরূপ সম্বন্ধের একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর লক্ষ রাখিয়াই জয়দেব রাগ নির্বাচন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের কারন আছে। সংগীত শাস্ত্রে "রাগের ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় মতবেদ থাকিলেও মূলগত ঐক্যের অভাব নেই।

এই গীত গোবিন্দের প্রাচীন টীকাকার ঋৃতি দাস হইতে পূজারী গোস্বামী পর্যন্ত জয়দেব গৃহিত রাগ মালার যে "ধ্যানের উল্লেক করিয়াছেন তাহার সঙ্গে কবি বর্ণিত সঙ্গীতের বিষয় বস্তুর অতি সুন্দর ভাব সাম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নিম্নে একটি উদাহরন দেওয়া হল।

চতুর্থ স্বর্গে সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রী রাধার বিরহ আকুলতার বর্ণনা করিতেছেন, গানটি "দেশাখ রাগে গেয়।

রাগের রূপ

আস্ফোটনা বিষ্কৃত লোমহর্ষো
নিবদ্ধ সন্নাহ বিশাল বাহুঃ।
ত্রাংশু প্রচন্ড দুগতি বিন্দুগৌরো
দেশাখ রাগঃ কিল মল্ল মূর্ত্তিঃ

অভিপ্রায়ঃ বিরহ যেন এইরূপ মল্লমূর্তিতে আসিয়া প্রচন্ড উৎপীড়নে শ্রীরাধার তনুদেহকে ক্ষীন হইতে ক্ষীনতর করিয়া তুলিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম স্বর্গের প্রসিদ্ধ গান গুজ্জরী রাগে

"রতি সুখ সারে"

<u>গুজ্জরীর ধ্যান</u>

শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমানাং
মৃদুল্লসৎ পল্লব তল্প যাতা ।

শ্রীরাধাকে অভিসারে উদ্বুদ্ধ করিতে ইহার উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য্য ।

শ্রী গীত গোবিন্দের প্রতিটি সংগীতের সঙ্গে রাগের যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সংগীতের ক্ষেত্রে এক উৎকৃষ্ট, সুন্দর শিল্প শৈলির পরিচয় বহন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

বড়ু চন্ডী দাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাগীতির পুঁথি সংগ্রহ করে আনার দু'বছর পর বসন্তরঞ্জন রায় বাকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ থেকে একটি পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন।

পুঁথি খানার আদি ও অন্ত খন্ডিত। তাই কবির দেশ কালের পরিচয় ও গ্রন্থের নাম জানা যায় না। তবে "প্রেমবিলাস গ্রন্থ" থেকে জানা যায় যে, খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে 'কৃষ্ণলীলা' গীত হয়েছিল। এ সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে বসন্তরঞ্জন রায় এ পুঁথির নাম করেন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'।

প্রাপ্ত পুঁথির আকার ১৩১/৪X৩৩/৪ইঞ্চি, দু'ভাজ করা তুলোট কাগজের দু'দিকেই লেখা মাঝখানে ছিদ্র আছে। এখানেও জলের দাগ আছে, অল্পস্বল্প পোকায় কাটা আরশোলায়খেয়েছে, উঁই ধরেছে, কালি অত্যন্ত উজ্জ্বল।

পুঁথিকে সকাল, শ্রীকামাল খাঁ, শ্রীজামাল খাঁ, নিউ খাঁ, ও এক জায়গায় শ্রীগুনরাজ খাঁর স্বাক্ষর আছে। এ স্বাক্ষর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসুর হলে পুঁথির প্রাচীনত্বে সংশয় আমাদের অনেকখানি ঘুচে যায়। মালাধর বসু গুনরাজ খাঁ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

গীত গোবিন্দের সাংগীতিক আদর্শের রাগতালবদ্ধ পদরচনা করেছেন বড়ুচন্ডীদাস। আমরা চর্যাগানে পেয়েছি সতেরটি রাগ গীত গোবিন্দে পেয়েছি নয়টি বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট বত্রিশটি রাগের ব্যবহার দেখা যায়। রাগগুলো হচ্ছে ঃ-আহের, কক্রু, কহু, গুজ্জরী, (গুজরী), কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, গুজ্জরী, দেশবরাড়ী, দেশাখ, ধানুষী, পটমঞ্জরী, পাহাড়ীআ, বঙ্গাল, বঙ্গালবরাড়ী, বরাড়ী, বসন্ত, বিভাস, বিভাসকহু, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, মাহারঠা, রামকিরি, ললিত, শৌরী, শ্রী, শ্রীরামগিরি, সিন্ধোরড়া।

চর্যাগীতিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ পটমঞ্জরী গীত গোবিন্দে প্রযুক্ত হয়নি। তবে বড়ু চন্ডীদাস এই রাগটি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ পাহাড়ীয়া বা পাহাড়ী। এই রাগে রচিত পদের সংখ্যা সাতান্ন, তারপরে রামগিরির স্থান। রামগিরিতে রচিত গানের সংখ্যা চোয়ান্ন, গুজ্জরী বা গুর্জরী রাগে উনচল্লিশ, কোড়া রাগে চৌত্রিশ, ধাণুষী রাগে বত্রিশ, দেশাখ রাগে ঊনত্রিশ, মালব রাগে দশ, ভাটিয়ালি রাগে আট, শৌরী রাগে সাত, শ্রী রাগে সাত, কহু রাগে সাত, কেদার রাগে ছয়, বসন্ত রাগে ছয়, বিভাষ রাগে ছয়, কহুগুজ্জরী রাগে পাঁচ, ললিত রাগে পাঁচ, বরাড়ী রাগে চার, মালবশ্রীরাগে চার, মাহারঠা রাগে চার ও কোড়া দেশাগ রাগে চারটি করে গান রচিত। অবশিষ্ট রাগ সমুহে একটি করে গান রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গীত গোবিন্দে প্রযুক্ত কর্নাট ও গোন্ডকিরি ভিন্ন অন্য সকল রাগ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ব্যবহূত হয়েছে। গীত গোবিন্দের 'রামকিরী ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রামগিরি' সম্ভবত একই রাগ।

চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত রাগের মধ্যে গুর্জরী পটমঞ্জরী বঙ্গাল, বরাড়ী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে বা প্রযুক্ত হয়েছে। চর্যার 'কুহ্নগুঞ্জরী' সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কহু' গুজ্জরী নাম পেয়েছে। এছাড়া চর্যার দেশাখ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেশাখ, চর্যার 'ধনসী' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ধানুষী' চর্যার রামক্রী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'রামগিরি' হয়ে থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণে ব্যবহৃত রাগের মধ্যে সংগীত শাস্ত্রীয় রাগ রেয়েগে যেমন আহের (আভীর)কুকু(কুকুভ) 'রামগিরি' (রামক্রী) 'ধানুষী' (ধনাশ্রী) দেশাগ(দেশাখ) প্রভৃতি। তবে অধিকাংশ রাগই আঞ্চলিক রাগ বলে মনে হয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' রচনা শৈলীতে দেখা যায় মোট পদের সংখ্যা চারশত আঠারটি। এতে ভনিতা মিলে চারশত নয়টি আর বড়ু চন্ডীদাসের একাধিক পদে পাহাড়ী রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে একটি চরণ দেওয়া গেল।

কেন্দার রাগ ঃ রূপকং
কে না বাঁশী বা এ বডায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।

Dhaka University Institutional Repository

এ পদটি বড়ু চন্ডীদাসের বিখ্যাত পদ। এক্ষেত্রে চন্ডীদাসের পদগুলি বাংলায় যেমন প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, তেমনি মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদগুলিও বাংলার মাটির সংগে মিশে আছে।

উৎপল গোস্বামী তাঁর বাংলা গানের বিবর্তন গ্রন্থ বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানানঃ "জয়দেবের পরই যিনি রাধা কৃষ্ণ লীলাকাহিনী নিয়ে গীত রচনা করেন তাঁর নাম বড়ু চন্ডীদাস। তিনি যে গান রচনা করেন তাকে ঠিক বৈষ্ণব গান বলা যায়না। কৃষ্ণ ধামালি নামক একশ্রেনীর ঝুমুর গানের পদ্ধতিতে এ গান রচিত। এই গানগুলির বেশীর ভাগই আদি রসাত্মক। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাদ্যযন্ত্রসহযোগে আসরে দাঁড়িয়ে এই গান গাওয়া হত।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন

কীর্তন বাংলাদেশের ভাব প্রধান এক প্রকার সংগীত। শ্রীখোল, করতার সহযোগে গুরু প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে একজন বা বহুজন মিলে রাধাকৃষ্ণ লীলা, নিতাই গৌরাঙ্গদির লীলা বা ভগবানের প্রার্থনা জানাবার গান। প্রাচীন স্বীকৃত মহাজনের পদাবলী আবৃত্তির মাধ্যমে করা হলে তাকে বলা হয় কীর্তন।

"নাম লীলা গুনাদিনাং উচ্চৈভাষা তু কীর্তনম।

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের দ্বারা, দাপরযুগে পরিচর্যার দ্বারা এবং কলিযুগে হরিনাম কীর্তনের দ্বারা ভগবাণের আরাধনা করতে হবে অর্থ্যাৎ কলিযুগে হরিনাম কীতর্নই একমাত্র ধর্ম।

কীর্তন তিন প্রকার ১। নামকীর্তন ২। লীলাকীর্তন ৩। প্রার্থনা কীর্তন। আমরা কীর্তনে রাগ রাগিনীর ব্যবহার দেখি বিশেষ করে নাম কীর্তনে, প্রভাত কালে ভৈরবী, ভৈরব, ললিত। সন্ধায় পূরবী, ইমন কল্যান, রাতে বাগেশ্রী, বেহাগ ইত্যাদি রাগে। কীর্তন গাওয়া হয়।

কীর্তনের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাব দেখা যায়। স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনে নিধুবনেই জীবনের শেযাংশ কাটিয়েছিলেন এই বৃন্দাবনই আবার প্রাচীন কীর্তনের বিশেষ পীঠস্থান এবং কীর্তন বৈষ্ণবদের আরাধ্য। ধ্রুপদীয়া স্বামী হরিদাস পরবর্তীকালে বৈষ্ণব হয়ে কীর্তন আস্বাদন করতেন নিশ্চয়।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তনের জন্ম যখনই হোক না কেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকেই কীর্তনের নানাবিধ সৃষ্টি কৌশল শুরু হতে থাকে। কীর্তন যদিও কাব্য প্রধান সংগীত তার সৃষ্টি ক্ষেত্রেও রাগ চিন্তার প্রভাব অনেকটা ছিল। হিন্দুস্থানী সংগীতের আলাপ বৃত্তিটাও কীর্তনে প্রয়োগ করা হতো। কীর্তন গানের মূল গানের চরন যখন বিলম্বিত গাওয়া হয়, তখন প্রথম যখন তাকে ধ্রুপদার একটি সংস্করন বলে গন্য করা যায়। অবশ্য রূপগত কিছুটা মিল আছে বলে।

কীর্তন গানে রাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাগ পরিচিতি দশ লক্ষ্যনের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ রাগের বাদী, সমবাদী, পকড় ইত্যাদি তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে রাগের যে রাগ ধারার নিয়ম তার অধীন কীর্তন নয়।

কীর্তনে ব্যবহৃত রাগের লক্ষনগুলি পৃথক গবেষনা সাপেক্ষ। আখড়ের ক্ষেত্রে বিলম্বিত পর্যায়ে যে তাৎপর্য ফুটে উঠে তা হলো এই যে ধ্রুপদের বাট বা উপেজ জাতীয় যে সাংগীতিক সংযোজনা করা হয়ে থাকে কীর্তনের ক্ষেত্রেও বিলম্বিত তালের "আখর" সে ধরনের একটি সংযোজনা মাত্র।

পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী সংগীতে পারদর্শী এ রকম অনেক ব্যক্তি কীর্তন গানে আকর্ষিত হয়েছিলেন। ধ্রুপদ গায়ক পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করে কীর্তন গানে প্রবৃত্ত হন। গিরিধারী দাস নামে যে একজন কীর্তনীয়া বৃন্দাবনে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনিও ছিলেন ধ্রুপদ গায়ক। কীর্তনের আসরে 'তারপুরা' ব্যবহার দেখা যেত। লক্ষনীয় দিক এরা কেউ কীর্তনের স্রষ্টা নন। নিষ্ঠার সহকারে

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন গাইতেন। ফলত তাদের গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। এ প্রসংগে ঝিকর হাটির বনমালী দাস ধ্রুপদীয়ার কথা উল্লেখ করা যায়।

কীর্তন গান হলো 'মীড়' প্রধান। আর হিন্দুস্থানী সংগীত হলো 'দানা' প্রধান।

মহিলা কণ্ঠে বিশেষত বাইজিদের গানে ঢপ গানের গিটকারী এসে যায়। আর বাঙালী টপ্পা গায়কদের অনেকে কিছু কিছু কীর্তন গাইতেন। কিন্তু এদের কণ্ঠে মীড় ও দানার বদলে টপ্পার জমজমা ব্যবহার হতো। এইভাবে কীর্তন গানে রূপ সংকলনের মধ্যে হিন্দুস্থানী উপাদান এসে যায়।

প্রখ্যাত গায়ক কৃষ্ণ চন্দ্রদে, কমলা ঝরিয়া প্রমুখ ব্যক্তিদের কীর্তনে হিন্দুস্থানী সংগীত সংস্কার ফুটে উঠতো। প্রখ্যাত গায়ক হরিদাস কর মৌলিকভাবে কীর্তনিয়া হলেও পরবর্তীকালে সুরেশ চক্রবর্তী, তারাপদ চক্রবর্তী, প্রমুখ হিন্দুস্থানী সংগীত বিদদের সন্নিধ্যে এসে কিছু কিছু হিন্দুস্থানী সংস্কার দ্বারায় প্রভাবিত হন। তবে সমসাময়িক রাধারমন কর্মকার, যামিনী মুখপাধ্যায়, নন্দকিশোর দাস, প্রমুখ একনিষ্ঠ কীর্তনিয়াদের আদি কীর্তন দ্বারা অবিন্যস্তই থাকে।

হিন্দুস্থানী সংগীতে রাগ আছে, আবার কীর্তনেও রাগ আছে তবে রাগ প্রকৃতির উভয় গানে একরকম না।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন গানে বিভায রাগের ব্যবহার আছে। যার আরোহন ঔড়ব ভুপালী বা দেশকারের মত, অবরোহনে নিষাদ ও মধ্যম লাগে, হিন্দুস্থানী সংগীতে বিভাসে লাগে কোমল ঋষভ(রে) এবং জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।

কীর্তনে যে গৌরী রাগ ব্যবহার করা হয় অনেকটা সম্পূর্ন জাতীয় ভৈরবীর মত। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে গৌরী রাগ ভৈরবী ও পূরবী দুঠাটেই আছে।

কীর্তন গানে "চিকন কালিয়া রূপ মরমে লাগিল" গৌরী রাগের এই প্রসিদ্ধ গান অনেকটা ভৈরবী আমেজেই সৃষ্টি হয়েছে।

কীর্তন গানে "বেহাগ" রাগের ব্যবহার, কিন্তু সে বেহাগে কড়ি মধ্যম লাগে না এবং উভয় "নিষাদ" ব্যবহার হয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বিহগড়া এর মত, "রাস" পর্যায়ে অনেক গানে এই বেহাগের প্রয়োগ দেখা যায়।

ভীমপলশ্রী রাগেও কীর্তন শুনা যায়। কিন্তু চলনে ব্যতিক্রম হলো অন্তরাতে গিয়ে শুদ্ধ নিষাদ ও শুদ্ধ "গান্ধার" শুনা যায়। কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে ভীমপ্রলশ্রী কাফিঠাটের ও কোমল গান্ধার ও নিষাদ।

"মল্লার রাগেও কীর্তন শুনা যায়। উভয় নিষাদের ক্ষেত্রে শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার প্রবল। আরোহনে শুদ্ধ গান্ধার ব্যবহার দেখা যায়। দেশাঙগ রাগের ছায়া ফুটে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তনের দেশ রাগ সর্বাধিক প্রচলিত। এখানে উভয় গান্ধার লাগে। "অরুনিত চরণে" এগানটিতে বেলোয়ার নামে রাগের ব্যবহার দেখা যায়। এরাগটি ভুপালী উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ অনেকটা দেশকারের ছায়া আছে।

"বসন্ত" রাগে কীর্তনে ঋষভ, ধৈবত কোমল থাকায় ভৈরবীর প্রভাব বেশী দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুস্থানী বসন্ত রাগের প্রকৃতি আলাদা।

কীর্তনে ভাষাগত, সুরগত,তালগত,ব্যাকরণগত,বিষয়গত এবং পদ্ধতিগত সুনির্দিষ্টতা থাকার দরুন সাংগীতিক দিক থেকে আভিজাত্য পূর্ন এবং আঞ্চলিক হয়েও ক্লাসিক ধরনের গান।

কীর্তনে সাধারনত দশকোশি, লোফা বা জপতাল, তেওট, ব্রহ্মতাল ব্যবহার দেখা যায়।

ব্রজবুলি : ব্রজের বোল সমন্বয়ে শ্রীখোল সহযোগে মুখে বলে বাজানো হয়।

"শ্রী শচী নন্দ পতিত পাবন
নিতাই নিতাই বল ভাই
বল মৃদঙ্গ বাজত তা ঝান-আ ঝন
ঘন ঘন বাজত অদ্বৈত্য কৃতঘন তাই।

বাংলার কীর্তন ও বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে একটা অভিন্ন মিল লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংগীত গ্রন্থ প্রণেতাদের কেউ কেউ কীর্তনকে লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। উভয় সংগীতই গুরু মুখী এবং বাঙালীর ধর্ম সংস্কারের প্রতিফলন আছে।

লোকসংগীতের শিক্ষার দিক থেকে কণ্ঠ সাধন বিষয়টি গৌণ অর্থাৎ শিল্পী তার স্বাভাবিক কণ্ঠ প্রয়োগ করে গান। তেমনি কীর্তনে স্বর সাধনা ব্যাপারটি মুখ্য নয়।

লোকসংগীতে আনুষ্ঠা বিষয়টি মুখ্য। তেমনি কীর্তনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠবদ্ধ সংগীত পরিবেশনায় সরল নাচের ভঙ্গিমা দেখা যায়।

লোকসংগীতের যন্ত্র কীর্তনেও ব্যবহার হয়।

উভয় ভাববহুল ভাব প্রধান গান এবং উভয় প্রকার সংগীতের শ্রোতা সংখ্যক বেশী হলো গ্রামীন জনসাধারন এবং বেশভূষায় উভয়েই নির্দিষ্টতা রক্ষা করেন। সহশিল্পী হিসেবে উভয় সংগীতে আছে।

উচ্চস্বরে গান, দেবমন্দিরে বা ধর্মানুষ্ঠানের গান এই বিচারগুলো অনেকের মনেই উভয় সংগীতের সমতা স্থাপনের অনুপন্থী। তবে কীর্তন অনেকটা সংস্কৃত পন্থায় লেখা এবং পারদর্শীতা অত্যন্ত কীর্তনে বেশী। কীর্তনে রসগত তত্ত্বগত দিকটা অপরিবর্তন যোগ্য এবং বিলম্বিত তাল যা কীর্তনের সাথে ভারতীয় সংগীতের আদি দিকটাই ফুঁটে উঠে এবং রাগ রাগিনীর একটা মিল পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন গানে মুল উপভোগ্য হল শুদ্ধাভক্তি এবং প্রেমতত্তে বিন্যাস।

এখানে বিষয়গত গত দিক থেকে রাধা-কৃষ্ণ, গৌড় নিতাই, এই বিষয়ই এই কীর্তন হয়। কিন্তু লোকগীতিতে শিব, চন্ডী, মনসা, শীতলা, প্রমুখ দেবদেবীর স্তুতি বাচক রচনা নিয়ে গান হয়।

কর্মসংগীত হিসাবে নৌকা বাওয়া, ধানকাটা, মাছধরা ইত্যাদি এই বিষয় সমুহ কীর্তনে স্থান পায় না।

পরবতীকালে কীর্তনের কিছু কিছু উপাদান নিয়ে লোকসংগীতে ব্যবহার হয়েছে। যেমন-গৌষ্ঠগানের মৌলিক ধারা কীর্তনে নিহিত,"শ্রীদাম কহিছে বানী "

লোকসংগীতে হয়েছে "মাগো যশোদে কত বলবো কানাই বিবরণ"।

"ননী চুরি" থেকে কীর্তনের "হে দে ওগো রামের মা,ননী চোর গেলো কোন পথে" লোকসংগীতে "রোহিনীলো সই বলনা ননী চোরা ছাওয়াল গেল কই"।

কীর্তনে রাস পর্যায়ে "চাঁদ বদনী নাচতো দেখি ঠিক এই গানের অপভ্রংশ লোক সংগীতে-সোহাগ চাঁদ বদনীধ্বনী নাচত দেখি"।

উপরের আলোচনায় একটা দিক পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় অজ্ঞতা সারেই কিছু পারস্পরিক বিনিময় হয়েছে তাতে সংগীত ও

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের মিলনের তেমন কোন অপরাধ মুলক বৈচিত্র আসেনি। তবে সাংগীতিক কৌলিন্যের দৃষ্টি ভঙ্গীতে কীর্তন একটি পৃথক এবং উচ্চ পর্যায়ের সংগীতের স্থান দাবী করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল কাব্য

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গঁল কাব্যের যুগ। মঙ্গঁল কাব্যে অনেক রাগ রাগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন বসন্ত, মল্লার, শ্রীরাগ, প্রভৃতি রাগে মঙ্গল গান গাওয়া হতো।

যে গানে মঙ্গঁলকারী দেবতার মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়। যে গান মঙ্গঁল সুরে গাওয়া হয়। যে গান মেলায় গাওয়া হয় তাকেই মঙ্গঁল কাব্য বলে।

সংগীতের দিক থেকে মঙ্গঁল কাব্যগুলিতে গীতরূপের চেয়ে বাদ্যযন্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। যেমন-সানাই,বাঁশী,মৃদঙ্গঁ, শঙ্খ,করতাল,মন্দিরা,রবাব,দোতারা,সেতার,ডম্ফ,খমক,প্রভৃতি। ডম্ফ বা ডফ(ডুবকী) বাংলার বিশেষ প্রিয় বাদ্য যন্ত্র।

তাছাড়া বাঁশী, সেতার দোতারা মন্দিরা প্রভৃতির ব্যবহার বাংলার সংগীতে এখনো সংগত হয়ে থাকে।আর দোতারা যন্ত্রটিতো আমাদের লোকায়াত সংগীতে সমধিক প্রচলিত।

মঙ্গঁল কাব্যে দেব দেবীর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে ভনিতা ব্যবহার করা হতো। কোন কোন সময়ে এর মধ্যে কবির আত্মনিবেদনের ভাবটি সুন্দর ভাবে পুরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমনঃ-

"অভয়ার চরনে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কন গায় মধুর সংগীত।

-মুকুন্দরাম

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচালী

দেবমাহাত্ম্যসূচক কাহিনীধর্মী গান বাংলা পাঁচালী বলে পরিচিত। পদাবলী এবং গান ব্যতিত প্রাচীন বাংলা কাব্য মাত্রই ছিলো পাঁচালী। সম্ভবত: 'পাঞ্চালিকা' থেকে পাঁচালী শব্দের উদ্ভব। মধ্যযুগে পাঁচালী ক্ষুদ্র গীতের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। পাঁচালী গান সাধারণত পঞ্চপদেই সীমাবদ্ধ।

দাশরথি রায় (১৮০২-১৮৫৭) এই পাঁচালী গানে রাগ সংগীতের মাধূর্য এনেছিলেন। এ দিক দিয়ে মধ্যযুগের পাঁচালীর সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের পাঁচালীর মিল আছে।

পাঁচালীকার দাশরথি রায় ললিত, বিভাস, সিন্ধু-ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীতে ও যৎ, ঝাপতালে নিবদ্ধ বহু-পাঁচালী গান রচনা করেছেন। সিন্ধু ভৈরবী রাগে রচিত দাশরথি রায়ের দুটি চরণ উল্লেখ করা হল।

ঐ দেখ আসছে আয়ান বংশীবয়ান বনমাঝে
বিপদে যায়হে জীবন, মধুসূদন, তোমায় ভজে।

পাঁচালী রচনাকারীদের মধ্যে ঠাকুরদাস, দ্বারকানাথ, রসিক চন্দ্র রায়, ব্রজমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, সন্ন্যাসী চক্রবর্তী। তবে পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রভাবশালী ছিলেন দাশরথি রায়।

এ যুগে এখনও বিশেষ করে মহিলারা লক্ষী পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও সত্যনারায়নের পাঁচালী সুরে পাঠ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাক্ত পদাবলী

কীর্তনের সমসাময়িক কালে শাক্ত সংগীতের উৎপত্তি। বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক রূপ যদি হয় কীর্তন, তাহলে শক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ সুরের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার শাক্ত সংগীতে।

বৈষ্ণব পদাবলী যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত, শাক্ত পদাবলী তেমনি শ্যামা বা কালীকে কেন্দ্র করে রচিত। তাছাড়া আছে উমা সম্বন্ধে আগমনী বা বিজয়ের গান।

শাক্ত পদাবলীর সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাম প্রসাদ (১৭১৮-১৭২৩ এর মধ্যে এক সময়ে)নৈহাটির কুমার হট্ট গ্রামে এক শাক্ত বংশে জন্ম গ্রহন করেন। রাম প্রসাদ একাধারে ভক্ত সাধক ও কবি।

রামপ্রসাদের গান রাগসংগীতের ধারাতেও গাওয়া হতো, আবার সহজ, সরল রামপ্রসাদী সুরেও (দেশী সুরে) গীত হত।

"এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা"
এ গানটি কাফি রাগে, যৎ তালে এবং টপ্পার আঙ্গিকে রচিত।

আবার সহজ সরল সুরে রামপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব ঢং এ শ্যামা সংগীত গাইতেন।

"মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

Dhaka University Institutional Repository

রামপ্রসাদ শ্যামা সংগীত, আগমনী বিজয়ের গান ব্যতীত কতগুরি পালা রচনা করেছিলেন। সেগুলি হলো বিদ্যা সুন্দর, কালীকামঙ্গল ও কালীকীর্ত্তন।

রামপ্রসাদের পরেই শাক্ত পদাবলী রচয়িতা হিসাবে যার নাম করতে হয় তিনি সাধক কমলাকান্ত ভট্রচার্য্য। তিনি বর্ধমানে মহারাজা তেজস চন্দ্রের সভায় সভা কবি ছিলেন।

তিনি বহু সংখ্যক আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক গান এবং ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত ও বহুল প্রচলিত গান এখনও গীত হয়। তা হলো

আমার সাধনা মিটিল
আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।

শাক্ত পদাবলীর (শ্যামসংগীত) ধারা করিয়াল, পাঁচালীকার দাশরথিরায় (১৮০২-১৮৫৭) প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরদাপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রবাহিত করে শেষ পর্যন্ত অতি আধুনিক কবি নজরুল ইসলামে এসে পরিনতি লাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলা গানে যে সব নিদের্শন আমাদের সামনে আছে, চর্যাগীতি বা চর্যাগান বা চর্যাপদ তাদের মধ্যে সর্বাগ্রণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের নব জাগৃতির প্রস্তুতি পর্বে এবং বাংলার পটভূমিতে চারজন পথিকৃৎ গুণী রাগসঙ্গীত-রূপে প্রচলিত তৎকালীন ভারতীয় সংগীতের মূল ধারাকে তাঁরা বাংলা সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে যুক্ত করে দেন।

আলোচ্য আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ্য, অষ্টাদশ শতকে শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলার রাগ সংগীত চর্চার ব্যাপক প্রচার প্রসারের সূচনা লগ্নে টপ্পার প্রচলন শুরু হয়।

বাংলাদেশে টপ্পা-সঙ্গীত ও রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)

বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষনে প্রতিভাধর রামনিধি গুপ্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীল মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় রাগ সঙ্গীত চর্চার ব্যাপক প্রসারের সূচনা লগ্নে টপ্পারও প্রচলন শুরু হয়। বাংলায় সেই টপ্পারীতির প্রধান প্রচলন কর্তা রামনিধি গুপ্ত য়িনি নিধু বাবু নামে সমধিক পরিচিত।

ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার মধ্যে বাংলা ভাষায় বলে টপ্পা গানই বিশেষ ভাবে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে সেই সময়ে। বাংলা ভাষার প্রতি নিধুবাবুর সুগভীর শ্রদ্ধাও ছিলো, তাঁর গানে এর পরিচয় পাওয়া যায়,

Dhaka University Institutional Repository

(তিলক কামোদ/তেতালা)

না না ন্ দেশের ভাষা

বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর

ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা আশা।।

চাকুরী সূত্রে বিহারে ছাপরা শহরে বাসকালে নিধুবাবু রাগসংগীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমী টপ্পা আয়ত্ব করেন। তার মধ্যে গোলাম নবী বা শোরী মিঞার টপ্পা প্রধান।

অনেকের ধারনা যে, টপ্পা ছিল পাঞ্জাবের লোকসংগীত। আঠারো শতকের প্রথম দিকে পাঞ্জাবের 'ঝাঙ্গ' জেলার গায়ক গোলাম নবী (মতান্তরে শোরি মিঞা)। সে অঞ্চলের উট চালকদের গানের মধ্যে কারুকাজ দিয়ে উত্তর ভারতীয় রাগগুলির কাঠামো নিয়ে 'টপ্পা' গীত পদ্ধতির সৃষ্টি করেন।

শোরির টপ্পা রাগ, তাল ও ছক বা সাঙ্গীতিক আদর্শ ও আঙ্গিক অনুসরণে নিধু বাবু বাংলা টপ্পা রচনা করেন। কয়েকটি গানের প্রতিতুলনা করা যায় এই প্রসঙ্গে-

ক) শোরির টপ্পা (সিন্ধু খাম্বাজ)

পশ্চিমী টপ্পা (হিন্দুস্থানী)

ও মিঞা বে জানে ওয়ালে (তানু)

আল্লা কি কসম কিরিয়া নয়নুওয়ালে,

নিধুবাবুর টপ্পা

Dhaka University Institutional Repository

কি যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে,

পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে ।............

খ) পশ্চিমী টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পার তুলনা :-

দেখোরি এক বালা যোগী, মেরে

দুয়ার মে খাড়া হায় ।....

নিধু বাবুর টপ্পা

তোমারি তুলনা তুমি প্রান

এই মহি মন্ডলে ।......

নিধুবাবুর টপ্পায় দ্রুত তানের আধিক্য নেই। পশ্চিমী টপ্পায় 'তানের' কাজটা খুব দ্রুত, কিন্তু নিধুবাবু এই 'তানে' একেকটি সুরের উপর একটা আন্দোলনের ভাব সংযোজন করলেন। যাতে করে টপ্পার করুন রসটি মূর্ত হয়ে ওঠে ।

নিধুবাবুর পরে টপ্পা রচনায় যাঁরা বিশেষখ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী দাস চট্রোপাধ্যায় বা কালী মির্জা, রঘুনাথ রায় ও বিষ্ণু পুরের রামশংকর ভট্রাচার্য অন্যতম ।

বাংলা সংগীতের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের মিলন অর্থাৎ কাব্য-ধর্মিতা-বাংলা টপ্পায় সে আস্বাদ পাওয়া যায় ।

টপ্পার মধ্যে প্রাচীন রীতির সঙ্গে নবীনরীতির একটা সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। টপ্পার এই বিরাট প্রভাব(নবীন গীতরীতি ধারা) পরবর্তী যুগেও চলে এসেছে এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ, ডি-এল-রায়, অতুলপ্রসাদের রচনায় টপ্পার স্পর্শ বিজড়িত হয়ে আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

নজ্রুলের দু'একটি গানেও টপ্পার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :-

'যাহা কিছু মম'- যৎতালে নিবদ্ধ গানটি জ্ঞান গোস্বামীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত আছে।

রবীন্দ্রনাথের গীত রচনার একটি পর্যায়ে নিধুবাবু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিধুবাবুর রচনা :-

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,

ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রান দহিল।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় :-

ক্ষমা করো মোরে সখি, শুধায়ো না আর

মরমে লুকানো থাক মরমের ভার'

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক গীতি কবিদের রচিত গানের পর 'টপ্পারীতির' বাংলা গানের প্রবাহ বিলম্বিত এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তা আরো ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছে। আগামীতে বাংলা গানে টপ্পার প্রচলন বা প্রতিফলন কেমন হবে কে জানে। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের গানেই বাংলা টপ্পার রসাস্বাদন করবে বাঙালি চিত্ত !

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় চার তুকের খেয়াল ও রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬)

নিধুবাবু ও কালী মীর্জার সমকালে রাগসঙ্গীতের আর একটি অভিনব রীতি খেয়ালের চর্চা বাংলার অপর এক সঙ্গীতজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায়। কালী মীর্জার তিনি সমবয়সী এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সূচনাও কালী মীর্জার পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের প্রায় সমসাময়িক।

বাংলাদেশে খেয়াল গান চর্চার প্রসঙ্গে রঘুনাতের পুর্ববর্তী কোন সঙ্গীতজ্ঞের কথা জান যায় না। নব জাগৃতির যে প্রস্তুতির পর্ব সে পর্বেই তার নামই প্রথম পাওয়া খেয়াল সম্পর্কে।

কানাইলাল ও মাধবলাল চক্রবর্তী যদি উনিম শতকের প্রথম ভাগে বিষ্ণুপুরে খেয়াল সঙ্গীতের চর্চা করে থাকেন, তবে তারা বাংদেশের আদি খেয়াল গায়ক নন। কারণ বর্ধমানে রঘুনা রায়ের সংগীত-জীবন আরম্ভ হয় তাঁদের অন্তত ত্রিশ বছর আগে।

বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় অবশ্য খেয়াল-গায়ক অপেক্ষা 'চারতুক' বা কলির বাংলা খেয়াল গানের রচিয়তা রূপে অধিক কীর্তিত্ব আছেন।

রঘুনাথকে 'চারতুকের' বাংলা খেয়াল গান-রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন পরবর্তী কালের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সঙ্গীত-তাতিত্বক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রঘুনাথের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রকাশিত স্বীয় গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধায় উক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং স্বরলিপির মাধ্যমে সঙ্গীতের রূপ রক্ষা করবার পক্ষপাতি থাকায় স্বরলিপির অভাবে রঘুনাতের রচিত গীতাবলী বিবৃত ও লুপ্ত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লঘুনাথের যে 'শ্যামবিষয়ক গানের'র কথা বলেছেন তা ছাড়া রচিয়তা বহু কৃষ্ণ বিষয়ক গানও রচনা করেছিলেন।

রঘুনাথের কবিমানসলোকে শাক্ত বৈষ্ণবভাবের এক বিচিত্র সম্বনয়ের সাধিত হয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত বাংলায় বিরল। যুগপৎ তিনি বজনা করেছিলেন শ্যাম ও শ্যামাকে এবং তাই ছিল তার সঙ্গীত রচনার বিষয় বস্তু। তাঁর রচিত তাবৎ গীতাবলির ভাব-প্রেরণা-আধ্যাত্মিক। নিধুবাবু বা কালী মির্জার তুল্য মানবিক আবেদন তাঁর ক্ষেত্রে ছিল না।

রঘুনাথের গান বাংলার নানা স্থানের সংগীত-সমাজে অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উক্ত ভণিতার জন্যে শ্রোতাদের এবং গায়কের কাছেও তিনি গান রচয়িতা রূপে পরিচিত ছিলেন 'অকিঞ্চন' নামে।

রঘুনাথ 'দেওয়ান মহাশয়' নামে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তাঁর রচিত গীতাবলী 'দেওয়ান মহাশয়ের গান' নামে পরিচিত হয়। তাঁর সেই সব গান গায়কদের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে বাংলার নানা অঞ্চলে, উনিশ শতকের প্রায় শেষ-ভাগ পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থের রচিয়তাদের তালিকার তার নামের পরিবর্তে 'দেওয়ান মহাশয়' নামে তার গীতাবলী সংগৃহীত আছে। পুস্তকটি থেকে তাঁর একটি গান উর্দ্ধত করে দেওয়া হলো-

ইমন কলাণ, একতালা
হর উরোপরে কে বিহরে ললনা,
তিমিরবরণ দিগ্ বসনা।।
করে করবাল, বাল শশী শোভে শিরে,
লোলরসনা অতি বিস্তৃত বদনা।।
অসংখ্য দনুজদল সমূলে বিনাশ হল,
শোনিত হিল্লোলে মহী প্রায় যে মগনা।।
মম হৃদি পদ্মাসনে বিশ্রাম লহ শ্যামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারা ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৬১-১৮৫৩)

রাগ সঙ্গীতের প্রাচীনতম তথা বিশুদ্ধ রূপ ও রীতি ধ্রুপদ গান। চার কলিতে নিবদ্ধ ধ্রুপদ সঙ্গীতে রাগ রূপ অবিকৃত ভাবে পরিবেশিত হয়। অচপল, গাম্ভীর্য-মন্ডিত হলেও ধ্রুপদ অলঙ্কার বিহিন নয়। তার সুরের অলঙ্কার সাত প্রকার :-আশ, ন্যাস, মীড়, গমক, মুর্ছনা, স্পর্শন ও কম্পন। ধ্রুপদের তালের অলংকার সাতটি। যথা :- বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত। কিন্তু অলংকৃত হয়েও ধ্রুপদের গতি ঋজু।

স্বরের স্থায়ীত্ব হ'ল ধ্রুপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তার কারণ একমাত্রায় একটি বা দুটির অধিক স্বর সন্নিবিষ্ট হয় না ধ্রুপ গানে। সমগ্রভাবে ধ্রুপদের আছে এক মহিমান্বিত আবেদন।

ধ্রুপদ সঙ্গীত অবশ্য স্থির নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রথমবধি একই আকারে প্রচলিত ছিল না। ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে তারও স্তর আছে।

মধ্য যুগে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ধ্রুপদ সঙ্গীত রীতি একটি সুসংহত রূপ লাভ করে। ওই সময় গোয়ালিয়র রাজ ও 'মান কুতুহল' গ্রন্থের রচয়িতা মান সিংহ তোমর (১৪৮৬-১৫১৭) ধ্রুপদকে নবভাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর দরবারী গুনীদের সহযোগীতায়।

Dhaka University Institutional Repository

মানসিং তোমরের পরে শুধু গোয়ালিয়রে নয়, নানা সংগীত কেন্দ্রে ধ্রুপদের চর্চা বিস্তার লাভ করে। তাদের মধ্যে ডাগর, খান্ডার প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্র ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ।

রাজা মানের মৃত্যুর অর্ধ শতকের মধ্যে স্বনামধন্য তানসেন (আনুমানিক ১৫৫২-১৫৮৭) স্বকীয় দানে ধ্রুপদ গানকে বিশেষ সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করেছিলেন।

তিনি মোগল বাদশা আকবরের দরবারে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকার সময় খ্যাতনামা হন, তেমনি পরবর্তীকালের জন্যেও কীর্তিত থাকেন সরকারী ইতিহাসে বন্দিত হয়ে।

অপর পক্ষেধ্রুপদ চর্চায় নানা কেন্দ্রে এমন সম্প্রদায়ও গুণীদের তাঁর সমকালে অভাব ছিল না যাঁদের গুণপনার কথা রক্ষিত হতে পারেনি তাঁরা দরবারে যোগ না দেওয়ার জন্যে।

বাদশাহী আনুকুল্য ও দরবারী প্রচার ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের সাধনায় তাঁরা মগ্ন থেকেছেন, মঠে, মন্দিরে বা শান্তির নীড় আশ্রমে, শিষ্যদের রাগবিদ্যা দান করেছেন।

সরকারী বিবরণে লিপিবদ্ধ না হয়ে তাঁদের সঙ্গীতধারা রক্ষীত হয়েছে উওর সাধকের জন্যে, প্রানবন্ত থেকেছে সঙ্গীত-জগতের সত্য-শ্রুতি স্মৃতিতে।

এইভাবে স্বীকৃত ইতিহাসের বাইরে ধ্রুপদ সঙ্গীত চর্চার ঐতিহ্য নানা সঙ্গীত কেন্দ্রেও সৃষ্টি হয়েছে, শুধু মোগল দরবারে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেই সব কেন্দ্রের গুণিজন আপন আপন সাধনলব্ধ ধ্রুপদধারা প্রসারিত করে দিয়েছেন অন্যান্য অঞ্চলে, শিষ্য পরম্পরায়।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার পটভূমিতে বিশেষ তাৎপর্য থাকায় প্রসঙ্গটির অবতারনা করা হল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ বিশ বছরে বিষ্ণুপরে যখন ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা প্রবর্তিত হল, সে সময় বাংলার অন্য কোথাও ধ্রুপদ গানের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের কথা জানা যায় না। সঙ্গীতের নব-জাগৃতির প্রস্তুতি পর্যায়ে বাংলায় ধ্রুপদ হল বিষ্ণুপুরের অবদান।

বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত চর্চার ঐতিহ্য বহুকালের। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপর অঞ্চল বাংলার একটি সুপ্রাচীন সঙ্গীত কেন্দ্র। 'মল্লভুমি' বা 'মল্লভূম' নামে পরিচিত এবং মল্ল রাজাদের রাজ্যরূপে আখ্যাত এই স্থান সঙ্গীত ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

এখানে সঙ্গীত চর্চার প্রাচীনতার কথায় এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'মল্লভুম' হ'ল 'মল্লার' রাগের উৎপত্তি স্থল।

সঙ্গীতের নব-জাগৃতিক প্রস্তুতি পর্বে এবং বিশেষ করে তার পূর্ণ বিকাশের যুগে বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে বহু কৃর্তী সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয় বৃহওর বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে। একটি মাত্র অঞ্চল থেকে এত গুণী সমাগমের দৃষ্টান্ত বাংলার অন্যত্র বিশেষ নেই।

আলোচ্য পর্বে বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে বিষ্ণুপুরে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিষ্ণুপুরে যে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারা প্রবর্তিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে তা একমাত্র 'ঘরানা' রূপে সুপরিচিত। বাংলায় অন্যত্র কোন 'ঘরনা' বা সম্প্রদায় প্রবর্তনের উদাহরণ আর দেখা যায়নি।

রামশঙ্কর ভট্টাচারে সময় এবং তাঁরই সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ 'ঘরানা'। বৃহওর সঙ্গীত ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য পূর্ন ধ্রুপদী সম্প্রদায় রূপে বিষ্ণুপুর ঘরনার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিষ্ণুপুর তথা বাংলাদেশের আলোচ্য কালে রামশঙ্করকেই আদি ধ্রুপদ-গুণী রূপে পাওয়া যায়, এবং তাঁর কৃতি শিষ্য মন্ডলীর ধারায় ধ্রুপদ সঙ্গীত-চর্চা বিস্তৃত হয় যা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত।

রামশঙ্কর ও তাঁর শিষ্য পরমপরায় অনুশীলিত সেই ধ্রুপদ সঙ্গীত-রীতি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে কালক্রমে তাই "বিষ্ণুপুর ঘরনা" বা বিষ্ণুপুর সম্প্রদায়-রূপে সঙ্গীত সমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ করে। সেইজন্যে একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে রামশঙ্করের নাম স্মরণীয়।

'বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ' এই নামে স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্যের কারন হ'ল অন্যান্য অঞ্চলের ধ্রুপদের থেকে, কেননা বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ প্রায় গমক-বর্জিত এবং অপেক্ষাকৃত সরল। তা ভিন্ন উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে যে রাগ-রূপ সচারাচর প্রচলিত ও বহুজনগ্রাহ্য, বিষ্ণুপুরী শৈলীতে কয়েকটি রাগে সে বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেহেতু বিষ্ণুপুরের রীতি দৃষ্টান্ত উনিশ শতকের বাংলায় ধ্রুপদ গান অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছে। সেজন্য 'বাংলা ধ্রুপদ' নামে চিহ্নিত গানেও উক্ত শৈলীর লক্ষনাদি পরিস্ফুট হয়। কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

রাগের রূপায়নে বিষ্ণুপুরী রীতির যে স্বাতন্ত্র, সাধারনভাবে বাংলা ধ্রুপদও কোমল নিষাদযুক্ত বেহাগ, পুরবীতে শুদ্ধ ধৈবত, ভৈরব রাগের অবরোহনে কোমল নিষাদের স্পর্শ দেখা যায় এবং বসন্ত আশাবরী, রামকেলী (রামক্রী) প্রভৃতির স্বর-রূপে ও রূপ বিকাশে উত্তর ভারতীয় প্রচলিত রীতির সঙ্গে বা বাংলা ধ্রুপদের পার্থক্য প্রকাশমান।

উক্ত বিষয়ে যথাযোগ্য উদাহরন প্রদর্শন করে স্বামী প্রজ্ঞানান্দ বলেছেন, 'বিষ্ণুপুরে যে ভাবেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অভিজাত গানের প্রচলন হোক না কেন, কতকগুলি রাগের রূপে স্বতন্ত্র বিকাশের ভাব স্পষ্ট'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবনে যে কোন কারনেই হোক বাংলার বিষ্ণুপুরের প্রভাব পড়েছিল এবং তার স্বাধীন স্বতন্ত্র মন বাংলার রীতিকেই যে বিশেষ ভাবে গ্রহন করেছিল এ কথা বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়েও সহজভাবে প্রমান করা যায়। তবে তিনি এটা স্বীকার করেছেন, সৃষ্টির উৎস ছিল পশ্চিমী 'ঘরনার' সঙ্গীত।

উল্লেখ থাকে যে 'রবীন্দ্রনা গানের সবকিছু বিষয় বিষ্ণুপুরী গায়কী পদ্ধতি থেকে গ্রহন করেছেন এবং বিষ্ণুপুর সঙ্গীত পদ্ধতি পরিপূর্ন ভাবে ঋনী পশ্চিমী শিল্পী সম্প্রদায়ের কাছে।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় আদি ধ্রুপদ গান রচিয়তা। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ গান, স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার-প্রসারের বিরাট সফলতা বয়ে আনে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সমধিক খ্যাতনাম ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রামকেশর ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু গোস্বামী অনন্তরাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনাম ধন্য যদু ভট্ট ও প্রথম জীবনে তাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বয়স নিতান্তই অল্প।

রামশঙ্করের খ্যাতনামা শিষ্যদের মধ্যে সম্ভবত সর্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন রামকেশব ভট্রাচার্য (আনুমানিক ১৮০৮-১৮৫০)। তিনি রামশঙ্করের তৃতীয়পুত্র।

রামশঙ্কর বহুসংখ্যক গীতি রচনা করলেও প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরে ছিলেন। তাঁর সময় মুদ্রনের কোন উপায় ছিল না সেখানে।

তাঁর দেহাবসানের পর কিছুকাল তাঁর রচিত গীতাবলী শিষ্যদের কণ্ঠে রক্ষিত থেকে তাঁদের মৃত্যুর পরে ক্রমে বিস্মৃতির অতলে নিমগ্ন হয়ে যায়। কোন কোন সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থে পরবর্তী কালে মুদ্রিত হয় তাঁর কয়েকটি গান।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুর' পুস্তকে রামশঙ্করের কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত ধ্রুপদাঙ্গের গান ঃ

শঙকরাভরন-চৌতাল

তারিনি তপন-তনয়-এাসে কম্পিত কলেবর

ময়ি দুরাচারে কৃপা করি তার নিজ গুনে

Dhaka University Institutional Repository

মিছা দেহ মিছা গেহ তাহে অধিক স্নেহ,
কেহকার নহে ইহা না জানে ।।
আজন্ম শুনিয়া দেখা নানা মত পড়া লেখা,
তথাপি না ঘুচিল ধান্দা মনে ।।
রামশঙ্কর দীন সাধন-ভজন হীন,
উপায় না দেখি আর তুমা বিনে ।

এ রকম সরফদ-ঝাপতাল, রাজ-বিজয়-তেওরা, ভুপালি-পটতাল, ভৈরব-চৌতাল,বাহার-গীতাঙ্গী, ভূপালী-ব্রহ্মতালে বাংলা ও সংস্কৃত ধ্রুপদাঙ্গের গান লেখেন ।

রামশঙ্কর কতৃক তিনখানি বাংলায় রচিত খেয়াল (দু'টি ইমন ও একটি বাহার) গান রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিষ্ণুপুর পুস্তকটিতে সররিপি যুক্ত করে মুদ্রিত করেছেন ।

মৃত্যুর কোলে ঢলে পরার আগে তাঁর ইচ্ছায় তাঁকে মল্লেশ্ব মন্দির প্রসঙ্গে আনা হয় । রামশঙ্করকে ধীরে ধীরে বহন করে আনার পথে গাইছিলেন জীবনের শেষ গান ; সঙ্গীত-সাধক ভক্ত-রূপে জগন্মাতাকে হৃদয়ের সমাপ্তি অঞ্জলি সঙ্গীতে নিবেদন করছিলেন-

কলুষ পূরিত মম কলেবর,
অশেষ কুৎসিত কর্মতৎপর,
স্থির মতি সংসার জলবিম্বে ।।
তব মায়াময় মোহ গর্তে,
অন্ধ অতিশয় নয়ন সত্বে,
শর্করা সম বাস বিষয় নিম্বে ।।

Dhaka University Institutional Repository

তব চরণ কভু মননে নাহি ধরে,

এমনি দুর্মতি রামশঙ্করে

কুরু কৃপাময়ি কৃপা অবিলম্বে।।

বুকের ওপর দুই কর যুক্ত করে রেখে ক্ষীণকণ্ঠে গান-এইভাবে শায়িত অবস্থায় রামশঙ্কর বহুজনের সমক্ষে 'মল্লেশর' প্রাঙ্গণে আনীত হলেন। তারাপর মন্দির চত্বরে তাঁকে নামাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর।

Dhaka University Institutional Repository

রাগ ভিত্তিক ব্রহ্মসঙ্গীত ও রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

ভারতীয় সঙ্গীতের নব জাগৃতির প্রস্তুতি পর্বে এবং বাংলার ভূমিতে এ পর্যন্ত যে চারজন পথিকৃত গুনীকে আমরা পেয়েছি, তাঁদের সঙ্গীত জীবন তথা সঙ্গীতক্ষেত্রে অবদান পরস্পর বিছিন্ন হয়েও একই সূত্রে গ্রথিত।

নিধুবাবু, কালা মীর্জা, রঘুনাথ ও রামশঙ্কর বিভিন্ন অঙ্গে বাংলায় রাগ সঙ্গীত রচনা করে বাংলাদেশে রাগ সংগীত চর্চার প্রসার ঘটিয়েছেন। সেই ধারা সহায়ক রূপে রাম মোহন রায়ের দানকে যুক্ত করা যায়।

রাগের ভিত্তিতে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় প্রবর্তন এবং ব্রহ্মসমাজে উপাসনা কালীন অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ বাংলা রাগ সঙ্গীতে পরিবেশনের ব্যবস্থাও অন্যান্য সংগীতিক কর্ম প্রচেষ্টার জন্যে রাম মোহন রায়ের নাম চিহ্নিত থাকবার যোগ্য। সংগীতে নবজাগরনের ভূমিকা পর্বে।

সাধারন ভাবে অবশ্য সকলেরই জানা আচে। তিনি ছিলেন কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা। কিন্তু তাঁর ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারন তাঁর গীতাবলী রাগ সঙ্গীতরূপে পরিবেশিত হতো এবং সমকালীন রাগ সঙ্গীত চর্চার প্রসারে সহায়ক হয়েছিল।

তাছাড়া, তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় ধারাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে তাঁর সংগীত জীবনের অংশ হিসাবে ধরা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, সঙ্গীত রচনার সঙ্গে তাঁর গুনীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রাগ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গও আছে। এই তিনটি দিক দিয়ে সমগ্রভাবে তার সঙ্গীতজীবনকে সমকালীন সঙ্গীত ক্ষেত্রে পটভূমিতে স্থাপন করলে তার যথোচিত সাঙ্গীতিক মূল্যায়ন সম্ভব।

রামমোহনের সমগ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গের ঘটনাস্থল হ'ল নব জাগতির প্রান কেন্দ্র কলকাতা। পরিণত বয়সে তিনি যখন স্থায়ীভাবে কলকাতা নিবাসী হ'ন তখন থেকে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে কার্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

সংগীতপ্রেমী ও রাগসঙ্গীত চর্চর পৃষ্ঠপোসকরূপে তিনি তৎকালীন করকাতার সংগীত পরিবেশের সাথে যুক্ত ছিলেন।

সংগীত সেবক ও পৃষ্ঠপোষক রামমোহনের 'আত্নীয় সভা' ধর্মীয় আলোচনা সভার গুরুত্ব ছিল অবিস্মরনীয়।

১৮২৮ সালটিতে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকটিও এ সময়ে প্রকশ পায়।

এক্ষেত্রে গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় কৃষ্ঞপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ্য।

এখানে উল্লেখ থাকবে তাঁরা দুই ভ্রাতাই কৃষ্ণ নগর রাজসভার কলাবতদের শিক্ষাধীনে রীতিমত শিক্ষিত পটু গায়ক হয়েছিলেন রামমোহনের সময়।

Dhaka University Institutional Repository

পাখোয়াজ বাদক গোলাম আব্বাস তৎকালীন সঙ্গীত জগতে একজন শীর্ষ স্থানীয় সঙ্গতকার ছিলেন।

বাংলাদেমে বাংলা ধ্রুপদ অঙ্গের গান রচনা ও প্রবর্তনার প্রধান কৃতিত্ব মহাত্মা রামমোহন রায়ের।

ছান্দোগ্য উপনিসদে শ্বেতকেতুর পিতার ব্রহ্ম জ্ঞান দানের প্রসঙ্গে উক্তি আছে। সা দেব সেওম্য অগ্রম আতীৎ এক মেবাদ্বিতীয় তার সঙ্গে তূলনীয় রাম মোহনের রচিত গান ।:

ইমন কল্যান, 'তেওট'
ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান থাকে সে।।
যে রামি এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সেকাল ও একাল

রাগ সঙ্গীতের সেকাল ও একাল প্রসঙ্গে বলা যায়, বেদ উপনিষদের মতোই এক আত্মিক উপলব্ধিতে শাশ্বত রূপে উদ্ভাসিত আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। ছায়াময় এর উৎপত্তির ইতিহাস। পাই শুধু শিব ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুভক্ত নারদের মুখনিসৃত এই সুরসুধারস এমনি কিছু পুরাণ কথা। আর মেলে পরবর্তীকালের তানসেন, বৈজুবাওরা গোপাল নায়ক প্রমুখ শিল্পীর রূপকথাতুল্য কিছু কিংবদন্তী। তবু একথা অনস্বীকার্য, বিদেশী মত সভ্যতা বহুকাল থেকেই ভারতবাসীর দেহমন বারে বারে বাঁধলে ও তার আত্মা সে বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। সে রুদ্ধ করতে পারেনি তার মার্গসঙ্গীতের অমলিন ধারাকে।

কোন কিছুই এতকাল স্পর্শ করতে পারেনি সঙ্গীতের মর্মস্থল। কিন্তু এতোদিনে কি সত্যিই সেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতেও অধ্যায়ন্তর অবক্ষয় আসন্ন? বিদেশী সঙ্গীতের জগতে ক্লাসিক্যাল যুগ পেরিয়ে নিওক্লাসিকাল,রোমান্টিসিজম ইত্যাদি ছুঁয়ে এখন অ্যালিয়েটরি মিউজিকের যুগ। এখানেও কি ভেঙ্গে যাচ্ছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শাশ্বত ভিত্তি? নতুন কিছু করার কথা ভাবছেন নবীনেরা?

রাজা-বাদশা সুলতানদের সমর্থনের পর ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার স্তর ছাড়িয়ে রাগসঙ্গীত পৌঁছে কনফারেন্সের আসরে।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যি কথা বলতে গেলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে বলতে হয় এক সময়ে এই কলকাতা শহরে শীতের মওসুমে ক্রিকেটের চেয়েও অনেক বেশী কদর ছিল সঙ্গীতের। শীত কাল মানেই সঙ্গীতের কাল। পাড়ায় পাড়ায় জমে উঠতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। সারা রাত ধরে গান বাজনা এবং জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল যে মার্গসঙ্গীত স্বাধীনতার পর তার আসরের খানিকটা পরিবর্তন ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর তিন-চার দশক পর্যন্ত বড় বড় জমিদাররা কলকাতায় আসতেন শীত কাটাতে, তাঁদের প্রাসাদে মাইফেল বসতো, সারা ভারত থেকে গানের ওস্তাদ সরোদিয়া-তবলিয়া-সেতারী ও নর্তক-নর্তকীরা আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। সেই সময় কলকাতা হয়ে উঠতো সঙ্গীতের তীর্থ ক্ষেত্র।

স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে জমিদার শ্রেনীর ধন ও মান স্তিমিত হয়ে পরে। বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণ পোষনের দায়িত্ব নিতে তাঁরা অপারগ হলে সেই দায়িত্ব এসে পরে রসিক জনসাধারনের উপর।

মাইফেলের বদলে শুরু হলো মিউজিক কনফারেন্স। উত্তর-পূর্ব মধ্য ও দক্ষিন কলকাতায় সংগঠিত হলো বার্ষিক সঙ্গীতের আসর টিকিট কেটে সেখানে দর্শকের আসেন এবং আশ্চর্যের কথা এক একটি আসরের দিন ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের জন্য কাড়া কাড়ি পড়ে যায়। প্রেক্ষাগৃহে সারা রাত জেগে উচ্চাঙ্গের বাজনা শুনতেও সেই সব শ্রোতাদের আপত্তি নেই। সেই শ্রোতাদের মধ্যে সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

না হোক অনেকেই নিশ্চিত রসবেত্তা পুনরায় বলতে হল একাকী গায়কের গান প্রকৃত শ্রোতা না পেলে সঙ্গীত হয় না। সে সময়ে ভারতের বহু ওস্তাদই স্বীকার করেছেন যে, কলকাতার আসর তাঁদের পক্ষে অগ্নি পরীক্ষা। জমিদারদের বাড়ীর প্রাঙ্গন থেকে বারোয়ারী অঙ্গনে সংগীতের আসার, পরে আরও একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটলো, দেখা গেল, একদিন টিকেট কেটে মন্ডপের মধ্যে বসে গান বাজনা শোনে বটে, কিন্তু তাদের চেয়ে ও বড় একটি দল বাইরে উৎসুক ভাবে ভিড় করে। তাদের টিকিট কাটার সামর্থ নেই কিন্তু সংগীত তৃষ্ণা রয়েছে অনেকখানি। তখন সেই সব শ্রোতাদের জন্য বাইরে মাইক্রোফোন দেওয়া হতো। তাঁরা ফুটপাথে বসে বসে শুনতেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে যোগ দেয়ার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন সে দৃশ্য। ডিসেম্বর জানুয়ারির শীতে শত শত মানুষ ফুটপাতে কম্বল, মুড়ি দিয়ে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছেন বড়ে গুলাম আলি, হীরাবাঈবড়দের গান, আলাউদ্দিন খানের বাজনা শুনতেশুনতে ঠিক এসে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন।

সেই সব কনফারেন্স, ক্রমশ অতি বানিজ্যপনায় আক্রান্ত হয়। বিনা টিকেটের শ্রোতাদের প্রতি উদ্যোক্তারা বিরূপ হয়ে ওঠেন। শিল্পীরাও সম্ভবত তাঁদের রেকর্ড ক্যাসেট বিক্রি কমে যাবার সম্ভাবনায় ঐ ব্যবস্থায় আপত্তি জানান। বাইরে মাইক দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, এখন আর সঙ্গীত মন্ডপের বাইরে কোন ভিড় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়না। কিন্তু তাতে ফল হলো এই, সাধারন মানুষ যাঁদের বেশী টাকা খরচ করে গান শোনার সামর্থ্য নেই, বাইরে বসে, রাত জেগে শুনত। তাঁদের উচ্চাঙ্গঁ সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ বজায় থাকতো। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদেরও কান তৈরী হত। এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সেই সব শ্রোতারা চলে গেল সস্তা গানের দিকে। হিন্দি সিনেমার গান তখন থেকে বাজিমাৎ করতে শুরু করল।

কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে প্রায় অনেকেই মার্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী চিনতেন, কোন গায়কের তাল বা স্কেল নির্ভুল না হলে ভুরু কোঁচকাতেন। এখন আর ও সব নিয়ে কজনই বা মাথা ঘামান। একই পল্লীতে পাচঁটা মাইকে পাঁচরকম বেসুরো গান বাজলেও কেউ আপত্তি করে না। সুরের বদলে এখন অসুরদেরই রাজত্ব। প্রসঙ্গত কারনেই বলতে হয় সেকালের শেষ নেই, আর একালের আরম্ভ নেই। কোন বছরে বা কোন মাসে বা দিনে সেকাল শেষে হল তা জানা যায় না। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অতীত কালের অন্তিমকাল চিহ্নিত করা অসাধ্য আবার তার এ কাল কোন সময থেকে আরম্ভ হয়েছে তাও বলা যায় না।

একাল বা বর্তমানকাল বলতে ঠিক কি পরিমাণ সময়কে বোঝান যায় তা নির্ভর করে প্রসঙ্গত বলা যায়, যারা একালে অতি প্রাচীন হয়েছেন তারা বলেন সেকালে কলকাতায ঘোড়া টানা ট্রাম চলত। এঁদের থেকে যারা প্রাচীন ছিলেন তারা বলতেন, সেকালে গরুর গাড়ীতে বা ঘোড়ায় টানা বা নৌকায় যেতো হত। রেল গাড়ী ছিল না। তা হলে দেখা যায় সেকাল আর একাল এ দুটি শব্দই

Dhaka University Institutional Repository

কোন নির্দিষ্ট কালকে নির্দেশ করছে না। কাল নিরবধি। ঘটনা পরস্পরায় চেতনাই জ্ঞান। মানুষের চার পাশের গন্ডির মধ্যে যে সব ঘটনা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন ঘটায় মানুষ সেই সব ঘটনার কাল দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন কালের পর্ব বিভাগ করে।

ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের জন্ম হয়েছিলো ১৪৫৩ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল এর পর থেকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ইউরোপের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ন কালান্তর। দুশ বছর আগে ফ্রান্সে যে বিপ্লব ঘটেছিল সেটিও ঐ দেশের ইতিহাসের পর্ব বিভাগের সাহায্য করেছে। আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাসের পর্ব বিভাগের জন্য অনুরূপ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাল নির্দেশ করা যায় না।

বহু বিদেশী শক্তির শাসনাধীনে বহু শতাব্দী ভারতবাসীকে জীবনধারণ করতে হয়েছে। তার ফলে ভারতবর্ষের সভ্যতার বহিরাঙ্গ সজ্জিত হয়েছে বিদেশী উপকরনে।

বৈদিক যুগের উত্তরীয় আর অধীবাসি এখন কেবল পূজা ও ধর্মগন্ধী অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকজন ব্যক্তির পরিধেয়রূপে চিহ্নিত, ভারতবাসী এখন চুস্ত পায়জামা, লুঙ্গি, কুর্তা, শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেটে অভ্যস্ত। তার খাদ্যে গব্য ঘৃত্য, মধু উদুম্বর ইত্যাদি বৈদিক পদের নির্দেশ করা যায় না। তার শিক্ষার পাঠক্রমে বেদ উপনিষদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান নেই।

ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে তার পাঠ্যবিষয় ও ছাত্র জীবনের পর্যায়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি এদেশের পূজা

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হারিয়ে সামাজিক আনন্দ উৎসবেই পরিণত হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চীনের চা খেয়ে, ইংরেজের বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফার্সী বাজার বা ইংরেজদের মার্কেট থেকে ফিরে এসে ইংরেজের সেফ্‌টি বেজারে দাড়ি কামিয়ে, পর্তুগীজ বালতিতে ইংরেজী ট্যাপ, থেকে জল নিয়ে স্নান সেরে দক্ষিন আমেরিকায় (আলু অমিত অন্নব্যঞ্জন গলধরঃকরন করে ইংরেজী শার্ট প্যান্ট পড়ে ও স্যু পড়ে নিয়ে ইংরেজদের রিষ্টওয়াচ হাতে বেঁধে, ইংরেজদের দেয়া ফাউন্টেনপেন বুকে গুজেঁ, ইংরেজের সাইকেলে বাসে ট্রামে ট্রেনে, কিম্বা জার্মানী স্কুটারে চেপে ইংরেজের অফিস বা ফার্সী দপ্তরে ভারত বাসীকে যেতে হয়। স্কটল্যান্ডের দ্বারা ম্যাকাডেমের দ্বারা নির্মিত পথ দিয়ে অফিস গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার বা পতুগীজ কেদারায় বসে টেবিল ঘেটে একটা ফাইল নিয়ে তিনি বসেন। দুপুরে ক্যান্টিনে টিফিন বা লাঞ্চ সারেন। বিকালে কোনদিন ইউনিয়নের মিটিং থাকে কিম্বা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটকের জন্য তাঁকে রিহার্সাল দিতে হয়। বাড়ি ফিরে এসে তিনি কয়েক বছর আগে রেডিওটা চালাতেন, এখন টিভির সূইচটা অন করেন। তখন ঘরে ইলেক্ট্রনিক্স বাল্ব জ্বলে গরম কালে মাথার উপর ফ্যান ঘুরে বা এয়ার কন্ডিকশনিং মেশিনটা চলে সময় পেলে। কোন কোন দিন ইভেনিং বা নাইটশোতে সিনেমা দেখে আসেন। অসুখ করলে তাকে এন্টি বায়োটিক ক্যাপসুল ও ভিটামিন খেতে হয়। ইনজেকশনও নিতে হয়। বাড়াবাড়ি হলে হসপিটাল বা নার্সিং হোমে অ্যাডমিশনের তদ্বির

Dhaka University Institutional Repository

করাতে হয়। নৈশভোজনও সাধারণতঃ পর্তুগিজ রুটি খেয়ে সারতে হয়।

ভারতবাসীর দেহমন বহুকাল আগে থেকেই বিদেশী সভ্যতার দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু তার আত্মাকে অন্য কোন সভ্যতা শাসন করতে পরেনি। ভারতবর্ষের আত্মার চিরন্তন ও অম্লানদ্যুতি তার বেদ-উপনিষদের অনুরুপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এবং তার শাস্ত্রীয় সংগীতে বিচ্ছুরিত। শাস্ত্রীয় সংগীতেই উচ্চাঙ্গ সংগীত। এদেশের ইতিহাসে বারবার রাজা বদল হয়েছেন দেখা যায়, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারা আজও অক্ষুন্ন অব্যাহত। রাজনৈতিক সামাজিক, ও অথনৈতিক পরিবর্তন এই সংগীতের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারেনি কেবল উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের অবস্থান ও প্রতিষ্ঠার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে কি উত্তর ভারতের উচচাঙ্গ সংগীত বা হিন্দুস্থানী সংগীত আত্মসাৎ করে এখনও গঙ্গা-গোদাবরী নদীর মত স্রোতস্বিনী ও প্রানোচ্ছেল।

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সেকালের রূপ প্রায় ছায়াময়। তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এখনও একমত হতে পারে। কেউ বলেন শিবের মুখ থেকে কেউ বলেন বহ্মারমুখ থেকে কোথাও বা দেখা যায় যে বিষ্ণুর পরমভক্ত নারদঋষি এই সংগীতের প্রবর্তক।

উৎপত্তির কাল এবং কারণ যেমন অজ্ঞাত সেকালের সংগীতগুনীদের সংগীত চর্চা ও পরিবেশন সম্পর্কে ও আমাদের জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত অসংবদ্ধ সীমিত ও অসংগতিপূর্ণ। সেকালের সংগীত গুনীদের সম্পর্কে কেবল কিংবদন্তী কিছু রূপ কথাই শোনা যায়। যেমন :- তানসেন 'মেঘ রাগ গাইলে বৃষ্টি নামত দীপক রাগ গাইলে আগুন জ্বলে উঠত'। বৈজবাওরা গান আরম্ভ করলে বনের হরিণরা তাঁর কাছে ছুটে আসত, তাঁর গানে পাথর গলে যেত ইত্যাদি।

আবুল ফজল ফৈজী আকবরের দরবারের কয়েকটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের বর্ননা করেছেন সেই বর্ননাও অসম্পপূর্ণ। অন্য দিকে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করতে সাহায্য করেছে। বৈজুবাওরা তানসেন প্রমূখ সংগীত গুনীদের চলচ্চিত্রায়িত রূপ। বৈজু ও তানসেনকে দিয়ে এমন সব গান গাওয়ান হয়েছে তা স্বপ্নেও ওনারা ভেবেছেন কিনা সন্দেহ।

ইতিহাস বলে যে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে ছিলেন। হিন্দুস্তানী সংগীতের কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইমন, বাহার প্রভৃতি রাগ সওয়ারী জাতীয় বিভিন্ন তাল এবং খেয়াল গানের প্রবর্তক তিনি।

হিন্দুস্থানী সংগীতের ঐতিহাসিকদের মতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী খেয়াল গানের আবিস্কর্তা আবার অন্যদের মতে মোঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র দরবারের গায়ক সদারঙ্গ বা নিয়ামত খাঁ খেয়াল রীতির প্রর্বতক। কিন্তু আমীর খসরুর মতই এদের দুজরেন মহফিলের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

খসরু হুসেন শর্কী সদারঙ্গ এর মতে সংগীতজ্ঞরা কোন কোন তালে এবং কেমন লয়ে খেয়াল গাইতেন তাঁদের গানের সঙ্গে কোন

Dhaka University Institutional Repository

কোন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতা ছিল, তার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। সুতরাং হিন্দু রাজা এবং মুসলামান সুলতান বাদশাহের আমলে গানের আসর কেমন ছিল সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করা মনে হয় সমিচীন হবে না।

সেকালের উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা, সুলতান এবং বাদশাহ্‌রা। সঙ্গীতের প্রধান শ্রোতা ও বিচারক ও ছিলেন তাঁরা। অন্যান্য শ্রোতার প্রশংসা বা নিন্দাতে শিল্পীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

আমাদের কাছে এমন কোনো তথ্য এবং প্রমাণ নেই যার থেকে বলা যায় যে পৃষ্ঠপোষক অন্নদাতা রাজা বাদশাহ ছাড়া অন্যান্য শ্রোতার মন্তব্য ও সমালোচনার প্রভাবে সেকালের কোনো হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী তাঁর গায়নশৈলী পরিবর্তিত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত। আমাদের দেশের সংস্কৃতির বিশেষত সংগীতের প্রকৃত ইতিহাস বোধ হয় আজও অলিখিত। আমরা কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠের শিক্ষা পেয়েছি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। সেকাল বলতে যে সময়টি বোঝা যায় তা হল হিন্দুস্তানী কাণ্ঠসংগীতের অবস্থার কথা দুটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় একটি হল আব্দুল হালীম শরর(১৮৬০-১৯২৬) রচিত 'গুজিশতা লখনউ' এবং অপরটি অমিয়নাথ সান্যাল রচিত 'স্মৃতির অতলে'। এরা দু'জনেই তাদের সমকালীন হিন্দুস্তানী সংগীতশিল্পীদের অনুষ্ঠানের বিবরনণ দিয়ে গেছেন সাক্ষত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রোতারূপে। আর তৃতীয় জ্ঞানের উৎস হিসাবে অজয় সিংহ রায় এবং শ্রদ্ধেয় জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ। আব্দুল হলীম শরর ১৮৬০ সালে লৌখনতে জন্মগ্রহন করেন। নয় বছর বয়সে যান কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। তখন ইংরেজ সরকার লখনউ অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে ওখানে বন্দী করে রেখেছিল, শরর ছিলেন একাধারে সাংবাদিক উপন্যাসিক, সমাজ সংস্কারক এবং ঐতিহাসিক। প্রচলিত পক্ষপাতকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না, বরং সযত্নে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে অনন্য সাধারন শবর লিখেছেন "মেটিয়া বুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র দরবারে যে সব গায়ক ও বাদক নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সকলের গান আমি নিজে শুনেছি। এহমদ খাঁ, তাজ খাঁ, গুলাম হোসেন খাঁ, সে সময় বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ছিলেন। দুল্লী খাঁর তখন সারা কলকাতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তার অসামান্য কন্ঠ সম্পদ দিয়ে।

পুরুষ গায়ক ছাড়া কয়েকজন বারবনিতা ও সংগীতে অসাধারন কৃতিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। জোহরা ও মুশতরীর গান ছিল অতুলনীয়।

আসাদউল্লা খাঁ কলকাতায় ভারতীয় সঙ্গীতের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তার ইতিহাস লিপিতে জানা যায়।

ওয়াজিদ আলী শাহ্ লখনউ এর সিংহাসন পান ১৮৪৭ সালে। তার তেত্রিশ বছর আগে লখনউ এর সিংহাসন আরোহন করে ছিলেন গাজা উদ্দন হায়দার। আসাদউল্লা খাঁ লিখেছেন গাজীউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

হায়দারের রাজত্বকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন মহান শিল্পী লক্ষ্মৌ ছিলেন। তাঁর ও নাম ছিল হায়দারী।

ইনি সবসময় অন্যমনস্ক থাকতেন বলে এঁকে সকলে "সিড়ে হায়দারী খাঁ" (ছিটগ্রস্ত হায়দারী খাঁ) বলত থাকতেন গোলাজঞ্জে। গাজীউদ্দীন হায়দারের খুব ইচ্ছে ছিল এর গান শোনার কিন্তু সুয়োগ পাননি কখনো।

একদিন তৃতীয় প্রহরে নবাব পালকি চড়ে নদী তীরে বেড়াতে বেড়িয়েছেন। রুমী দরজার নীচে লোকেরা দেখে কি সিড়ে হায়দারী খাঁ চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহকে নিবেদন করা হয় "কিবলা এ আলম" ইনিই হায়দার খাঁ। নবাব তখনই হুকুম দিলেন। 'বুলাও' সবাই তাঁকে ধরে এনে নবাবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নবাব বলেন-'আরে মিয়া! আমাকে আপনার গান শোনাবেন না ? উত্তর হল "জী হাঁ, কেন শোনাব না? কিন্তু আমি তো আপনার বাড়ি চিনি না"। শুনে নবাব হেসে উঠলেন, বললেন,"আচ্ছা", আমার সঙ্গে চলেন। ছওর মঞ্জিলের কাছে পোঁছিই হায়দারী খাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে। জিজ্ঞাসা করলে, "আমি তো যাচ্ছি, কিন্তু পুরী আর মালাই খাওয়াবেন তো খাওয়ালে তবেই গাইব"। নবাব কথা দিলেন। তারপর মহলে এসে হায়দারী খাঁ নবাবকে গান শোনালেন। কিছুক্ষণ শুনেই নবাব গানের মধ্যে ডুবে তন্ময় হয়ে গেলেন। তাই দেখে হায়দারী খাঁ গান বন্ধ করলেন। চুপ করতে দেখে নবাব তাঁকে আবার গাইতে বললেন। তখন জবাব দিলেন, "হুজুর আপনি যে তামাক খাচ্ছেন তা খুব ভালোই মনে হচ্ছে। আপনি তামাক কোন

Dhaka University Institutional Repository

দোকান থেকে কিনেন"। গাজী হায়দার নিজেও ছিলেন সিড়ী, ছিটগ্রস্ত। প্রশ্ন শুনে তিনি রেগে গেলেন। তখন মোসাহেবরা বলল- "কিবলা এ আলম, এটা একটা উন্নাদ, এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারেনি, কার সঙ্গে কথা বলছে।" নবাবের আদেশ মতো অন্য কামরায় নিয়ে পুরী, মালাই আর তামাক খাওয়াল।

যতক্ষন এই সব কাজ হচ্ছিল নবাব শরাব পান করেছিলেন। নেশা জোর হতেই হায়দারী খাঁকে মনে পড়ল তখনি ডাকিয়ে এনে গানের হুকুম দিলেন। কিন্তু গান আরম্ভ করা মাত্রই থামিয়ে দিয়ে বললেন, "হায়দরী খাঁ শুনছো, তুমি যদি আমাকে কাঁদাতে না পার কেবল খুশিই করতে থাক, তবে তোমাকে গোমতীর জলে ডুবিয়ে দেব"। হায়দরী খাঁ বললেন আল্লাহ মালিক তারপর গাইলেন সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নবাব কাঁদলেন ঈশ্বরের দয়া হল নবাব বললেন, "কি চাও তুমি" হায়দারী খাঁ বললেন, "তিন সত্যি করুন আপনার কাছে আমি যা চাইব তা দিতে হবে"। নবাব সম্মতি দিলেন হায়দারী খাঁ বললেন, "আমাকে আর কখনও ডাকিয়ে পাঠাবেন না। গান ও শুনবেন না"। নবাব বললেন কেন? শেষ উত্তর এল আপনার আর কি আপনি মরে গেলে আরেক জন হায়দারী আসবেন নবাব হয়ে কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে আরেক ডীন হায়দারী জন্মাবে না। এ জবাব শুনে গাজীউদ্দন হায়দার মন ভার করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

শবর ও আসাদউল্লা খাঁ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৮৭ সালে ওয়াজিদআলীশাহর মৃত্যুপর্যন্ত হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেবল রাজা বাদশাহ, নবাবরা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী চিকিৎসক আইনজীবীরাও তখন শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। কট্টরপন্থী ঔরঙ্গজীবের প্রসঙ্গে বলা যায় তার সময়ে সংগীত চর্চা হত,

(১৯০০-১৯৩৪) অমিয় নাথ স্যানাল রচিত-"স্মৃতির অতলে" বইটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে এই শতকের শুরু থেকে তৃতীয় শতক পর্যন।

বইটিতে মৌজুদ্দিন ফৈয়াজ খাঁ, ও কালে খাঁ সাহেবের একাধিক জলসার বিবরণ আছে। মৈজুদ্দিন সংগীত পরিবেশন করার আগে দু'দশটা ডন-বৈঠক সেরে গোসল করেন, তার পর কিছু পুরি হালুয়া সেবন করে। বিশুদ্ধতান্ত্রিক মতে কণ্ঠশুদ্ধি করেন। "সুপনেমে আয়ে পিয়া" গানটি তিনি গাইতেন, ঢিমা তালে। ববং এর সম এসে পড়ত খাদের কড়ি মধ্যমে। মৌজুদ্দিনের গান শুনে মনে হতো গলায় কোন যন্ত্র লাগানো আছে। অমিয়নাথ স্যান্যাল লিখেছেন, মৌজুদ্দিন অন্যান্য শিল্পীদের গাওয়া গানগুলিই আসরে গাইতেন। রাজেশ্বরী হুস্না প্রমুখ খ্যাতনামী শিল্পীগণ মৈজুদ্দিনের মুখে তাদের গান শোনার পর নিজেরা আর গাইতেন না। সেকালের শিল্পীদের মধ্যে শ্রোতারা লড়াই বা দঙ্গল বাধিঁয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। অনুরূপ ঘটনা-"স্মৃতির অতলে-ফৈয়াজ খাঁ প্রসঙ্গে।

'তন্নুললজীর জবানীতেই বলা যাক সিংজী নাচ গানের জলসা দিলেন একরাতে খবর এলো আগ্রাওয়ালী মালকা ও তাঁর মা এসে পড়েছেন দিল্লীতে। আরও এসেছে ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আব্বাসের নাতি, সেই ঘরের উঠন্ত গাওয়াইয়া। সিংজী বিশেষ করে নিমন্ত্রন

Dhaka University Institutional Repository

করলেন গহর আর তার মাকে। গহর উপস্থিত থাকতে বড়ঘরের জলসায় গহরের নিমন্ত্রণ না হলে সেই ঘরেরই বদনাম হত। গহরের এত নাম তখন। মজলিসে মালকা গান আরম্ভ করলেন, সেকালের গম্ভীর কায়দায়, তম্বুরা কোলে নিয়ে দুদিকে বসল সারেঙ্গীরা দু'জন আর পিছনে তবলচি মালকা শুরু করলেন ধামার দিয়ে সেকালের বাঈজীরা ঐ রকম গান লিখতেন।

১৮৮৭ সালে ওয়াজিদ আলী শাহর মৃত্যুর পর ১৯৩৪ সাল থেকে কনফারেন্সের যুগ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সেকালের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সংগীত সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। সেকালের এই পর্বে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ও আসরের উদ্যোক্তাগন ছিলেন জমিদার ও ব্যবসা বানিজ্য সূত্রে কয়েকজন ধনী ব্যক্তি। যেমন গয়ার গোবিন্দলাল সিজুয়ার দিল্লীর সিংজা, এবং ভারতবর্ষের কয়েকজন জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের বোদ্ধা ছিলেন এবং শিল্পীদের ও যথোচিত সমাদর করতেন শিল্পীদেরও সাথে শ্রোতৃবৃন্দের সম্বন্ধ ছিল অন্তরঙ্গ। শিল্পীরা নিজের পছন্দ মত গান দিয়ে পরিবেশনা শুরু করতেন। পরে কিছু গান শ্রোতাদের অনুরোধে গাইতে কোন শিল্পীর পারিশ্রমিক বা সম্মান দক্ষিনার হার নির্দিষ্ট ছিলো না এবং সংগীত পরিবেশনের কোন নির্ধারিত সময় ছিল না, ববং আরম্ব হওয়ার কোন সঠিক সময়ও ছিল না। (১৯৩০-১৯৭৫) এই সময়টাকে কনফারেন্সের যুগ বলা হয়। এ কালেও উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত এবং সংগীত শিল্পীরা সাধারণত কনফারেন্সের ও পরেই নির্ভরশীল। ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত“অল বেঙ্গল” মিউজিক

Dhaka University Institutional Repository

কনফারেন্স এবং এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত "এলাহাবাদ" মিউজিক কনফারেন্সকে এবং এই যুগের সূচনা রূপে বিবেচনা করা যায়।

প্রথমটির প্রধান উদোক্তা ছিলেন ভুপেদ্র কৃষ্ণ ঘোষ, দ্বিতীয়টির দক্ষিণাঞ্জন ভট্টাচার্য ।

সেকালের তৃতীয় পর্বে দামোদরদাস খান্না বা লালাবাবু আয়োজিত "অল-ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স", এন্টালী কালচারাল কনফারেন্স, "তানসেন সংগীত সম্মেলন",সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন বা ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের প্রকৃতি এক ছিল না।

১৯৩৪ সালে প্রথম "অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স" অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সিনেট হলে। উদ্বোধন করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অল বেঙ্গলের মত, অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের প্রাণ পুরুষ ছিলেন দামোদরদাস খান্না বা লালবাবু।

পরবর্তীকালের সম্মেলনগুলিতে লক্ষ করা যায় যে, মাত্র একজন ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে সম্মেলনের ব্যয়নির্বাহ হয়নি। তানসেন, সদারঙ্গ,ডোভারলেন, প্রভৃতি মিউজিক কনফারেন্সগুলি পরিচালনার দায়িত্ব একজন বা দুইজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকলেও কেবল তাঁদেরই অর্থ সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ধনী ব্যক্তিদের দানে এবং টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থে এই সব কনফারেন্সের ব্যয় নির্বাহ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কনফারেন্সগুলি রাজা, বাদশাহ, ধনী রইস ব্যক্তিদের দরবার ও জলসা ঘরের গন্ডি থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে মুক্তি দিয়েছে ।

বাদশাহর দরবারে, জমিদারের জলসাঘরে অনিমন্ত্রিত সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিলো না কিন্তু কনফারেন্সগুলিতে সামান্য টাকায় টিকিট কিনে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে ।

পাবলিক হলে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় বলে কনফারেন্সগুলিতে একটি লোকায়ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ।

রাজাবাদশাহ্ জমিদারদের জলসা ঘরে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হত না । কিন্তু "কনফারেন্স", মাইক্রোফোন ছাড়া অসম্ভব, যেহেতু শ্রোতার সংখ্যা বেশী ।

এই মাইক্রোফোন ব্যবহার হওয়ায় উচ্চাঙ্গ কন্ঠসংগীতের গায়কীর ও কিছু পরিবর্তন হতে থাকে স্বাভাবিক কারণে ।

কনফারেন্সগুলিতে বক্তৃতার জন্য ব্যবহারযোগ্য মাইক্রোফোনের সাহায্যেই উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশিত হত । তাই অনেক সময় গায়কের প্রকৃত কন্ঠস্বর এবং তার গানের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মগুলি মাইক্রোফোনের শব্দে বিকৃত হত ।

"মাইক" ব্যবহারে বড় মাপের হল্‌কতান ও গমকের প্রয়োগ ক্রমশ লোপ পেতে থাকে । শিল্পীরা তাঁদের কন্ঠস্বরের স্বাভাবিক গুনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭ সাল থেকে 'বেতারে' সংগীত পরিবেশন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্বাদ পেতে থাকেন। কেবল শহরের মানুষেরাই নন, গ্রামাঞ্চলের মানুষও রেড়িও মারফত উচ্চাঙ্গ সংগীত কি তা জানতে পারেন। তার ফলে সংগীত সম্মেলন গুলিতে শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

সই সময় কনফারেন্সগুলি থেকে প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠান রেড়িও থেকে রিলে করে শোনান হত।

যাঁরা অদৃশ্য হয়ে গান শোনান তাদেকে নিজের চোখের সামনে রেখে গান শোনার ইচ্ছা হওয়া মানুষের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা। প্রথম যুগে কনফারেন্স শিল্পীদের সময় সীমা বেঁধে দেয়া হত না। এক একজন শিল্পী একটি রাগ গাইতেন তিন চার ঘন্টা বা তারো বেশী সময় নিয়ে সে যুগে, সমাবেশ হত বহু শিল্পীর। অনুষ্ঠান চলত এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল ধরে। একজন শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের সময় অন্যান্য শিল্পীরা প্রথম সারির আসনে বসে থাকতেন শ্রোতা রূপে গায়কারাবা শ্রোতাদের মুখ দেখতে পেতেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করতে পারতেন, যেহেতু প্রেক্ষাগৃহগুলি একালের মত অন্ধকার করে দেওয়া হত না। তাতে করে শিল্পী ও শ্রোতার মাঝে একটা সম্পর্ক থাকতো ভাব আদান প্রদান হত। কনফারেন্সের আয়োজকগণ বা প্রয়োজকগণ দেশের নানা অঞ্চল থেকে গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাতেন সংগীত পরিবেশনের জন্য।

জনসাধারণকে প্রকৃত উচ্চাঙ্গ সংগীতে উৎসাহিত ও অবহিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তথাকথিত খ্যাত শিল্পীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। টাকার অঙ্কে কীপরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হবে তা তাঁরা ভেবে দেখতেন না।

প্রথম যুগের কনফারেন্সগুলির খ্যাত নামা শিল্পী ছিলেন আব্দুল করিম খাঁ সাহেব, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, কেশরবাই, বড়ে গুরাম আলী, খাঁ সাহেব, বিনায়কর পটবর্ধন, ডি,ভি পালুস কর, শ্রীমতি হীরাবাঈ বরোদেকর ও ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

এঁনাদের দক্ষিনা কত ছিল জানা যায় না, তবে এঁনারা ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ; দামোদরদাস খান্না প্রমখ প্রয়োজকদের গৃহেই অবস্থান করতেন যতদিন পযন্ত এই অনুষ্ঠান চলত।

এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষত বাংলাদেশ (অবিভক্ত), উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্র এবং মধ্য প্রদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের নানা কনফারেন্স ও ঘরোয়া আসর হত। এই প্রসঙ্গে রাইচাঁদ বড়ালের গৃহ ও জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের ডিক্সন লেনের বাড়ীর অসংস্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়। ১৯৪৪ এ রেশনিং চালু হয়। এই তিনটি ঘটনার প্রভাবে সারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান হ্রাস পেতে থাকে।

তিরিশ এর দশকে অবিভক্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন, চট্রগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান হত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সারা দেশে ব্ল্যাক-আউট বা অপ্রদীপ অবস্থার কারনে এর মূল্যমান বৃদ্ধির জন্য হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসার ব্যাহত হয়। উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯৪৩ সালে সারা বাংলাদেশে মন্বন্তরের করাল ছায়া নামে। তখন অবশ্য উত্তর প্রদেশের নানা অঞ্চলে কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান হত।

সেই সময় জাপান বোমার হিড়িকে কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়েগিয়েছিল, এ শহরের ধনী ব্যক্তিরা তখন প্রাণরক্ষার তাগিদে গ্রামে বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুষ্ঠান কলকাতায় বিরল হয়ে পড়ে।

সেকালের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কন্ঠ সংগীত পরিবেশনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন ঢিমা (মধ্য-বিলম্বিত তিনতাল) লয়ের পরিবর্তে গায়কগণ সাধারণত বিলম্বিত একতাল ঠেকায় খেয়ালগান গাইতে থাকেন।

এই তালটির ব্যাপক প্রচলনের কারণ সম্ভবত কিরানা ঘরানার আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের এবং ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের ভাবক্ষন সুরসমৃদ্ধ গায়নপদ্ধতি। এঁদের খেয়াল ছিল আবেগময়। সরগম ও লয়কারীর প্রাচুর্য এঁদের গানে থাকত না। সুরের বিস্তারের মধ্য দিয়ে তাঁরা গভীর ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতেন।

এদের গান শুনে সাধারনত শ্রোতারাও বিহ্বল হতেন। তাঁদের গায়কী পরবর্তীকালের বহু উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীকে প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। আবির খাঁ সাহেবের অতিবিলম্বিত লয়ের খেয়াল গায়কির উল্লেখ করা যায় এর প্রকৃত দৃষ্টান্তরূপে।

উল্লেখিত অশুভ ঘটনাগুলির জন্যে এদেশের মানুষের মানসিকতারও বিশেষ পরিবর্তন হয়।

শ্রোতাদের মানসিকতার পরিবর্তনের আর একটি গুরুত্বপূর্ন কারণ হল সবাক চলচ্চিত্রের প্রচলন।

এই সময় ফিল্মী গান সাধারণ শ্রোতাকে আকর্ষণ করতে থাকে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে ধ্রুপদ ধামায় ইত্যাদি 'গুরুপাক সংগীতে' তাদের অনেকের অরুচি দেখা দেয়।

উল্লেখ্য কন্‌ফারেন্সগুলি যেহেতু সাধারন শ্রোতানির্ভর তাই সাধারণ শ্রোতার রুচি অনুসারে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীগণ গান নির্বাচন এবং কতকাংশে গায়কীর পরিবর্তন করতে থাকেন।

ধ্রুপদ, ধামার স্বাভাবিক নিয়মেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর থেকে বিদায় নিতে থাকে।

ঠুমরী গানের মহিলা শিল্পীগণ আগের যুগের মত দাঁড়িয়ে উঠে গান করা বন্ধ করেছেন।

এই সময় সবাক চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ও প্রয়োজকগন সীমিত সময়ের মধ্যে ছবির প্রয়োজনে কিভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে সাধারণ মানুষের কাছে মনোগ্রাহী করে তোলা যায় তা ভেবেছিলেন। তবে সেই গান গুলি অবশ্যই ধ্রুপদঃ ধামার নয়। যদিও কদাচিৎ

Dhaka University Institutional Repository

ধ্রুপদ-ধামারের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি যেকোন কারণেই হোক জনপ্রিয়তা পায়নি।

প্রথম দিকের কনফারেন্সগুলিতে যেমন শিল্পীদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেখা হ'ত না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ এবং ১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছোদের ফলে পরবর্তীযুগের কনফারেন্সগুলিতে শিল্পীদের গানের সময় সীমিত করে দেওয়া হল। স্বাধীনতার পরে "তানসেন এন্টালী" 'ডোভারলেন', 'সদাবঙ্গ' প্রভৃতি সংগীত সম্মেলনগুলি সাধারণ শ্রোতাদের কেনা টিকেটের টাকায় এবং কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাঁদায় প্রবর্তিত হয়েছিল, "অল বেঙ্গল ইন্ডিয়া" প্রভৃতি কনফারেন্সগুলি ও এ সময় তাদের আগের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ছিল। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির অর্থ ব্যয়েই ওই কনফারেন্সগুলির খরচ মিটত না।

আবার সাধারণ শ্রোতা তিন চার ঘন্টা ধরে একটি রাগের গান শুনতে রাজি নন। তাই সন্ধ্যা থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত একই আসরে কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, এবং নৃত্যানুষ্ঠান সমাবেশে অনুষ্ঠানকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে আয়োজকগন অনেকটা বাধ্য হন। এই সময়ে প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই তবলালহরাভ পোগ্রাম থাকত। আজকাল "তবলার লহড়া" প্রোগাম খুব কমই শোনা যায়।

এ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের কনফারেন্স গুলিতে কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীগণ শ্রোতাসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ শ্রোতারা আলাপ বিস্তারের চেয়ে অতি দ্রুত লয়ের গান, তান ও লয়কারী পছন্দ করেন, এবং এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গায়কির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। যেমন সালামৎ ও নাজাকাৎ খাঁ সাহেবদ্বয়ের গান এই সময়ে শ্রোতৃমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল এবং ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ সাহেবের অতিদ্রুত লয়ে তারানা গান একই কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল। অনুরূপ ভাবেই ঠুংরী গায়নরীতিতে অলংকরণের প্রাচুর্য্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণ পেতে গেলে বড়ীমোতিবাঈ, রসুলন বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী থেকে শুরু করে বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব, বরকৎ আলি খাঁ সাহেব, এবং বেগম আখতারের বিভিন্ন রেকর্ডে সংগৃহীত গান শুনলে জানা যাবে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের শাস্ত্র সম্মত প্রয়োগের ব্যতিক্রমের অন্যতম কারণ মনে হয় শ্রোতৃবৃন্দে প্রথম সারিতে অন্যান্য শিল্পীর অনুপস্থিতি।

আগের দশকের কনফারেন্সগুলিতে একজন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীর গানের সময় অন্যান্য শিল্পীরাও শ্রোতা হিসাবে প্রথম সারিতে উপস্থিত থাকতেন।

কিন্তু এখন দেখা যায়. শিল্পী যখন গান গাইছেন তখন শ্রোতার আসনে কোন শিল্পীই নেই, প্রথম সারিতে উপবিষ্ট বা প্রায় শায়িত হয়ে আছেন কয়েকজন নিদ্রাকৃষ্ঠ ব্যক্তি যারা মোটা টাকার চাঁদা দিয়ে প্রথম সারির শ্রোতা হবার অধিকার অর্জন করেছেন, এর ফলে কোন শিল্পী গানের ও রাগের উৎকর্ষের প্রতি আগের মত আর

Dhaka University Institutional Repository

যত্নবান রইলেন না। "গুণনকী লড়াই" প্রায় থেমে গেল। শিল্পীদের ও শ্রোতাদের মধ্যে দুঙ্গলী বা লড়াকু মনোভাব (১৯৩০-১৯৭৫) সেকালে তৃতীয় পর্বের প্রায় প্রথম থেকেই অর্ন্তহিত হয়েছিল। যা পরবর্তী কালেও আর দেখা যায়নি।

কনফারেন্সের প্রথম যুগ থেকেই উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে বাঙালী শিল্পীরা পশ্চাদপদৎ ছিলেন না।

১৯৩৪ থেকে আরম্ভ করে ১৯৭৫ সাল অবধি যে সব বাঙালী উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরা শ্রোতাদের মনোহরণ করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র পসাদ গোস্বামী, ভীস্মদের চট্রোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবতী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

একালের পন্ডিতদের মধ্যে পন্ডিত ভীমসেন যোশী, পন্ডিত যশরাজ, শ্রীমতি কিশোরীআমেনকর, পন্ডিত মল্লিকার্জুনমনসুর, শ্রীমতি গাঙ্গুবাইহাঙ্গঁল, পারভীন সুলতানা প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ রয়েছেনে। এঁরা অবশ্যই প্রত্যেকেই খেয়ালিয়া ধ্রুপদ গানে অত্যন্ত সুপরিচিত আছেন ডাগর পরিবারের বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ এবং ঠুমরী গানে শ্রীমতী শোভা গুহ ও শ্রীমতী গিরিজাদেরী এবং ওস্তাদ মুনাওয়র আলী খাঁ সাহেবও উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য সংগীত রির্সাচ একাডেমী সংক্ষেপে এস,আর,এ, প্রাচীন ও নবীন ধারার সমন্বয় করেছে। সেকালের মত একালে এই সংস্থাটি উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ শিক্ষাকে গুরু শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে বিস্তার করতে আগ্রহী। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ হল অখ্যাত গ্রামাঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

এই সংগীতকে ছড়িয়ে দেয়া। প্রায় শতকরা পচা নব্বই জন গায়ক এখন বিলম্বিত একতাল ঠেকায় প্রথমে খেয়াল গান আরম্ভ করেন। পরে মধ্যলয়, তিনতাল, ঝাপতাল, একতাল, বা রূপকে, খেয়ালের অনুষ্ঠান শেষ করেন। কেউ কেউ দ্রুতলয়েও তান-সরগম করে থাকেন। তারপরে একটি ঠুংরী, দাদরা ভজন গান করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে একালে গজল, নাথ ইত্যাদি কেউ গান না। একালে টপ্পা ও প্রায় লোপ পেয়েছে। গিরিজাদেবীই প্রায় সব আসরে নানা রাগে টপ্পা গেয়ে থাকেন। কিছু দিন আগে কুমারগন্ধর্ব ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টপ্পা গেয়েছেন, তাছাড়া মালিনী রাজুরকরও মাঝে মাঝে টপ্পা গান, খেয়াল গাইবার পর।

কিরানা ঘরানার আব্দুল করিম খাঁ সাহেব ওয়াহিদ খাঁ সাহেব এবং পরবর্তীকালের শিল্পী আমীর খাঁ সাহেব অতি বিলম্বিত লয়ের আশ্রয়ে রাগরূপ পরিস্ফুট করতেন।

একালের সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অনেক শিল্পীই কিরানা ঘরনার বিশেষত আমির খাঁ সাহেবের গায়কীর অনুসারী। যদিও তারা একেবারে অনুকারী নন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অলোক চট্টোপাধ্যায় সমরেশ চৌধুরীর গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। অরুন ভাদুড়ী গানের মধ্যেও আমীর খাঁ সাহেবের গায়কীর উপাদান মিলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ অতি বিলম্বিত লয়ের ঝুমরা তালের খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

সম্প্রতি প্রয়াত লতাফৎ হুসেন খাঁ সাহেব ও সরাফৎ হুসেন খাঁ সাহেবের পরে আগ্রা রঙ্গিলা ঘরানার জ্যোতিষ্ক ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের

Dhaka University Institutional Repository

গায়কির দ্বারা প্রভাবিত গায়কদের মধ্যে একালে কিচলূ ভ্রাতৃদ্বয়ের গান উল্লেখযোগ্য। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে এই গায়কীতে লতিত রাও এর নাম উল্লেখযোগ্য। সুনীল বসুর ছাত্রী শুভ্রা গুহ ও ইদানীং আগ্রা ঘরানার গায়কী গেয়ে নাম করেছেন।

'জয়পুর ঘরানার' পন্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর এত বয়সেও অপূর্ব সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে চলেছেন।

'সেহশাব ঘরানার' ধারক ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁর সাহেবের শিষ্য রশিদ খাঁ ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

একালে 'কিরানা' গায়কির আরেকটি সার্থক দৃষ্টান্ত হলেন মস্কুর আলী খান। বিগত কালের কিরানা ঘরানার অত্যন্ত বলিষ্ট ও সুপরিচিত শিল্পী এটি কানন ও মালাধর কাননের কিছু সুযোগ্য ছাত্র ছাত্রী ও একালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেদের যোগ্যতা প্রমান করেছেন।

এদের মধ্যে বকুল চট্রোপাধ্যায় ও সন্দীপ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোন বিশেষ গায়কীয় অনুসারী না হয়েও দেশে বেশ কয়েকজন শিল্পী শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন কলকাতার মানস চক্রবর্তী, তনিমা ঠাকুর, মহারাষ্ট্রের প্রভাকর কারেকর, উল্লাস কশলকর, পদ্মাতলোয়ালকর, মালিনী রাজুরকর, অশ্বিনী ভিড়ে, বিদ্যাধর ব্যাস প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকায় রাগ-সঙ্গীত চর্চা।

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর সর্বকালীন ঐশ্বর্যময় সাম্রাজ্যের অন্যতম ছিল এই মোঘল সাম্রজ্য। সেই বিশাল সামাজ্রের রাজমুকুট সমান ছিল সুবে বাংলা। আর রাজধানী ঢাকা ছিল সেই উষ্ণীষের উজ্জ্বলতম রত্ন।

ঢাকার এই অনন্যসাধারণ মর্যাদার কারণ, বলাই বাহুল্য, তার ভৌগোলিক, অবস্থান। নদী মাতৃক এতদ্অঞ্চল প্রায়শই প্রথম সুযোগে স্বাধীনতা ঘোযনায় কৃতবিদ্য এবং কেবলমাত্র প্রভূত প্রয়াস সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় শক্তির বশ্য, এমন প্রায় ডজনখানেক ভৌমিক শক্তির উপর কার্যকর খবরদারীর জন্য ঢাকার চাইতে উপযুক্ত স্থান আর কী হতে পারে? তাই মোঘলদের বাংলা অধিকার ভুক্তির সাথেই দেখি সুবে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত রাজমহল হতে ঢাকা তথা জাহাঙ্গীরনগরে। ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় কলকাতাকে রাজধানী করার পূর্বে পর্যন্ত উপ-রাজধানী হিসাবে ঢাকা ছিল ইংরেজ আমলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী প্রথম মোঘল সুবেদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭) দুধভাই ইসলাম খাঁন চিশ্তির আমলে (১৬০৮-১৮১৩) নবাব দরবারে নৃত্যগীত পারঙ্গম শিল্পীর সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন জাগে নবাব, দরবারের উপযুক্ত এত বেশী সংখ্যক শিল্পীত রাতারাতি তৈরী হবার নয়। সেক্ষেত্রে মানতে হবে ইসলাম খাঁর আগমনের আগেও এদেশে নৃত্যগীত চর্চার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হেকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদা (১৮৮১-১৯৪৭) তাঁর রচিত "ঢাকা পঁচাশ বরস পহলে" গ্রন্থে এমন অনুমানেরই সমর্থন করে গেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, "ঢাকার প্রথম সুবেদার ইসলাম খাঁর দরবারে বারো শত"কিঞ্চিনী" ছিল। নৃত্যগীত এদের পেশা।

এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম খাঁর আগমনের আগেও এদেশে গান বাজনার রেওয়াজ ছিল। মোঘলপূর্ব আমলেও এটি যথেষ্ট কর্ম্মমুখর অঞ্চল ছিল এবং এখানে গান বাজনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। অন্যথায় ১২০০ নৃত্যগীতপটিয়সী এত স্বল্প সময়ে জড়ো হল কীভাবে ? ইবনে বতুতার ভ্রমনবৃত্তান্ত হতেও এর সমর্থন মেলে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ফার্সী গজল গাইতে পারে এমন 'রান্ডী' খুব সস্তায় লভ্য এ অঞ্চলে। সে যাই হোক বহুদিন ধরে গান বাজনার প্রচলন ঢাকায়। ঢাকার লোকজনের যথেষ্ট আগ্রহও সঙ্গীতের দিকে সচারাচর বলা হয় লখ্নৌ শহরের লোকের লয় ও সুর জ্ঞান প্রখর আর ঢাকার লোকের তাল জ্ঞান। এমন কী ঢাকার প্রাচীনপন্থী এবং ধর্মভীরু লোকজনের আকর্ষন আছে সংগীতে। কোন সঙ্গীত মাহফিলে পরিবেশনায় ভুলচুক হলে সাধারণ শ্রোতাও তা বুঝতে সক্ষম। ঢাকায় "ঘেন্টু কাহানী" কথার উল্লেখ আছে। কিছু সুন্দর্শন বালককে গান ও নাচের তালিম দেত্তয়া হয়। এরা ঠুম্রী গজল ও কন্ঠস্থ করে। প্রায়ই দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। কোন শক্তিমান এমন একটি ছেলেকে কাঁধের উপর নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যেরা এক ধরনের ধাতব বাজনা “ঝা ঝা” এবং ঢোল বাজায়। ছেলেটি মেয়েদের মত সাজে এবং প্রতিপক্ষের অনুরূপ সাজ সজ্জায় মেয়েরুপী ছেলের সাথে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় নামে। উৎসাহের আতিশয্যে অধিকাংশ সময় প্রতিযোগিতা মারপিটে সঙ্গ হয়। অনেক সময় এক দলের ছেলেকে অন্য দল অপহরন করে নিয়ে যায়। সাধারনত জনতার বিনোদনের বিষয় এই খেঁটু ভদ্রলোকেরা এ সব এড়িয়ে চলে।

হেকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার যাত্রা ও থিয়েটার এর বহুল প্রসারের বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দুদের বিভিন্ন লীলাবিষয়ক যাত্রা থিয়েটার হতে মুসলমানদের মধ্যেও “লীলা” অভিনয়ের প্রচলন হয়। এ সমস্ত আখ্যানই ছিল বাংলায় কিন্তু হিন্দুস্থানী ঠুমরী ও খেয়াল যোগ করা হত তার মধ্যে। যাত্রার সাথে পার্থক্য ছিল শুধু দৃশ্যপট থাকা না থাকার। ফরাশগঞ্জের বিখ্যাত সাবান বিক্রেতা আকমল খাঁন এবং ইউসুফ খাঁন ছিলেন বড় পৃষ্টপোষক। কানপুর হতে এসে ঢাকার বাসিন্দা সৈয়দ ফয়েজ বক্স “ফরহাত আফজা ”(আনন্দদায়িনী) নামে একটি থিয়েটার কোম্পানী খোলেন। স্থানীয় বেশ কিছু হিন্দুস্থানী জনাপদ বধু (ডাউয়াউফ) নিয়ে এই কোম্পানী গড়ে তোলেন। এর পুরুষ চরিত্রেও অভিনয় করতেন এই হিন্দুস্থানী মহিলারা। কানপুর হতে মুন্সী নওয়াব আলী নদিয়ায় আসেন এবং চল্লিশটি নাটক রচনা করেন। তবে পারস্পরিক কোন্দলে বছর চারেকের মধ্যে ‘ফরহাত আফজা’ ভেঙ্গে যায়। তবে এর একটি গজল বহু দিন লোকমুখে শোনা যায়। গজলটি হচ্ছেঃ “বেতাবী

Dhaka University Institutional Repository

কহরাহী হ্যায় চলো কুয়ে ইয়ার মে/সীমায় কী তড়পা হ্যায় দিলে বেকারার মে ।

এসব যাত্রা, থিয়েটার, অপেরা এত জনপ্রিয় ছিল যে ঢাকা শহর হতে প্রায় ৩০(ত্রিশ) মাইল দূরের জয়দেবপুর যেখানে উর্দূর প্রচলন খুবই নগণ্য। সেখান হতে ও দর্শক শ্রোতারা আসতেন "ইন্দ্রসভার " অভিনয় ও গান শুনতে। ইন্দ্রসভার একটি গান খুব বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ছিল ঃ'যোগিন আতি হ্যায় পরিবনকে পরিস্থান কী বিচ'। আল্লাহ জানেন কোন মাহেন্দ্রক্ষনে লেখক এই নাটকটি রচনা করেছিলেন।

অন্যদিকে ইংরেজের তৈরী নতুন রাজধানী কলকাতায় ইংরেজদেরই অনুগ্রহে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা জমিদার বেনিয়া মুৎসুদ্দীর বিত্তের প্রসার যতখানি, চিত্তের প্রসার ততখানি গ্রাম্য স্থূলতায় সীমাবদ্ধ।

তাই কেউ বা মাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের রেকর্ড করে, কেউ বা এক রাত্রের যাত্রা কি কবিগানে লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ প্রলুব্ধ। এমন স্থানে কোন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার আশা দুরাশা। কেবলই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় রচিত নৃত্যগীত। 'তাতে 'সৃজনের মত্ততা আছে কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই।' সেই গান ভাবের বিচারে নিরাবেগ ও অশালীন, বাণীর বিচারে ক্লান্তিময় অনুপ্রাসিক এবং ঐতিহ্যের বিচারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিন্নমূল বিশেষ। এমন পরিবেশই সম্ভবত: রূপচাঁদ পক্ষী তথা রূপচাঁদ দাস মহাপত্র কী গোপাল উড়ের মত ভাগ্যান্বেষী উৎকলবাশঁ

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীতের রঙ্গমঞ্চে উড়ে এসে জুড়ে বসা। দৃশ্যটা একবার ভাবা যেতে পারে। কলকাতার বউবাজারের গলিতে ফিরিওয়ালা গলায় 'চাই চাপা কলা" ডাক। পাশের গলিতেই চলছে বিদ্যাসুন্দর পালার মহড়া। মহড়ার গানের জন্য প্রস্তুত পরিবেশে অনুবাদী গান্ধার সুরে "চাই চাপ কলা ডাকে যড়জ সুরের সঙ্গে শুদ্ধ গান্ধারের সুরেলা আওয়াজে উপস্থিত জনের একজন (বিশ্বনাথ মতিলাল) হেঁকে উঠলেন। 'ওরে কে আছিসরে', গান্ধার বলছে চাঁপা কলাকে ধরে আন। সেই শুরু চাঁপাকলার ফিরিওয়ালা থেকে গোপাল উড়ের গানের ফিরিওয়ালায় রূপান্তর। কিংবা ধরা যাক বড়লোকের নন্দনদের গাঁজার আসরের রূপচাঁদের পক্ষীর পাখির খাঁচার মতন পালকীতে চলা আর কিচির মিচির বোলের অপরূপ আসর। নব্য রাজধানী কলকাতার দেড়খানা গ্রাম্যসঙ্গীতে, অবশিষ্ট ক্রাচটি শুধু মার্গ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যে ক্রাচটির আমদানী আবার দিল্লী, কী ঢাকা; মুর্শিদাবাদ নিধুবাবুর (জ ১৭৪১) কালী মীর্জার (জ, ১৭৫০) কল্যাণে।

পাঞ্জাবী ঘরানার দ্রুত তালের টপ্পাকে ভেঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পা, ও লখ্নৌ ও দিল্লী ঘরানার খেয়াল ও টপখেয়াল হতে কালী মীর্জার টপ্পা। কিন্তু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। ১৭১০ এর দশ হাজার মানুষের কলকাতা চারের দশকে উন্নীত দু'লাখ দশ হাজারে, এবং একশ বছরের মধ্যে সাত লাখে অন্য দিকে ১৮০০ সালেও ঢাকার লোক সংখ্যা যখন দু'লাখ ১৮৯১তে তা হ্রাস পেয়েছে ৮৩,৩৫৮ জনে।

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাগ্যান্বেষী জনস্রোতের যতখানি না অঙ্গীকার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যথার্থ রস আস্বাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের প্রতি তার চাইতে বেশী আসক্তি আখড়াই, হাফ-আখড়াই তরজা, কবি গানের উত্তেজক খিস্তিতে। ভক্ত রামপ্রসাদের ভক্তি নির্মাল্যের নির্মলতা ছিল-

'আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় ভাল নয় ভাল নয় মা
ভাল নয় মা কোন কালে
শিশু কালেপিতা মলো
মাগো রাতে নিল পরে।'

কৈশোরে পিতৃহীন রামপ্রসাদের এহেন ভক্তিগীতি একদা বিমোহিত করেছিল, ততোধিক হতভাগ্য বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকেও। আর সেই রামপ্রসাদেরই কলকাতায় নবমীর পূজার দিনে মহারাজ দেবকৃষ্ণ বাহাদুরের মত অনেকেই নিজ সন্তানদের সাথে 'সকার বকার সমৃদ্ধ' খেউড় লীলায় প্রকৃত হতেন অবলীলা ক্রমে। ভক্তি সংগীত, মার্গসঙ্গীতের পরিবর্তে এক পর্যায়ে বেশ্যাসঙ্গীত পর্যন্ত। এই জলতরঙ্গ রোধিবে কে ? ক্রান্তিকালের সেই আবিলতার ঢেউ অনিবার্য ভাবে স্পর্শ করল ঢাকাকে ও।

উনিশ শতকের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে এই অবক্ষয়ের ইতিহাস। যদিও সে আলেখ্য কোন দুর্লভ নক্সাকার কিংবা আলালী দুলাল ছিল না। কলকাতার মত ঢাকার জন্যে। এ দিকে জনদ জনশূন্য হয়ে পড়ছে, ভরে উঠেছে জনপদবধূতে। এই প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মুন লিখেছেন 'সঙ্গীতের'পুরানো পীঠস্থান হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকায় ছিলেন বেশ কিছু বাইজী যাঁরা কলকাতার বাইজীদের থেকে ছিলেন দক্ষ। কন্ঠসংগীতের ওস্তাদ হাসন মিয়া অনেক বাইজীকে তালিম দিয়েছিলো ঢাকার বিখ্যাত বাঙ্গলীদের মধ্যে ছিলেন, আমীল জান, অচল গুন্নু রাজলক্ষী, ইমামী প্রমূখ।

কালী বাইজী ছিলেন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্টের তারিনীশংকর রায় চৌধুরীর শিষ্যা। বলতে গেলে তারিনী বাবুই কালীকে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছিলেন। জিন্দাবাহারে রাজলক্ষীর বাড়ী ছিল পাঁচ ছ'টি। সঙ্গীতের থেকে সাধু স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষ ভাবে পরিচিতা।

১৮৮৬ সনের ভূমিকম্পের পর জিন্দাবাহার কালীবাড়ী ভেঙ্গে তিনি তা তৈরী করে ছিলেন। রমনার কালীবাড়ী সংস্কারের জন্যও তিনি চাঁদা দিয়ে ছিলেন মোটা রকমের ।

বাইজীদের অনেকে হেয় চোখে দেখলেও মানবিক গুনের ঘাটতি তাদের ছিল না। সত্তর দশকের আগে ঢাকায় নদীও পাতকুয়োর পানিই ছিল খাবার প্যানির উৎস। এই দৃষ্টিত পানি শহরে অহরহ সৃষ্টি করতো মহামারীর। ১৮৭৪ সনে নবাব আব্দুল গনি ঢাকায় কিভাবে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যেতে পারে সে নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ, জমিদার রাজাবাবু, কালিমদুর, পানিযা ও পুবাইলের জমিদার রাজকুমার বসাক ও রূপলাল দাস এবং মাত্র দু'জন বাইজী রাজলক্ষী ও আমীরজান তারা

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচশো টাকা করে দান করতে রাজী হয়েছিলেন। নবাব অবশ্য কারো কাছ থেকে টাকা না নিয়েই দান করেছিলেন একলক্ষ্য টাকা।

কলকাতার বাঈজীরা ঢাকায় সঙ্গীত পরিবেশন করতে এলে যে কতখানি সর্তক হতেন তার প্রমাণ ইন্দুবালা। যে ইন্দুবালার ছায়া নটে বাঁধা গান "কে তুমি একাকিনী দাঁড়ায়ে যমুনা তীরে বল ধনী বিনোদিনী ছলনা কোরনা মোরে" শুনে সেখানে অনেকই আত্মহারা হতেন। সে ইন্দুবালা ঢাকায় আসার আগে কলিকাতার কালী ঘাটে পূজো দিতেন ঃ 'মা যাচ্ছি। ঢাকা তালের দেশ, মান রাখিস মা'।

এরই মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়াস চলছে পুরনো সাংগীতিক ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য। ১৮৮৬ সার তথা ১২৯২ সনের ১লা ভাদ্রের 'ঢাকা গেজেট' প্রকাশিত একটি সংবাদ-

'ঢাকাবাসী সংগীত বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের বন্ধু সংগীতনরাগী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ মহাশয়ের প্রযত্নে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ গৃহে একটি সংগীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ঢাকা নগরীর একটি বিশেষ অভাব দূরীকৃত হইবার সম্ভবনা। সংগীত বিদ্যাভ্যাসকাঙক্ষীগণের শিক্ষাকার্যের সৌন্দযার্থে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভরসা করি সংগীতপ্রিয় মহোদয়গন চন্দ্রনাথ বাবুর এই সদূদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য যতোচিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। বিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল ঃ বিদ্যালয়ে চারিটি বিভাগ বা শ্রেণী থাকিবে। (১) হারমোনিয়াম শ্রেণী (২) সঙ্গীত শ্রেণী (৩) তবলার শ্রেণী (৪) সেতারের শ্রেণী। প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষাথীগন

Dhaka University Institutional Repository

হইতে একটাকা হারে মাসিক বেতন গ্রহন করা হইবে। যদি কেহ দুই শ্রেণীতে শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাহাকে উভয় শ্রেণীর জন্য মাসে ১ টাকা বেতন দিতে হইবে। এই প্রকার তিন শ্রেণীর জন্য ২টাকা এবং চারশ্রেণীর জন্য ৩ টাকা বেতন গৃহিত হইবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সেই মাসের বেতন দিতে হইবে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯ টাকা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য চলিবে। প্রতি সোম, বুধ, শুক্রবার হারমোনিয়াম ও সেতারের এবং প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবারে সঙ্গীতে ও তবলা শ্রেণীর শিক্ষাকার্য চলবে। অভিবাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন স্কুলের ছাত্রকে শিক্ষার্থীর রূপে গ্রহন করা হইবে না। কিন্তু কলেজের ছাত্র গৃহীত হইবে। অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তিকে গ্রহন করা যাইবে না। বিদ্যালয়ের উন্নতি হইলে শিক্ষার্থীগনের উৎসাহানুসারে ফ্লুট, ক্লারিওনেট, এ সরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষাকার্য আরম্ভ হইবে।

উনিশ শতকের ঢাকার এই ধ্রুপদী সংগীতের ঐতিহ্যের কিছু স্মৃতি চিত্র নাই সমকালীন মুন্সী রহমান আলী ত্বায়েশ (১৮২৩-১৯০৮)এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত "তাওয়ারিখ-ই ঢাকী " গ্রন্থে (১৯১০)। বংশগত পদবীতে মুনশী, কবি হিসাবে ব্যবহৃত নাম 'ত্বায়েশ' এবং কাশিদ ঢাকার বাসিন্দা হিসাবে 'জাহাঙ্গীরনগরী' বলে আত্নপরিচয় দিতে শ্লাঘাবোধকারী এই লেখকের বর্ননায়ঃ " দিল্লী হতে আগত ইমাম বক্স ও রহিম বক্স নামে দুই ভাই এই শহরের খ্যাতনামা গায়কদের মধ্যে বড়ই খ্যাতি মান ছিলেন। ইমাম বক্স খেয়াল ও ধ্রুপদের নামকরা ওস্তাদ ছিলো এবং রহিম বক্স পাট্টা,

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতের খুবই নিপুণ সুনিষ্ট কন্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই সংগীত শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

তখনকার দিনে শহরের ধণীলোকজন এবং নবাব সাহেবেরা গান শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং শিল্পীদের মর্যাদা দিতেন। তাঁরা দু'জনই এই শহরে জীবন কাটান। মিঠন খাঁ নামে ইমাম বক্সের এক শিষ্য নিয়াল ও ধ্রুপদের বড় ওস্তাদ ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁর সময় দিল্লী গোয়ালিয়র ও পাঞ্জাব স্থানের অনেক গায়ক ওস্তাদ এখানে আসেন এবং সকলেই তাঁকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করে নেন। তিনি তাঁর সময়ে তানসেন রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রায় সময় মুর্শিদাবাদ যেতেন, সেখানে তাঁর খুব মর্যদা ছিল। নবাব পুরের তাঁতী সম্প্রদায় এবং ইমরামপুরের ঠাকুরদের মধ্যে ও অনেকেই এ শাস্ত্রে বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন। পাট্টা সংগীতে মিয়া হাবিব নামে রহিম বক্সের এক শিষ্যের গলার স্বর খুবই মধুর ছিল এবং তিনি ভাল ওস্তাদ ছিলেন। তার সংগীতের টানে সমাজদার শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে পড়তো। গোপাল একজন হিন্দু পাট্টা সংগীতে ভাল ওস্তাদ এবং মিষ্ট স্বরের অধিকারী ছিলেন। এই শহরে দুজনেই 'তানসেন' ও "বৈজু বাওরা" নামে পরিচিত ছিলেন। মিয়া হাবিব কোলকাতায় খুব নাম করেন। এখানে তাঁর খুব মর্যাদা হয়। শেষ বয়সে তিনি হজ্ব করেন এবং মক্কা মদীনা শরীফ জিয়ারত শেষে ফিরে এসে পরলোক গমন করেন।

ঢাকার এক পরিচিত ছিল " বায়ান্নো বাজার ও তেপ্পান্ন গলির শহর রুপে", আর তায়েশের বণর্না অনুযায়ী-আগের দিন সচ্ছলতার

Dhaka University Institutional Repository

যুগ ছিল। প্রতি গলি ও বাজারে গান বাজনার চর্চা হত। নিজ কাজ থেকে অবসর পাওয়ার পর লোকজন দু'চার ঘন্টা সংগীত চর্চা করে ভাল গায়ক হয়ে উঠতেন। আজকালও শহরের অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান গান বাজনা, সঙ্-যাত্রা, হোলি, গীত ও মার্সিয়া আবৃত্তি প্রভৃতিতে বিখ্যাত এবং তাঁরা ভালভাবে অনুশীলন করে থাকেন।

বৃহওর ঢাকার মানিকগঞ্জের হৃদয়নাম মজুমদার তাঁর রচিত " রেমিনিসেন্স অব ঢাকা" (১৯২৬) গ্রন্থে জানাচ্ছেন ঃ 'আমি যখন (আট বছর বয়সে) ঢাকায় আসি তখন প্রায় প্রতিদিনই শুনতাম এখানে ওখানে মহ্‌ফিল হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে তখন সেতারে বিখ্যাত ছিলেন ভগবান দাস বৈরাগী ও তাঁর ছোট ভাই লক্ষ্মণ দাস বৈরাগী। কলকাতা, বেনারস, ও বৃন্দাবনেও বিখ্যাত ছিলেন ভগবান চন্দ্র এবং বছরে একবার বাড়তি রোজগারের আশায় তিনি যেতেন ঐ শহরে। তাঁর অনুপস্থিতির সময় ঢাকায় তাঁর শিষ্যদের দেখাশোনা করতেন লক্ষ্মনদাস।

হৃদয়নাথের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ঢাকায় দশ বারোটি দোকান ছিল সেতার ও বেহালার। সবচাইতে নামকরা সেতার এসরাজ প্রস্তুতকারক ছিলেন শুকলাল মিস্ত্রী। তিনি অবশ্য ঢাকার লোক ছিলেন না, এসে ছিলেন উত্তর ভারত থেকে কিন্তু পরে স্থায়ী ভাবে থেকে গিয়েছিলেন ঢাকায়। শুকলাল মারা যাবার পর তাঁর তৈরী সেতার বিক্রি হতো চড়া দামে।

শুকলালের ছেলে পুরুষোওম ও নাম করেছিলেন এ সময়ে। বিশ শতকে হৃদয় নাথ যখন স্মৃতিকথা লিখছেন তখন পুরুষোত্তমের

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেরামরাল বেঁচে ছিলেন। শুকলালের যাঁরা সহকর্মী ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই দোকান খুলেছিলেন এঁদের মধ্যে বাবুরাম ও বদ্রিনাথের দোকানগুলি চকবাজারে আর বদন মিস্ত্রীর দোকান ছিল কোতোয়ালীর পাশে।

লখ্নৌ এখনো শহর বিখ্যাত ছিল কণ্ঠ সংগীতের জন্য। আর তবলা ও সেতার বাদনের জন্য ঢাকা ছিল বিখ্যাত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকায় সেতার বাদকেরা এক নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। গর্বভরে লিখেছেন বলে হৃদয়নাথ:- 'ঢাকার তবলা ও সেতার বাদনের অদ্ভুত স্টাইল ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না।'

মুসলমান আমলে নবাবদের দরবারে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওস্তাদরা আসতেন। ইংরেজরা বাংলায় আসার পর একশো বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিল। পৃষ্ঠপোষকতার আশায় ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকেযে সব ওস্তাদরা আসতেন তাঁদের সহায়তা করতেন নবাব পরিবারের বংশধররা; মৌলভীবাজারের মোগল বংমোদ্ভত জমিদার নওয়াবপুরের ধনী বসাক পরিবার, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ বসাক এবং জমিদার রাজাবাবু। এ ছাড়া আরো যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁর হলেন, ভাওয়ালের রাজ পরিবার, কাশিমপুর, বালিয়া ও পুবাইলের জমিদার।'

ভাওয়ালের রাজাকালী নারায়ন ভালো ধ্রুপদ খেয়াল ও লখনৌর গজল জানতেন। তাঁর গলা ছিল ভালো এবং কোলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে কবিয়ালরা এলে তাদের সঙ্গে রাজেন্দ্র নারায়ন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তবলবাদক।

মুশিদাবাদের তবলাবাদক আতা হুসেন, ঢাকার আসলীগোলার (আমলী গোলার) রূপচাঁদ খান এবং রাজাবাবু সবাই ছিলেন আতা হুসেনের পিতা হুসেন বক্রের শিষ্য। বসাক বাবুরা দক্ষ ছিলেন তবলা ও পাখোয়াজ বাজানোর। এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় রাজকুমার বসাক কিশোরীমোহন বসাক ও আনন্দমোহন বসাকের কথা। এ পরিবারের প্রফল্ল কুমার বসাক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অতিথি হিসাবে থাকতেন আগরতলায়। মহারাজ নিজেও ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়ালে দক্ষ।

১৮৮০ সনে হৃদয় নাথ যখন কলেজ পাশ করে বেরিয়েছেন তখন বিখ্যাত ছিল হাবিবাবু ও তাঁর ভাইপো রাধিকা বাবুর গান টপ্পায় ছিলেন তাঁরা ওস্তাদ।

পেশাাদার কণ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হুসেন খান, আমজাদ আলী খাঁন, কাশিম আলী খাঁন, কৃষ্টদাস সূত্রধার এবং হরিদাস কর্মকার। 'হরিনাথের শিষ্য ইমদাদ খান এখনও জীবিত লিখেছেন হৃদয়নায় (বিশ শতকে) এবং ঢাকায় ধ্রুপদ ও খেয়ালের রাজা হলেন তিনি।

উনবিংশ শতকের ঢাকায় "সংগীত চর্চার ভুবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে গেছেন উপরি উক্ত প্রসন্নকুমার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসন্ন কুমার বসাক তথা প্রসন্ন কুমার বণিক্য সম্পর্কে বিস্তৃত পাওয়া যায় ময়মনসিংহের রামগোপালপুরের জমিদার ও সঙ্গীতজ্ঞ হরেন্দ্রকিশোর রায় চোধুরী প্রণীত " দ্য মিউজিশিয়ানস কান অফ ইন্ডিয়া, ১ম খন্ডে (১৯২৯) গ্রন্থটিতে প্রসন্নকুমার সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরনীর বঙগানুবাদ নিম্নরূপ প্রসন্ন কুমার বনিক্য ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহন করেন। পিতা স্বর্গীয় মদন মোহন বনিক্য। হিন্দু এবং গন্ধ বনিক গোত্রীয়। তবলাবাদনই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়।

তাঁহার পিতা কিংবা পিতামহের সংগীতে সামান্যই অনুরাগ ছিল। কিন্তু প্রসন্ন শৈশব হইতেই ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি আগ্রহী হইয়া পড়েন। ঢাকা শহর তখন এইরূপ সংগীতের জন্য প্রখ্যাত ছিল। শহরটিতে তখন প্রায়ই ভারত বর্ষের বহু সেরা গুণী সংগীতজ্ঞের আগমন ঘটিত। প্রসন্নের সংগীত প্রীতি লক্ষ করিয়া ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া ও পাখোয়াজবাদক স্বর্গীয় গৌরমোহন বসাক তাহাকে নিজ শিষ্য করিয়া লন। এই নয় দশ বছর বয়সেই প্রসন্ন তবলায় তালিম গ্রহন করিতে থাকেন। নিরবিছিন্ন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতায় অচিরেই প্রসন্নকুমার ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে উভয়ের সাথেই তাঁর সুমিষ্ট দ্রুত এবং বাদন নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদের আমীরউল ওমরা নবাব বাহাদুরের দরবারী শিল্পী বিখ্যাত তবলিয়া আতা হোসেনের প্রসিদ্ধি সম্পর্কে প্রসন্ন কুমার অবহিত হন। তিনি গুরু গৌরমোহন বসাকের সম্মতি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহন পূর্ববক মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং আতা হুসেনের স্নেহভাজন রূপে বিশেষ প্রশিক্ষন লাভ করেন।

তবে আর্থিক অনুপপত্তির কারনে অচিরে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আট হতে দশ ঘন্টা তবলা অনুশীলন করিতেন। পরবর্ত্তী কালে প্রসন্ন তবলা বাদনকে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহন করেন এবং বাংলার রাজন্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে তাহার দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিয়া প্রভূত সম্মান ও বিত্ত অর্জন করেন। কুচবিহারের প্রয়াত মহারাজা ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য, ভাওয়ালের প্রয়াত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, আসামের গৌরীপুরের মহারাজ, প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, রামগোপালে পুরের স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মুক্তগাছার রাজা জগৎকিশোর রায় চৌধুরী এবং বাংলা অপরাপর বহু জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রসন্ন কুমারের গুনগ্রাহী ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর; ডক্টর অব মিউজিকের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ওস্তাদ আতা হোসেনের মৃত্যুর পর ঢাকা, কলিকাতা ও অপরাপর সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ন পীরস্থানসমূহের সংগীতজ্ঞাগণ প্রসন্নকুমারকে বাংলার শ্রেষ্ঠতম তবলিয়া হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

তিনি জীবনের একটি দীর্ঘসময় ভারত সংগীত সমাজের জন্য ব্যয় করেন। এই সংস্থাটি সংগীত বিষয়ে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গন্য এবং কলিকাতা ও আপরাপর স্থানের, রইস ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

পোষকতায় ধন্য। উত্তর ও দক্ষিন ভারতের বহুকলাবিদ এই প্রতিষ্ঠানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে মুরা পড়ার জমিদার রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দোপ্যাধায় ঢাকার প্রান বল্লভ গোস্বামী ও অক্ষয় কুমার কর্মকার এবং মুস্তফা নুর ইসলাম, যিনি বিগত ২৩ বছর তাঁহার একজন শিষ্য হিসাবে নিজকে ধন্য মনে করেন। তাঁহার বাদনশৈলী প্রকৃতই বড় মধুর। এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, সমস্ত বাঙালী তবলিয়ার মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক বোলের ভান্ডারী। এই বোলের সংখ্যা দুই হাজারের কম নহে এবং প্রতিটি এমন সুন্দর এবং সুচারুভাবে সৃষ্ট যে কণ্ঠ কিংবা যন্ত্র যে প্রকার সংগীতের সহযোগেই তা বাজানো হউক না কেন, উহা পরিবেশনার মান বহুগুনে বাড়াইয়া দেয়। তিনি " তবলা তরঙ্গিনী " ও মৃদঙ্গ প্রবেশিকা নামক দুইটি গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থ দুটি ৬০ নম্বর যোগীনগর, ঢাকায় গ্রন্থ কারের নিকট হইতে নেওয়া যায়।

এখানে সেকালের অপর এক বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ভগবান চন্দ্র দাসের কথা বিশেষ করেই উল্লেখ করতে হয়। ভগবান চন্দ্র ১৮৫২ খ্রীষ্টাবেদ ঢাকা শহরে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব গোত্রীয় এবং পুরুষানুক্রমে পেশাদার সংগীতকার। ভগবান চন্দ্রকে অবলম্বন করে তখনকার ঢাকায় সংগীতক পরিবেশের উজ্জ্বল পরিচিত পাওয়া যেতে পারে।

"দ্য মিউজিক অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে জানানো হচ্ছে, একদা বাংলার শাসনকেন্দ্র হিসাবে ঢাকা একটি প্রধান বিখ্যাত শহর"।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতে সংগীত প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের প্রায়শ সমাগমের স্থান ঢাকা। প্রয়াত প্রখ্যাত সেতারবাদক হরিচরন ঢাকার নবাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ঢাকায় আসেন এবং তাঁহার পুত্র চৈতন দাসসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। চৈতন দাস তাঁর পিতার নিকট হইতে সেতারে তালিম গ্রহন করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজ পুত্র স্বর্গীয় রতনচাঁদকে সেতারে প্রশিক্ষন প্রদান পূর্বক বিলক্ষন পারদর্শী করিয়া তোলেন। রতনচাঁদ এর নিকট ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরন্দ্র মানিক্যের রাজদরবারে স্থান গ্রহন করেন, ঢাকার অন্যতম লক্ষপতি রূপলালরায় রতনচাঁদ নিকট হইতে সেতারে তালিম গ্রহন করেন, কিন্তু দুই পুত্র ভগবান ও শ্যামচাঁদ স্কুলের দাস থাকা অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ ভগবান চন্দ্র দাস এন্ট্রাস পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি বংশের সাংগীতিক পরম্পরা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য রূপলালরায় বাবুর নিকট সেতারে শিক্ষা লাভ করেন। বিখ্যাত সেতারিয়া সুলতান বক্স মাসিক ২০০ টাকা বেতনে রামলাল বাবুর নিকট নিযুক্ত ছিলেন। ভগবান তাঁহার নিকট হইতেও " মুসিদখানী গৎ" বাজাইবার কৌশল আয়ত্ব করেন। পরবর্তীতে তিনি কলিকাতার নবীন চন্দ্র গোস্বামীর নিকট হইতে "রেজাখানী গৎ" বাজানো আয়ত্ব করেন। প্রখ্যাত রবাব বাদক প্রয়াত কালেশ আলী খাঁন, সরোদবাদক এনায়েত হোসেন খাঁন বীণাবাদক মুরশেদ আলী খাঁন, প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের নিকট হইতে তিনি বিভিন্ন গৎ আয়ত্ব করেন। প্রয়াত নবাব বাহাদুর স্যার

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল গনি ভগবান দাসের একজন গুনগ্রাহী ছিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকে আর্থিক সহাযা্য প্রদান করিতেন।

ভগবান দাস বৃন্দাবনের ধনাঢ্য ব্যক্তি লক্ষন দাস শেঠের অধীনে চাকুরী গ্রহন করেন। লক্ষ্মন দাস মৃদঙ্গঁ বাদক খাদো সিং, মদন মোহন মিশ্র, জয়পুরের ইমরত খাঁন, ধ্রুপদ গায়ক তাজ খাঁন, খেয়াল গায়ক আহম্মদ প্রমুখ গুনীর গুনগ্রাহী ছিলেন। বৃন্দাবনে প্রভুত সম্মান লাভপূর্বক তিনি কলকাতায় আগমন করেন এবং মহারাজা স্যার জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখের পৃষ্ঠ পোষকতায় ধন্য "ভারত সংগীত সমাজে" সেতারের অধ্যাপক পদে ব্রত হন, তিনি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও বাংলার দুই গর্ভনর লর্ড কারমাইকেল ও রোনাল্ডসের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। লর্ই কারমাইকেল তাঁহার সংগীতের প্রতি এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁহার ঢাকায় অবস্থান কালে প্রতি সপ্তাহে একবার তাঁহার সম্মুখে ভগবান চন্দ্রকে সেতার পরিবেশনার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মহাত্মাগান্ধী ও ভগবান দাসকে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশনারজন্য প্রশংসাসূচক অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করেন। তাঁহার অগনিত শিষ্যের মধ্যে ঢাকার হাফিজনা খাঁন ইন্দ্রমোহন দাস ও তদীয় ভ্রাতা শ্যামচাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকেই সেতার বাদনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

ইন্দ্রমোহন "তোড়ি" গৎ-এ বাংলার শ্রেষ্ঠ বাদকদের অনত্যতম। যিনি একবার ভগবান চন্দ্রের সেতার, প্রসন্ন কুমারের

Dhaka University Institutional Repository

তবলার সহায়তার কথা শুনিয়াছেন তিনি সেই অভিজ্ঞতার কথা সারাজীবনেও ভুলতে পারবেন না।

প্রাচীন সংগীতজ্ঞদের বহু "তোড়ী গৎ" তাঁহার করায়ত্বে। ঢাকার ধ্রুপদী সাংগীতিক ঐতিহ্যের আরো একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ননাটি নিম্নরুপ ঃ- বাংলায় ব্যাপকভাবে এবং ঢাকায় বিশেষ ভাবে তবলা বাদনের চর্চা ছিল। এখানে প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী তবলা বাদকদের সর্বদা আনা গোনা ছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগন ও তবলা বাদনে পারদর্শিতা অর্জন করেন, ওয়াজেদ আলী সাহেব বিশেষ তবলা বাদক হুসেন বক্সের পুত্র আতা হোসেন পিতার মতন পারদশিতা অর্জন করেন।

আতা হুসেন বহুকাল যাবৎ ঢাকায় ছিলেন এখানকার উচ্চবর্গের গন্যমান্যজন তাঁহাকে প্রভুত সম্মান করিতেন। স্থানীয় তবলা বাদক 'খয়রাতী জমাদার' ছিলেন। প্রসিদ্ধ তবলা বাদক দুনী খাঁন প্রথমে তাহার শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মেটিয়াবোরূজে হোসেন বক্সের নিকট তালিম গ্রহন করেন।

হুসেন বক্স কয়েকবার ঢাকায় আসেন আরো একজন আতা হোসেন ছিলেন। তাঁহাকে পাথর চকের আতা হোসেন বলা হইত। তিনি লখনৌর অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বোক আতা হুসেনের শিষ্য ছিলেন। শতবর্ষে পূর্বে লৌখনোর মিঠন খাঁন একজন বড় গায়ক ছিলেন। হাত ও গলার এই রুপ সমন্বয় খুব কর্ম ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। তিনি ও চালায আসেন স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। মিঠন স্বপন খাঁনের নানা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপন খাঁনকে আমরা দেখিয়াছি তাঁহার বাদনও শুনিয়াছি। আমাদের বাল্যকালে স্বপন খানের নাম বহুদূর ছড়াইয়া পড়ে। স্বপন খান ও প্রথমে জমাদারের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি হুসেন বক্সের নিকট তালিম গ্রহনকরেন।

স্বপন খানের সাগরিদের মধ্যে খাজা আহম্মদ বক্স বাহাদুর খান ও কাজী অ'লাউদ্দিন মরহুম প্রসিদ্ধ তবলবাদক ছিলেন। স্বপন খাঁনের এক সাগরিদের নামও স্বপন খান ছিল। তিনি ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ সাজকর ছিলেন। তবলাও ভাল বাজাইতে পরিতেন। ঐ সময় হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকা এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সম্মান ও খ্যাতির প্রত্যাশায় বারংবার ঢাকায় আসিতেন এবং বছরের পর বছর এইখানে থাকিতেন। এমনকি এই স্থানের মোহে পাড়িয়া অনেকে মিঠন খাঁনের মত থাকিয়া যাইতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কুমিল্লা ময়মনসিংহ ও সিলেটের নেতৃস্তানীয় ব্যক্তিদের (সরদারদের) সাথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একজন প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ছিলেন কাশেম আলী খাঁন আগরতলা মহারাজ তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদা কাশ্মীরের অধিবাসী ফয়জুদীন গানের সুমধুর কন্ঠের খ্যাতি এখনো বর্তমান। আরেকজন পাঞ্জাবী গায়ক রওশন খাঁন 'ভাগ' গাহিতে পারদর্শী ছিলেন। মোহাম্মদ খানের সাগরিদ কুল্লু খাঁন একজন বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মহল্লা চৌধুরী বাজারের অধিবাসী হাকিম রমজান আলী একজন বিখ্যাত ঠুমরী গায়ক। শহরের প্রসিদ্ধ সর্দার মীর আলী মেহেদী ওস্তাদ মিঠন খানের সাগরিদ ছিলেন।

মীর আলী মেহেদী, সৈয়দ আজাদ প্রমুখ খেয়ালগায়কবৃন্দ নবাব সৈয়দ মোহাম্মদের নিকট হইতে অর্থানুকুল্য পাইতেন। মীর গোলাম মোস্তফা মরহুমকে "মির্জা গালিবের" শিষ্য বলা হইত, তিনিও খেয়াল গাহিতেন। তিনি ঢিলা পায়জামা এবং রূমীটুপী এবং আজানুলম্বিত কূর্তা পরিতেন।

সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাজা আব্দুর রহিম খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও নৃত্যগীত সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

খাজা শাহজাদা সাহেবও হারমোনিয়াম ও মার্গসংগীতে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ চমৎকার তবলা বাজাইতেন।

রাজার মজলিসে শাহজাদা মরহুম তৃতীয় গায়ক ছিলেন। খাজা শাহজাদা এবং নবাব সাহেব ঠুম্‌রী এবং হোরী লিখিতেন।

কাশিমপুরের সারদা বাবুর তবলা ও বিখ্যাত। তিনি ও অসাধারণ তবলা বাজাইতেন।

ভিখন ঠাকুরের জমিদারীর মালিক রাজাবাবু গান বাজনার খুব কদর করিতেন। তিনি নিজেও ওস্তাদ হুসেন বক্সের অন্যতম শিষ্য। আতা হুসেন এক সময় তাঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা বাবু ও উত্তম তবলা বাজাইতেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়নের পিতা রাজা

Dhaka University Institutional Repository

কালী নারায়ন একজন ভাল গায়ক ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল এবং জগলে পাদর্শী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি টপ্পার অনুরক্ত হইয়া ছিলেন। নবাবপুরের বসাকদের মধ্যে এক প্রকারের রাগসংগীতের প্রচলন ছিল।

খয়রাতি জমাদারের সাগরেদ রামকুমার কিশোরী মোহন বসাক তবলা ও পাখোয়াজে, প্রসিদ্ধ লাভ করেন। শেষোক্ত জনের নৈপূন্য কথা উল্লেখ্য। রামকুমার বসাক আগর তলার মহারাজের নিকট থাকিতেন। মহারাজ নিজেও পরদর্শী ছিলেন। পুনিয়ার জমিদার রাধিকাবাবুও, সুকন্ঠ গায়ক তবলাবাদক ছিলেন, তিনি দুনি খানের নিকট হইতে তালিম প্রাপ্ত হন।

ঐ সময় ঢাকায় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচুর সমাজদার ছিল। অনেকেই পেশা হিসেবে গান বাজনা করিতেন। হাসনু গায়িকাও ছিল তখনকার সময়ে একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা। তিনি লক্ষ্মীপুর বাজারে থাকিতেন, খর্বাকৃতি ছিলেন। হরি কর্মকার গীতিবাদ্যে সমান পারদর্শী ছিলেন। এমদাদ খাঁন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি মন্ডিতে থাকিতেন, বৃদ্ধবয়সে মারা যান। হিন্দুদের নিকট তাঁহার প্রচুর সমাদর ছিল। পেশাজীবী গায়কদের মধ্যে আহমদ আলী খাঁন ও কাশেম আলী খাঁন বাংলায় বহিরাগত হইলেও ঢাকায় থাকিতনে।

কৃষ্টদাস সূত্রধর, হরিনাথ পাখোয়াজে পারদর্শী ছিলেন। এনায়েত বিখ্যাত সরোদ বাদক ছিলেন। জয়েদেবপুরে তাঁহার কবর আছে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382711

Dhaka University Institutional Repository

এদেশে সেতার এর বিলক্ষন কদর ছিল। এই সেতারের জন্যই আমির খসরু অনেক দিন যাবৎ বাংলাদেশে ছিলেন। ঢাকার মকীমপুরের অধিবাসী নবাব সৈয়দ আব্দুস সোবাহান সাহেবও সুন্দর সেতার বাজাইতে পারতেন দেওয়ান মিনু মিয়াও প্রসিদ্ধ সেতারী ছিলেন। পেশাজীবী সেতারীদের মধ্যে ভগবানদাস বৈরাগী ও তাঁর ভ্রাতা শিয়ামদাস (শ্যামচাঁদ দাস) উত্তম সেতারবাদক ছিলেন। এই দুই ভাই চরিত্রবান এবং তাঁরা শান্তিপুরের নবীনচন্দ্র গোস্বামীর সাগরিদ ছিলেন। উভয়ে পরিণত বয়সে মারা যান।

গনি মিয়ার "চায়ের আসর" তৎকালীন সময়ে উল্লেখ্য এক আসর ছিল। নওয়াব আব্দুল গানীর প্রতি সকালের চায়ের আসরে শহরের শহুর "রেন্ডী" (নাচ গানে পারঙ্গম নারী) সমবেত হইতেন সেই আসরে সঙ্গীতও পরিবেশিত হইত গনি মিয়ার প্রাত্যহিক চা পানের আসরে যে সমস্ত 'বেন্ডী' উপস্থিত থাকিতেন তাহাদের একটি দীর্ঘ তালিকা ছিল এবং তাঁহারা নবার সরকার হইতে মাসিক । ভাতা পাইতেন। এই সমস্ত 'রেন্ডী' মহিলারা ছিলেন হিন্দুস্থানী, তাঁহাদের মধ্যে তাহাদের কয়েকজনের নাম আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন যাঁহারা তিনজন ভগ্নী। ইহাদের মধ্যে নওয়াবীন বিলকন প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বয়সে তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ, কিছুদিন আগে নওয়াবীর বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ী ছিল এখন তাদের বংশ ধরেরা, সেই ভবনসমূহে বসবাস করেন। "আবেদী" সম্ভবত পাটনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর এক কন্যা এখন ও বর্তমান, পেয়ারে সাহেব নি:সন্তান ছিলেন। তিনি মাইহায়ের অধিবাসী ছিলেন। আচ্ছি সাহেবের খাঁটি লাখনৌর অধিবাসী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি নৃত্যে খুব পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার মত শরীফ মেজাজ উচ্চ মানের 'রেন্ডী' ঢাকায় আসেন নাই।

তাহার নিকট হইতে অনেকেই নাচ শিখিয়াছিলেন।'আনু' দেখিতে যদিও কৃষ্ণবর্ণ ও স্থুলকারা ছিলেন তাহার আদি বাড়ী ছিল পাটনায়। নিজের সাবেকী পেশা ছাড়িয়া বাঈজী হন। তাঁহার মেয়েটি অল্প বয়সে মারা যায়। এই কন্যাটিও সুন্দর গান গাহিতে পারিত। শ্যামাঙ্গী "হিরকার" নাচ প্রৌঢ় বয়সেও ছিল অসাধারণ। তাঁহার কন্যা "পান্না" গজলে 'নৃত্যে' বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।"আমামন" উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার এক বংশধর এখনও ঢাকায় জীবিত। অপরাপর জনও ঢাকাতে সমাহিত। আমিরজান নাচেও গানে মশহুর ছিলেন । উপরোক্ত বহিরাগতদের ছাড়া স্থানীয় হিন্দু রেন্ডী ও প্রচুর ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অতুল ভাই, লক্ষী ভাই, কালী ভাই রাজ লক্ষ্মীর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

জিন্দাবাহারের মোড়ের ঝড়তুফানে ধ্বংস প্রাপ্তির পর পুনর্নির্মিত কালীমন্দির রাজলক্ষ্মীর বদান্যতার স্মৃতি বহন করিতেছে।

বাংলার দলবদ্ধভাবে নাচ খেমটাও ঢাকায় প্রচলিত ছিল। একটি ভাড়া করা ঘরে তাস শতরঞ্জ, খানজফা, সাত গুঁটির খেলা পাচ্ছী খেলার সঙ্গে এই খেমটা নাচের আয়োজন ছিল। তদুপরি ঢোল, তবলা, বেহালা, সেতার, তাম্বরা, বাঁশী, হারমোনিয়াম ও থাকিত সবাই নিজ নিজ অভিরুচি খেলাধূলা কিংবা গান বাজনা করিত।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব স্যার আহসান উল্লাহ ও তাঁর পিতা আব্দুল গনির খিদমতে। লাখনৌ, রামপুর, বেনারস হইতে 'ডেমিনীদের আগমন হইত এবং তাঁহারা সারা বছর ঢাকায় অবস্থান করিতেন। ইহাদের মধ্যে আনেকেই মারা গিয়াছেন। অবশিষ্টরা এখনও স্থানীয় গুনমুগ্ধজনের আনুকূল্যের আশায় আসিয়া থকেন। তবে এখনকার শিল্পীদের সংগীতের মান আর আগের মত নাই। শুধু অতীতের স্মৃতি লইয়াই তাহাদের অশ্রুপাত। সেই অশ্রুপাতও প্রানহীন। অযোধ্যায় এখনও কিছু গান বাজনার রেওয়াজ আছে, যদিও উহাতে যথাযথ মানের বড়ই অভাব।

হিন্দুস্থানের অপরাপর অনেক স্থানের ন্যায় ঢাকায়ও বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সংগীতের মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হইতে। ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শুধু ঢোলক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তবে 'হারমোনিয়ামও ' এরও বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সামাজিক জীবনের পরিবর্তন এভাবে ঘটতে থাকে। পুরাতন সাংগীতিক ধারার এভাবেই অবনতি ঘটে।

ক্রমান্বয়ে প্রাচীন গায়নরীতি ও সংগীত চর্চ্চা এক্ষনে তরলীকৃত কারণের প্রবণতা আসিয়াছে। স্কুলে এমন গান বাজনাই শিক্ষাদান করা হইতেছে। ইহা যেন অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসানো।

কোম্পানীর আমলের ঢাকার বিবরণ পাওয়া যায় ঢাকার তৎকালীন সার্জন জেমস টেলরের ১৮৪০ সালের টেপ্যে গ্রাফী অব ঢাকা' থেকে। টেলরের বর্ননাটি নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

'হিন্দুদের ব্যবহৃত বেহালা বহুল প্রচলিত। কিন্তু এর স্থান সম্ভবত ভায়োলিন দখল করতে পারে, এটি সম্প্রতি দেশের এ অংশে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভায়োলিন তৈরীর জন্য শহরে বেশ কয়েকটি কারখানা আছে।

এ ছাড়া প্রতি বছর নির্মিত যন্ত্রের সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয যে, চতুষ্পর্শ্বস্থ আঞ্চলসমূহে এ সব যন্ত্রের বিরাট চাহিদা রয়েছে।

গোসাঁই ও বৈরাগীরা এর প্রধান বাদক ও বাজনাদার। মুসলমানদের মধ্যে সংগীত বিষয়ক প্রিয় বাদ্যযন্ত্র সেতার। বেহালার মতো একটি পশ্চিমী সংগীত যন্ত্রের ঢাকায় এমন বাহুল ব্যবহারের বিষয়টি আশ্চর্যজনক হলেও কর্নেল ডেভিডসনের বর্ণনায় ও এ তথ্য সমর্থিত। ডেভিডসনের বর্ননা অনুযায়ী দু'টাকা বা চার শিলিংএ একটি বেহালা কিনতে পাওয়া যায় ঢাকা শহরে। এমন কি চার শিলিংএ চমৎকার কাঠের তৈরী বেহালাও ছড় সুলভ্য। তাই যিনিই ঢাকায় আসেন যাবার সময় অনিবার্যভাবেই নিয়ে যান অন্তত একটি বেহালা। শহরে রাতে কি দিন রাতে বেহালার বাজনার শব্দ শোনা যায়। ডেভিডসনের মন্তব্য-আসলে এখানকার লোক গান-অন্তপ্রান 'মিউজিকাল পিল'। রাতে পথে হাঁটতে গেলে একটি পরিচিত দৃশ্যঃ পথের পাশের দোকানে যেতো একজন কারিগর বেহালা তৈরীতে ব্যস্ত, নিপুণ অক্লান্ত হাতে। আরতার সঙ্গী মগ্ন বেহালা বা সংগীত বাদনে। কিংবা সাক্ষাৎ মিলবে দলবদ্ধ ভাবে চলে যাওয়া কিছু মানুষের সবার গলায় উঁচু পর্দায় গান।

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশকে পুরানো ঢাকায় বিভিন্ন রাস্তার পাশের সংগীত যন্ত্রের দোকানে গভীর রাতেও যন্ত্রীকে হারমোনিয়াম এস্রাজ , তানপুরা, কি সেতার তৈরী করতে কি বাজাতে দেখা যেত।

তবে বেহালার সন্ধান তেমন ছিল না। এক সময়ে যে যন্ত্রটির এত ব্যবহার ছিল সে যন্ত্রটির প্রচলন কি করে এত কমল ?

পরবর্তীকালের বিশ শতকের প্রথম তিন দশক বা দেশ বিভাগ কাল পর্যন্ত ঢাকার শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চ্চার একটি মুল্যবান বিবরন পাওয়া যায়, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বিবরন থেকে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ঢাকার সবচেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের গুনী ছিলেন। মৈশুন্ডীর ওস্তাদ মৈদাদ আলী। তারপরই যাঁর নাম করতে হয় তিনি ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন, যিনি ছিলেন ওস্তাদ মুনীর হোসেনের পিতা, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন এবং তাঁর কন্যা সনজীদা খাতুন ছিলেন মোহাম্মদ হোসেনের শিষ্যা, অপর কন্যা ফাহমিদা খাতুন ছিলেন মুনীর হোসেনের ছাত্রী। ফেরদৌসী রহমানও মুনীর হোসেন সাহেবের শিষ্যা ছিলেন।

ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁন আগ্রা ঘরানার ফেরদৌসী প্রবক্তা বিশের দশকে ঢাকায় আসেন ওস্তাদ ইউসুফ খাঁন কোরেশী এবং ইয়াসীন খাঁন তাঁর পুত্র। লায়লা আর্জুমান্দ বানু ওঁদের ছাত্রী ছিলেন।

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন ত্রিশের দশকের শুরু থেকে। ফেরদৌসী রহমান ; রওশন আরা মাসুদ তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ওস্তাদ মাস্তান গামা, ওস্তাদ লতাফাত হোসেন খাঁ ঢাকায় আসেন। তবে টিকতে

Dhaka University Institutional Repository

পরেননি। একমাত্র ওস্তাদ মাস্তান খাঁন ছাড়া সবাই ভারতে চলে যান। ভারত বিভাগের কাল পর্যন্ত খেয়াল শিল্পী হিসাবে নাম করেছিলেন শ্রীগৌর বসাক আর তবলায় গোপাল বসাক।

ইতিপূর্বে যন্ত্রশিল্পী রুপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শ্যাম বসাক (এস্রাজে) ভগবান দাস (সেতারে) ওয়ালীউল্লাহ খান (সেতারে) এবং স্বামী বাগের মনোরঞ্জন ব্যানার্জী (সেতারে)।

সানাই চর্চা করতেন ঢাকার প্রবাসী বিহারী কর্মজীবিরা ।

চৌধুরী বাজারের বাঙালী হিন্দুরা চৈত্রমাসে সদর ঘাটে শট নিরবে পূজা করতেন। তাতে ও অন্যাত্র পূজার সময় হিন্দুদের বিবাহ উৎসবে বিহারী সানাইবাদকেরা বাজাতেন।

তৎকালীন সময়ে ঢাকাইয়া হিন্দুরা কীর্তনে তেমন পারদর্শী ছিলেন না। ঢাকায় কীর্তনের আসর বসাতেন রায় সাহেবের বাজারের ফল তরিতরকারী বিক্রেতা ব্রাহ্মানবাড়ীয়ার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খোল করতাল নিয়ে।

ঢাকায় বিভাগপূর্ব যুগে এক ঘর সারেংগী বাদক বসবাস করতেন মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে চকের দিকে যাবার রাস্তায়, যেখানে চীনাদের জুতার দোকান ছিল তার ঠিক উল্টা দিকে। এরা ইসলামপুর রোড অঞ্চলের বাঈজিদের গানের সাথে রাতে সঙ্গত করতেন আর দিনে রেওয়াজ করতেন তাঁদের অবস্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

মুকুল ও রূপমহল সিনেমার শব্দবিহীন চলচিত্রের যুগে নীরব ছবির আগাগোড়া একদল বেহালা বাজাতেন, যার মধ্যে থাকতেন তিন কড়ি বান্দ্যোপাধ্যায় ও সহশিল্পী বৃন্দ।

লায়ন ডায়মন্ড থিয়েটারে সখের থিয়েটারের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বাইজীদের নাচগান যাঁদের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নাম ছিল বিদ্যুৎময়ী ও মতিবালা।

অধ্যাপক ডঃ এস.এন রায়ের বড় ভাই মন্মথ বাবু ওরফে পিলুবাবু বিভাগ পূর্ব যুগের নাম করা এস্রাজবাদক ছিলেন। বকসী বাজারে ছিল পিলু বাবুর আস্তানা যার নাম ছিল "বীনা মন্দির"।

পিলু বাবু মেহগনি কাঠ দিয়ে ভালো এস্রাজ ও সেতার বানাতেন। সেগুলো সাধকদের সরবারহ করতেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সেবাইত সুরেন চক্রবর্তী।

ঢাকায় নামকরা বাদ্যযন্ত্রের দোকান ছিল" সুরেন কোম্পনী" "গোপাল ক্মেপানী" আর "যতীন কোম্পানী"।

যতীন মন্ডলের হারমোনিয়াম ছিল নামকরা। সমর দাসের বাবার বাদ্য যন্ত্রের দোকান ছিল ব্যাপটিস্ট্র মিশনের কোনায়। সেখানে পিয়ানো, অগান মেরামত ও টিউনিং করা হত। সমর দাসের কাকা রবি দাস বিভাগপূর্ব যুগে ঢাকার একমাত্র গীটার বাদক ছিলেন।

ঢাকায় বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর যে সব যন্ত্রী বা যন্ত্রসংগীত শিল্পী ঢাকা বেতারে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেহালা বাদক

Dhaka University Institutional Repository

পরিতোষ শীল, এবং এস্রাজ ও তার সানাই বাদক প্রিয়লান চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পর তাঁরা কলকাতা বেতারে চলে যান।

বর্তমান শতকের ঢাকার প্রথম দিকের শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার কথা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু জানান যে, ১৯৩০-৩৫ সালে এখনকার আজাদ সিনেমা হলের পাশে একটি গলিতে গানের স্কুল খোলেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান। ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁনের শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয়ের আত্মজা নোটন, যাঁর গুনের সাথে রুপের খ্যাতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন প্রতিভা বসু, থেকে জানা যায়, সে সময়ের ঢাকায় প্রায়ই শাস্ত্রীয় সংগীতসহ বিভিন্ন সংগীতের চর্চা হত। নিয়মিত মহলিফ বসত যাঁদের বাড়িতে তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্র নাথ বসুর আয়োজিত এমনি এক অনুষ্ঠানে আসেন প্রথম দিলীপ কুমার রায় এবং পরে কাজী নজরুল ইসলাম।

আঠার শতকের মধ্য হতে মোগল যুগে শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যমত চর্চাকেন্দ্র ঢাকার অবক্ষয় শুরু হয়। অন্যদিকে নব্য বিত্তের তীর্থস্থান কলকাতায় তার যথাযোগ্য সমাদরের ক্ষেত্র প্রস্তত হয়নি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত। ওস্তাদ খায়ের সমাদর দূরে থাক, ধ্রুপদ, খেয়াল এ সবই ছিল সেকালের কলকাতাবাসীর জন্যে অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দরুন কলকাতা অভিমুখী ভাগ্যান্বেষী কলাবিদদের যে মাইগ্রেশনের শুরু তার সাথে যুক্ত হয়েছে লখনৌ এর নবান ওয়াজেদ আলী শাহের কলকাতায় নিবাসনের ফলে মেটিয়াবুরুজের সংগীতিক আবহাওয়া।

শাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে কোলকাতাবাসীর সেই প্রথম যথার্থ পরিচর। ওয়াজেদ আলীশাহ্ আরোহ সৃষ্টি করেছিলেন। তারি ফলে বাংলার সংগীতের ক্ষেত্রে নিধুবাবুর কালী মির্জার রাগাস্ত্রয়ী সঙগীত রচনার ধারায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল রজনী কান্ত অতুল প্রসাদের প্রতিভাব প্রসাদে পুস্ট হয এই ধারা সেই সাথে যুক্ত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইতিমধ্যে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জায়মান নতুন নগরী কলকাতয় যে ব্যাপক হারে আগমন তার মূল্য দিতে হয়েছে শুধু ঢাকাকেই নয়, পূর্বঙ্গের অপরাপর অঞ্চলকেও। যেমন রাজশাহীর ময়মনসিংহের মত অঞ্চলকেও স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসার হলেও অবশেষে তা অভিমুখী হয়েছে কোলকাতার দিকে প্রায় অনিবার্য ভাবেই। এই সর্বগ্রাসী আকর্ষন হতে রেহাই পায়নি কুমিল্লার মত ত্রিপুরার রাজ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও।

এই মাইগ্রেশন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে দুই মহা যুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা সময়ে। ১৯৪৭ দেশ বিভাগের রাজনৈতিক টানা পোড়নে এবং সর্বউপরী একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, যার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর এতদ অঞ্চলিক বিলুপ্তি একাত্তরে হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও মানসি কতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচ্ছায়া এখনও দূরনিরীক্ষন নয়।

সুকুমার শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মের অপব্যাখ্যার কল্যানে যে অনীহার সৃষ্টি হয় তার সাথে যুক্ত হয়েছে পাশ্চত্যর পাটোযারী বুদ্ধি সঞ্জাত " মাস এন্টারটেইন মেন্ট" তথা বাজারি বিনোদনের অবাধ আগ্রাসন। এই জগঝম্পের অবিলতার মধ্যে নিজ ঐতিহ্য সচেনতার শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বপক্ষে এগিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন সেই মানসিকতা, আজকের প্রজন্ম তার থেকে কত দূরে।

উনবিংশ শতাব্দী আমাদের শিল্প সাহিত্য সংগীতের দিক থেকে একটি নবজাগরনের কাল। এই সময়ে সংগীতের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা চিন্তা ও উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল। সংগীত সংরক্ষন নবরূপ প্রণয়ন ও প্রচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক উদ্যোগ এই শতাব্দী জুড়ে ব্যাপকভাবে ও সম্মেলক উৎসাহে জেগে উঠেছিল। ফলে রাগ সংগীত চর্চার প্রচার ও প্রসারে বাংলা সংগীত ও সৃষ্টিকাল ও সুদূর প্রসারী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

রামপ্রসাদী গানের পরই বাংলা সংগীতের সৃজনপর্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সে কারনেই কবিগান হাফ আখড়াই তরজা, খেঁউড়, পক্ষীদলের গান, প্রভৃতি গীতরীতিতে সৃজনের মত্ততা আছে, কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই। এমনি এক ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দী নিয়ে এলো কাব্যসংগীতের চমকপ্রদ নিদর্শন। যার প্রধান উদ্যোগতা রামনিধি গুপ্ত(১৭৪১-১৮৩৯) যিনি নিধুবাবু নামে সমাধিক পরিচিত। এই নিধু বাবুকে দিয়ে বাংলা কাব্যগীতির শুভ সূচনা আর পঞ্চগীতি কবির গানের এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

চাকুরী সূত্রে বিহারে ছাপড়ায় বসবাসকালে পশ্চিমী ওস্তাদদের কাছে নিধুবাবু রাগসংগীত ও হিন্দুস্থানী টপ্পা (পাঞ্জাবী, শোরীমিএঞা টপ্পা) শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে নিধুবাবু প্রেমগীতি ও টপ্পা রচনা করেছিলেন। তবে, হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুসরণে নিধুবাবুর টপ্পা রচিত হলেও প্রকৃতিতে তা বাংলা টপ্পা। সংগীতের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন চিন্তা ভাবনা পরবর্তীকালে পথিকৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ্য যে, বর্তমান নিবন্ধে রাগ সংগীত বলতে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীকে বুঝানো হয়েছে, এবং রাগ সংগীত চর্চায় সূত্র ধরে বাংলা সংগীতে তার প্রতিফলন ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছে তা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের কালে যেসব নব নব ভাবনা ও প্রয়াস সংগীতের ক্ষেত্রে ঘটেছিল রাগসংগীতের ও বাংলাসংগীতের বিকাশ সাধনে তার একটি সঙক্ষিপ্ত উদ্যোগ চিত্র প্রকাশ করা যায়। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানত ঃ-

১। নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গীতরচনা এবং এই সেই গানের ভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গীতিরীতির অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

মূখ্যত ধ্রুপদ, খেয়াল, টান খেয়াল, টপ্পা ঠমরী প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোত্তরন ঘটে।

২। সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে আগ্রহও অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগীত সংক্রান্ত প্রচার প্রসারে সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ।

৩। সংস্কৃত ফার্সি ভাষায় রচিত সঙ্গীত বিষয়ক কোষগ্রন্থ সমূহের বাংলা অনুবাদ সংগীত সংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ততা আন্তজাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

৪। সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে তরুন শিক্ষার্তীদের শিক্ষাদান, স্বদেশে সংগীতের মনোনায়নের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সংগীত উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

৫। প্রাচীন গীতিকার ও সংগীতকারের জীবনী রচনা ও গীত সংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবাহমান গানের সাথে নবীন সংগীতানুরাগীদের সেত বন্ধন।

৬। হিন্দুস্থানী কন্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদ্যের কারানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরন বাংলা ও ইংরেজী ভাসায় রচনা করে বিশ্ব সভায় এই উপমহাদেশীয় সংগীতের বহু শতাব্দী বাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

৭। দেশে বিদেশে প্রচলিত নানা রকমের স্বরলিপি পদ্ধতির সারাৎসার করে সর্বজনবোধ্য একটি স্বরলিপি পদ্ধতি প্রণয়ন এর

Dhaka University Institutional Repository

তার সহায়তায় রাগ সংগীত ও বাংলা সংগীতের গানের প্রচার প্রসার সংরক্ষন।

৮। হার্মনি, অর্কেস্ট্রা, অপেরা কাউন্টার পায়েন্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুর বৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি রাগ সংগীত ও বাংলাসংগীতে কণ্ঠও বাদ্য যন্ত্রসংগীত গ্রহন ও ভাব প্রকাশের নতুন উপদান রূপে ব্যবহার। সংগীত সভা, সংগীত সম্মেলন (Conference) প্রভৃতি আয়োজন ও কার্যক্রম, সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে উল্লেখিত সংগাতিক প্রয়াসগুলি প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে বাংলায় রাগ সংগীত ব্যাপক ভাবে রচিত হলো ও বাংলা সংগীত বিষয় বৈচিত্র্য আর সুর বৈচিত্র্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করলো।

উল্লেখ থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় অভিজাত মুসলমান পরিবারে “আখড়া” (আখারা) নামক রাগ সংগীত অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে তা সাধারণ্যেও প্রবেশ লাভ করে। আখড়াই গান পুরোপুরি রাগ সংগীত। এই রাগ সংগীতের ধারা নিশ্চয়ই ক্রমে আমাদের গায়ন সমাজে অনুপ্রেবশ করেছিল। কিন্তু তার ইতিহাস অনেকটা অজানা রয়ে গেছে। তবে এটা অবশ্যই বোঝা যায় যে, মোগল যুগের শেষ ফসল বাংলাতেও ফলেছে। সুদীর্ঘ ও সুলম্ব এই কবিগানের ঠিক বিপরীত হলো চৌপদীতে সীমাবদ্ধ ছোট্র গান, যা পরোপুরি রাগ সংগীত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কোন আদর্শের অনুসরনে এই ধরনের ছোট ছোট গান রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ পাওয়া যায় না। কারো মতে, সংস্কৃত ছুট চৌপদী

Dhaka University Institutional Repository

(যেমন অমরু শতকেতর শ্রোখ) থেকে এই সব গানের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

আবার কারো মতে চৌপদী ফার্সী কবিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সংস্কৃত ও ফার্সী এই দুই রীতির মধ্যে অনেকাংশে মিল আছে। দুটিতে গ্রন্থন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুসমন্ধ এবং গভীর ভাব ব্যঞ্জক। তখন ফার্সী চৌপদা অনেকেরই মুখস্ত ছিল। সেগুলি ভেঙ্গে গান রচনা করবার প্রয়াসই স্বাভাবিক। সমসাময়িক হিন্দি খেয়াল ঠিক এই রকম চৌপদী ছিল; টপ্পা ঠুংরী ও ছিল তদনুরূপ'।

বাংলায় রাগসংগীত গায়ক বা তার প্রচলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ না পেলেও রাগ সংগীত যে এদেশে ভালভাবেই প্রবেশ করেছিল এ সম্বন্ধে সন্দেই নেই। এর সাক্ষ্যত প্রমান হল ১৮১৮ সালে (১২২৫) রাধা মোহন সেন কতৃক রচিত "সংগীত তরঙ্গ নামক কাব্য গ্রন্থ। আনুমানিক ১৬৭৪ খৃষ্টাবেদ লিখিত মির্জা খানের তুহ ফাৎ উল-হিন্দু নামে ফাসি ভাষায লেখা সংগীত কোষ অবলম্বনে রাধামোহন বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংগীতের কোষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

সংগীত তরঙ্গ গ্রন্থটি আসলে ভারতের সংগীত আকর গ্রন্থের সারানুবাদ প্রয়াস এ সম্বন্ধে বলেছেন-

প্রাচীন তাবৎ গ্রন্থে নামপ্রকরণ।

নাদ পুরানের মত প্রকাশ লক্ষন। কিন্তু তাতে নব্য দেশী রাগদি অভাব। সংগীত তরঙ্গের আছে তাহার প্রভাব। এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

নিধুবাবুর রাতে গীত রত্ন বহু বরে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছিল। তবে এ দু'জনের রচনার প্রমান মিলে যে, বাংলায় এই রকম ছোটো ছোটো রাগ সংগীতই প্রচলিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে এ একটা বিশেষত্ব লক্ষনীয় যে, বাংলা গানে যখন রাগ সংগীত প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন তাতে বাংলার আদশই প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দী গান এবং বাংলা রাগ সংগীত দুটো পাশাপাশি চলে এসেছে নিজের স্বাতন্দ্র্য রক্ষা করে। রাধামোহোন সেন নিজে রাগ সংগীত রচনা করেও প্রমান করেছেন যে বাংলার একটা স্বতন্ত্র ধারা ছিল।

বাংলায় যখন রাগ সংগীতে ধারায় খেয়াল টপ্পার প্রতিষ্ঠা হলো তখন তাকে একটা আলাদা শ্রেনী হিসাবে বিচার করে, সেই ভাষার গুনাগুনের প্রতি দৃষ্টি রেখে রাগ সংগীতকে আরোপ করা হলো। এই ভাবধারাটাই কার্যকর চেয়েছিল বর্তমান শতকের প্রথম তিন দাশক পর্যন্ত। আরো একটা ব্যাপার ছিল যারা রাগ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারা কবি গানেরও ভক্ত ছিলেন, কীর্তন কথকতা পাঁচালি ও তাদের আনুকল্যে অনুষ্ঠিত হতো।

সমস্ত পরিবেশটাই ছিল বাংলার পরিবেশ। সেকানে হিন্দী গানের সমাদর যে হতো না, এমন নয়। কিন্তু আগ্রহাটাই ছিল বাংলা গানের দিকে। তাই রাগ সংগীত নিয়ে একটি দেশী চালের পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছিল জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষন থেকেই আখড়াই গানের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছিল এই প্রেরনা থেকেই সব মিলিয়ে দেখা গেল বাংলা রাগ সংগীত আপনার নিয়মে চমৎকার ভাবে গড়ে উঠেছে। হিন্দী

Dhaka University Institutional Repository

গানের সঙ্গে বাংলা রগসঙ্গীতের চর্চ্চায় তাই হীনমন্যতার কোন আভাস ছিল না।

রাগ সঙ্গীতের এই স্বাধীন বিকাশে বাংলা সংগীতের ও অগ্রগতি ঘটেছে। বড়ো বড়ো তাবৎ রাগতো বাংলা গানে যুক্ত হতোই এ ছাড়া মিশ্র রাগ, যাকে আমরা কুট রাগ বলে থাকি। তার পরিকল্পনা ও কর্ম হয়নি। উল্লেখ্য কিছু রাগ কাহনী থেকে তা জানা যায়।

১.। ললিত ভেঁরো, আনন্দ ভৈরব, যোগীয়া ভৈরব, পরজ ভৈরব, পরজ বাহার, আশা ভৈরবী, সিন্ধু ভৈরবী, ভৈরবী, বহার, টৌড়ি ভৈরবী, শ্যামপুররী, গৌরীপুরিয়া, ধনেশ্রীপুরিয়া, বিভাস কল্যান, পুরবী কল্যান, ইমনভুপালি, ইমনকল্যান ইমনপুরিয়া ইমন ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট , সিন্ধু খাম্বাজ কামোদ.প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে রাম নিধিগুপ্তই প্রায় পঁচিশ রকম মিশ্ররাগের পরিকল্পনা করেছিলন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও তার গানে প্রায়ই মিশ্র রাগ ব্যবহার করেছেন।

রাধা মোহনের পর উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে মোহন গোস্বামী (১৮২৩-৯৩) ও রাজা শোরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের (১৮৪০-১৯১৪) নাম এই দুই অসামান্য সংগীতবিদ প্রাচীন সংগীত ও ভারতীয় সংগীতের স্বাতন্ত্র্য প্রচারে সংগ্রাম করে গেছে। রাজা শৌরীন্দ্র মোহন একটি "মিউজিক একাডেমীর সূচনা করেন। এই একডেমির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "সংগীত সার (১৮৬৯) যন্ত্রকেন্দ্রে "দীপিকা" (১৮৭২) 'কন্ঠকৌমুদী' (১৮৭৫) এবং "জয়দেবের গীত গোবিন্দের" অন্তর্গত কয়েক টি গানের স্বরলিপি (১৮৭১)। রাজা

Dhaka University Institutional Repository

শৌরীন্দ্র মোহনের সুরশ্রেষ্ঠকীর্তি (Universal History of music) গ্রন্থ রচনা ।

শৌরীন্দ্র মোহনের পর সংগীতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪) । স্বদেশে সংগীত প্রচারের জন্য সারা জীবন আত্মদান করেছেন। ইউরোপীয় সংকেতিক স্বরলিপি এদেশে প্রচার করার ইচ্ছে ছিল । কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি । কেননা জ্যোতিবিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপিই সকলে গ্রহন করেন ও বাহুল প্রচলিত হয়ে উঠে ।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য, "বঙ্গৈক তাল (১৮৬৭) Hindustnai Air arranged for the Pian ofoy yet (১৮৬৮), সংগীত শিক্ষা সেতার শিক্ষা (১৮৭৩) । এই সব গ্রন্থ রচনার পাশ্চ্যাতে পাশ্চত্য সুরকে এদেশে গ্রহন করার এবং দেশী বিদেশী যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রমান মিলে । কিন্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি 'গীতসূত্রসার" (১৮৮৫) । ঊনবিঙশ শতাব্দীর এই মহাগ্রন্থ রাজসংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ । ভূমিকার সূচনায় লেখক জানিয়েছেন "কণ্ঠে গীতচর্চার বিস্তারিত ও উৎকর্ষ, বিধানত এই পুস্তক প্রনীত ও প্রকাশিত হইল। ভূমিকার শেষে লেখক নিবেদন করেছেন ' এই পুস্তক দ্বারা একটি লোকের ও বিমুদ্ধ সংগীত জ্ঞানের ও গান শক্তির উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব ।" অসামান্য স্বাদেশিকতা ও সংগীত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থে ।

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের রাজধানী কলকাতা ছিল সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র। উনিশ শতকের মাঝামাঝি লক্ষৌর নিবাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীশাহ্ কলকাতার কাছে মেটিয়াবরুজে অবস্থানের জন্য বাংলার রাগসংগীত একটি নবতর প্রেরনার সূত্রপাত হয়। এই সময়ে ভারতের নানা স্থান থেকে ওস্তাদ বৃন্দ কলকাতায় আসতে থাকেন এবং বাঙালি গায়ক বাদকদের সঙ্গে তাদের খরনোর পরিচয় ঘটে। একথা অনস্বীকার্য, বাংলাদেশে রাগ সংগীতের মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্রুপদ ও টপ্পা গানের চর্চা ও প্রসার ঘটেছিল। তার কিছু পরে, খেয়াল ও ঠুংরী বাঙালীরা গ্রহন করে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরেই সর্বপ্রথম ধ্রুপদ চর্চায় কেন্দ্রগড়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী নিজস্ব ধ্রুপদে চর্চার কেন্দ্র বলতে বিষ্ণুপরকেই বোঝায়। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে সহজ, সরল, গম্ভীর্জ ও অত্যন্ত পরিমিত অলংকার প্রয়োগ আমাদের মধ্যযুগীয় ডাগরবাদ্রাসদের ধ্রুপদের কথা স্মরণ করে দেয়।

বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ কলকাতায় প্রথম চর্চির্ত হয় রামশঙ্কর ভট্রাটার্য ও তার তৃতীয় পুত্র শিষ্যরামশঙ্কর ভট্রাচার্যের মাধ্যমে সম্ভবত সময়টা ১৮২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দ। বিশেষকরে আনন্ত লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরী রীতির একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন।

বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব প্রথম কৃষ্ণনগর মহা রাজের দরবারে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের চর্চা হতো বলে জানা যায়। এরপর নদীয়ারাজ গিরিশচন্দ্রের দরবারে ধ্রুপদ্য হসনুখাঁ ও দিলওয়ার খাঁ অবস্থান করতেন, এনাদের কাছে ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

নাথের সংগীত শিক্ষক এবং ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণচন্দ্রে চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে যারা বাঙালীর হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের চর্চার বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে যদুনাথ রায়, রাম দাস গোস্বামী, গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী (ন্যনো গোপাল যিনি বর্তমান শতাব্দীর রাগ সংগীতের উজ্বল ধ্রুবতারা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সংগীত শিক্ষক) এবং লক্ষী নারায়ন বাবাজী সবৃশেযে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দী থেকে খেয়াল গানের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ধ্রুপদ গানের চর্চা ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসেইদ্বতয়ি বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরো ক্ষীনতার হয়ে যায়। সেকালে ধ্রুপদ চর্চা প্রসারের ব্যাপারে পাথুরিয়া ঘাট এবং জোড়া সাঁকো এই দুই অঞ্চলের ঠাকুর বাড়ীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এদেয় গৃহে বাঙালি ধ্রুপদীয়া ছাড়া ও পশ্চিমের অনেক ধ্রপদীয়া অবস্থান করতেন। মেটিয়া বুরু জের নবাব ওয়াজেদ আলীর রাজ সভায় অনেক ধ্রুপদীয়ার সমাবেশ ঘটেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীল দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বাঙালিরা ধ্রুপদ ও টপ্পাকে যেমন ভাবে অন্তরা দিয়ে গ্রহন করেছিলেন, তেমনভাবে খেয়াল ঠুংরিকে গ্রহন করেননি। এই না করার পশ্চাতে হয়ত বাঙালি ভাসা বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক খানি দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রথম খেয়াল গানের চর্চ্চা করেন বর্ধমান রাজদরবারের দেওয়ান রঘুনাথ রায়(১৭৫০-১৮৩৬)। এই সময়ে বর্ধমানের রাজা ছিলেন তিনি।

তেজচন্দ্র দরবারে সে সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের কওল বাচ্চা ঘরানার খেয়াল গায়ক অবস্থান করছিলেন। তাঁদের কারো কাছ থেকেই রঘুনাথ খেয়াল গান শিক্ষা করে থাকবেন। তবে রঘুনাথ কওল বাচ্চা খরুনার দুই তুক বিশিষ্ট খেয়াল শিক্ষা করেও ধ্রুপদ প্রভাবিত চারতুক বিশিষ্ট ভিন্ন শৈলীর বহু খেয়াল রচনা করেন। রঘুনাথ বাংলায় খেয়াল গান রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলাদেশে খেয়াল গানের চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কলকাতার বাঙালি সংগীতগুণীরা এই সময় থেকে পশ্চিমের প্রসদ্দুমনোহর ঘরানা না গোয়ালিয়র ঘরনা, রামপুর ঘরানা,আগ্রা ঘরানা, এবং কিরাণা খরানায় গুনীদের সংস্পশে এসে ব্যাপক ভাবে খেয়াল গানের চর্চা করেন এবং ব্যাপকভাবে রাগ সংগীত চর্চার প্রভাব বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার গায়ক বংশের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখ্য :- হাবিব মিঞা টপ্পা বাজ, হসনু মিঞআ টপ্পাবাজ কৃষ্ণদাস কর্মকার হরিচরনকর্মকার, জিৎরাম রায়, রাধাকৃষ্ণ প্রানকৃষ্ণ কৃষ্ণ মোহন, বজ্রমোহন গোপীমোহন (যাত্রী) আনন্দ মোহন। হরিমোহন (তবলা পাকাওয়াজ) রাধিকামোহন (সেতার টপ্পার ঠুংরা) ও মোহিনী মোহন প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় রাগ সংগীত বিশেযত যন্ত্রে সেতার যন্ত্রের যাত্রীদের উল্লেখ্য নাম হরিচরনদাস (গোবীন্দ দাস) গোবিন্দ দাস, চৈতন্য দাস রতন দাস, ভগবান চন্দ্র দাস, শ্যামচন্দ দাস, মনো মোহন দাস প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য। ঢাকায় তবলা বাদক বংশে উল্লেখযোগ্য নাম মিঠন খাঁ, সুপ্পন খাঁ, হোসেন বক্স, আতা হোসেন, গৌর মহোন বসাক, আনন্দ মোহন প্রমুখ।

রাগ সংগীত চর্চায় আরো কয়েকটি নাম উল্লেখ যোগ্য। তারা হলেন, হরগোবিন্দ রায়, হৃদয় নাথ, রূপ নাথ, অক্ষয় নাথ, হরনাথ ঈশান, মম্মথ নাথ চারুচন্দ্র, সতেন্দ্র নাথ , অমরনাথ, সিদ্ধার্থ রায় প্রুমুখ। এখানে উল্লেখ যে, কৃষ্ণদাস কর্মকারের সংগীত গুরু ছিলেন কালে খাঁ, ভোলা নাথ চৌধুরী ও মুহাম্মদ খাঁ কৃষ্ণদাস কর্মকারের শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখ অন্যতম ছিলেন দাগু ঠাকুর ও দীনবন্ধ গোপ, হরিচরনের সংগীতগুরু ছিলেন আমিন খাঁ, ভোলা নাথ চৌধুরী মুহাম্মদ খাঁ যদুভট, ওরসূল বক্স।

হরিচরন কর্মকারের শিষ্য ছিলেন; অনাথ কর্মকার আদিত্য চক্রবর্তী ইমদাদ খাঁ, মহেন্দ্র বসাক ও ললিত মোহন সেন। হরিমোহনের গুরু ছিলেন কেশব মিত্র ও হোসেন বক্স ও রাধিকা মোহনের গুরু ছিলেন। বড়ে দুন্নি খাঁ, হরিমোহন ও হসনু মিঞা ঢাকা ছাড়া ও ময়মনসিংহের গৌরীপুর, মুক্তগাছা কুমিল্লা জেলার ব্রক্ষ্মনবাড়ীয়ার কাছে শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রাগসংগীত চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে স্মরণীয় আরো কয়েকটি নাম যাঁদের অবদান ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রাগ সংগীত চর্চায় গুরুত্ব পূর্ন

Dhaka University Institutional Repository

অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দীন। ফুলঝুরি খাঁন, ফুল মুহাম্মদ, গুলমোহাম্মদ, ও ওস্তাদ বারীন মজুমদার।

এখানে উল্লেখ্য দিক হল রাগসংগীতের ইতিহাস, যার প্রবাদ প্রতিম প্রতিভার উজ্জল কিরনে মহিমান্বিত হয়েছে তিনি এ মাটির সন্তান সংগীতের ধ্রুবতারা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২)। শৈশবে সুরের সন্ধানে ঘর ছেড়ে নিষ্ঠা ও সুদীর্ঘ সাধনায় সংগীতের এক অনবদ্য ঘরানা।

জন্মে ছিলেন এক সংগীত পরিবারে (ব্রাহ্মনবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে)। পিতা সবদর হোসেন খাঁ তথা সদু খাঁ সেতার বাজাতেন। ভাইয়েরা ও কম বেশী রাগ সংগীত চর্চা করতেন। আপন পরিবারে অনেকেই আজ রাগ সংগীত চর্চায় খ্যাতি লাভ করেছে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ কথা সকলেই জানেন, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর বাদন অবলম্বনে সরোদ হলেও কন্ঠ সংগীতে তিনি কৃতবিদ্যা ছিলেন যন্ত্র বাদনের নানা শৈলী শিক্ষনের পরিচয় দেয়া হল।

প্রথম সংগীত গুরুঃ- সবদর হোসেন খাঁ বা সদু খাঁ ও আফতাবউদ্দীন খাঁ।

সরোদ ঃ- আহম্মদ আলী, ওয়াজীর খাঁ।

ধ্রুপদ/খেয়ালর- লোবো সাহেব।

বেহালা/ক্লারিওনেট যন্ত্রঃ- বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভাই অমৃত লাল দত্ত (হাবু)

সানাই ঃ- হাসান সাহেব।

তবলা ঃ- রাম কানাই বসু।

মৃদঙ্গ পাখাওয়াজ ঃ-নন্দবাবু।

Dhaka University Institutional Repository

সানাই নাকাড়া ঃ- মেছো বাজারে হাজারী এছাড়া ব্যান্ডমাষ্টার দুলী খা রাজা হোসেন খাঁ করিম খাঁর কাছে ও আলাউদ্দীন খাঁ ভিন্ন সময়ে তালিম নিয়েছেন। নানান ধারায় শিক্ষা লাভ করলেও চুড়ান্ত প্রশিক্ষন পেয়েছিলেন ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছ থেকে।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ রাগ সংগীতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর বিচিত্র সংগীত জ্ঞান নিজস্ব কোন ঘরনায় আপন পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অগনিত শিষ্য-প্রশিষ্য রাগ সংগীতের বিভিন্ন ধারায় স্বনাম ধন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যমন্ডলীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ যোগ্য-

- ❑ তিমির বরন ভট্রাচার্য (সরোদ)
- ❑ মহারাজ ব্রীজনাথ সিং।
- ❑ আলী আহাম্মদ খাঁ
- ❑ রবিশঙ্কর (বিশ্ববিখ্যাত (সেতার)
- ❑ আলী আকবর খাঁ (বিশ্ববিখ্যাত সরোদ বাদক)
- ❑ রওশন আরা বেগম (অন্নপূর্না)
- ❑ শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়,
- ❑ ধীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
- ❑ রবীন ঘোষ
- ❑ ইন্দ্রনীল ভট্রচার্য
- ❑ নীহার বিন্দু চৌধুরী
- ❑ পান্না লাল ঘোষ (বাঁশী)
- ❑ ভি,জি ঘোষ
- ❑ বাহাদুর খাঁ
- ❑ নায়েব আলী খাঁ
- ❑ ধ্যানেশ খাঁ
- ❑ আশীষ খাঁ।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীতেরাগ সংগীতের চর্চা ও বিকাশে ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রাগসংগীতকে যেমন পুনরুজ্জীবিত করার প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি তার সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নানা রাগ রাগিনী উদ্ভাবনে ও বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টি কয়েকটি রাগের নাম উল্লেখ করা যায়ঃ- মদনমঞ্জুরী, রাগ মোহাম্মদ (আরাধনা) শুভাবতী, হেমন্ত, মাঝ খাম্বাজ হেম-বেহাগ, মলূয়া-কল্যান, মাধবগিরি হেমললিত মাসকেদার ধবলশ্রী, দুর্গেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি।

তাঁর উদ্ভাবিত বাদ্যযন্ত্র :- মনোহরা চন্দ্রসারঙ্গ, নলতরঙ্গ বড় সারাঙ্গ সেতার ব্যাঞ্জো বড় সরোদ (পঁচিশ কান বিশিষ্ট)। তেমনি ভাবে স্মরণীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে মাইহার ব্যান্ড সিম্পনি অর্কেষ্ট্রার ধাঁচে মাইহার ব্যান্ড। তারই প্রয়োজনে সৃষ্ট হল কাফি ওয়েষ্টান। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যন্ত্রসংগীতের যে আশ্চর্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে করে ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ সাহেবের অবিস্মরনীয় অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে আছে তাই এই যুগকে 'আল্লাউদ্দীন যুগ' বলা।

রাগ সংগীতের পাশা পাশি লঘু সংগীত প্রসঙ্গেঁ বলা যায় এই শতাব্দীর চল্লিশ ষাটের দশকের আধুনিক গানের সুর ও কথা বর্তমান আধুনিক গানে অনুপস্থিত। তার কারণ রাগ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা। তাই প্রকৃত রসিক শ্রোতা বাঙ্গালী এই শতাব্দ চল্লিশ থেকে সত্তুর দশকে রচিত হারানো দিনের গানের মাঝেই তার মনের রস পিপাসা মিটায়।

Dhaka University Institutional Repository

গত শতকের অভিজাত ও বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে রাগ সংগীতের চর্চা ও অনুশীলন হতো কেবল গায়ক/বাদক হবার জন্য নয়। তারা অন্তত: প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতেন রাগ সংগীতের রসাস্বাদন লাভের জন্য, কেননাঃ- (একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিত হবে দুই জনে একজন গাবেঁ খুলিয়য়া গলা আরেকজন গাবে মনে।)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অঞ্চল ভিত্তিক বাংলাদেশের রাগসঙ্গীত চর্চা

ময়মনসিংহ

সংস্কৃতি দেশ ও জাতির দর্পন হিসেবে স্বীকৃত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশ ও জাতির সভ্যতা আর উন্নতির মাপকাঠি। সুতরাং যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবৃত্তে সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সংস্কৃতির মান দেশ ও জাতির পরিমন্ডলে তার ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতি তাই মানুষের জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা থেকে শুরু করে সব কিছুই সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে পরিগনিত। তাই সংস্কৃতি কথাটার মানে ব্যাপক। সাহিত্য শিল্প থেকে শুরু করে সকল প্রসার কলা সংস্কৃতির অন্তভূক্ত। সঙ্গীত সুকুমার শিল্প। ফলে স্বভাবতই সঙ্গীতও সংস্কৃরির বিশেষ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেরই জমিদার প্রধান মৈমনসিংহ জেলায় প্রকৃত উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা আরম্ভ হয। এ বিষয়ে মৈমনসিংহ রাজ এস্টেট, মুক্তাগাছা, কালীপুর, রামগোপালপুর, ভবানীপুর ও সর্বোপরি গৌরীপুর এস্টেটের অবদান অবিস্মরণীয়।

প্রাক বঙ্গবিবাগ মৈমনসিংহ জেলা আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম জেলা বলে পরিগণিত হত। তৎকালনি ব্রিটিশ প্রভুরা সেই স্থানে অনেকগুলি বড় জমিদারীর সৃস্টি করেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলি মোঘল আমল থেকেই ছিল কিনা জানা নেই। সেইসব জমিদারীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মন শ্রেণীর জমিদারদের মধ্যে প্রায় সব পরিবার আত্মীয়তাসূত্রে পরস্পরে আবদ্ধ ছিলেন। জমিদার, রাজা নবাব প্রমুখ সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা সাধারণভাবে যেমন প্রজাপীড়ক হিসেবে কুখ্যাত ছিলেন, তেমনিই তার ব্যতিক্রমও ছিল কোনো রাজা-জমিদার পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা, ভদ্রতাবোধ, বাক্যে ও চালচলনে, পরিশীলতার এমন নজির রেখেছিলেন যে তারা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। মৈমনসিংহ জেলার জমিরদের মধ্যে কেউ কেউ এমনই নজির রেখেছিলেন। জীবনের সর্ববিভাগে তাঁদের দান ছিল অসামান্য। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন মৈনসিংহ রাজ এস্টেটের মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্যের অধস্তন পুরুষ মহারাজ শশিকান্ত ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহারাজকুমার স্নেহাংশুকান্ত অবধি তাঁদের দান ছিল অসামান্য। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন মৈমনসিংহ রাজ এস্টেটের মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্যের অধস্তন পুরুষরা। মহারাজ শশিকান্ত ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহারাজকুমার স্নেহাংশুকান্ত অবধি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৈনসিংহ শহরে ক্রিকেট খেলারও প্রচুর মানোন্নয়ন হয়েছিল। স্নেহাংশুকান্ত কলকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রচুর দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হওয়া ছাড়াও, কলকাতায় তিনি শিকার, খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক ও সঙ্গীত শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মোট কথা এই যে মৈমনসিংহের জমিদাররা সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন। ঐ মমনসিংহের আরেকটি এস্টেট গৌরীপুরের

Dhaka University Institutional Repository

মহারাজা ব্রজেন্দ্র কিশোরকে তৎকালীন বঙ্গদেশে দানবীর বলা হত। কলকাতা ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক নামকরা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেই তাঁর দানের পরিমাপ করা প্রায় দুঃসাধ্য। কলকাতা ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁর স্পস্ট ধারণা জন্মে। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষিত সমাজে এই মহৎ শিল্পটির প্রচার এবং প্রসারকল্পে জলের মতো অর্থব্যয় করেছেন। এ সবই 'গৌরীপুরের অবদান' প্রসঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাঁর অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনটি এখনো স্মৃতিতে জাগরুক রয়েছে।

১৯৩০এর দশক তখনকার মেট্রিক পাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কলকাতায় মামার বাড়িতে বেড়াতে এসছিলাম। তখন কেবল গান গাই। কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়. জ্ঞানেন্দ্র প্রাসাদ গোস্বামী প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কদের রেকর্ড নকল করে গানগুলি তুলতে চেষ্টা করি মাত্র। গৌরীপুরের ৫৫,বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে কুমার বীরেন্দ্রকিশোরের নাম শুনে বন্ধুদের পরামর্শ ক্রমে তাঁর বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম। একজন লোক একটি সুদ্রশ্য শ্লেট নিয়ে এসে বলল, কি জন্যে এসেছেন, কোথা থেকে এসেছেন, নাম ইত্যাদি লিখে দিন। আমি নাম লিখে দিলাম। পরিচয় লিখলাম সংগীত বিদ্যার্থী। কুমার সাহেবের বাজনা শুনতে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর

Dhaka University Institutional Repository

কে সিঁগি দিয়ে দোতলা থেকে নামতে দেখলাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে গান গাও। বন্ধুরা আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি ভীষ্মদেব চট্টপাধ্যায়ের একটি গান করলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি রাগ? আমি বলাতে উনি বললেন সে তো সবাই বলতে পারে, রেকর্ডের গায়েই লেখা থাকে। কী করে 'রামকেলী' হয় তা বলতে পার ? আমি তখন কিছুই জানি না। তখন তিনি বললেন এ এক গুরুমূখী বিদ্যা। তাঁর কাছ থেকে না শিখলে কিছুই শেখা যায় না। তুমি এসো। আমি তোমায় ভালো করে শেখার বন্দোবস্ত করে দেব। এমনিই ছিল তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার প্রচেষ্টা। কিছুক্ষণ পরই কুমার বীরেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, কী শুনতে চাও। দেবতুল্য চেহারা, যখন সুরশৃঙ্গার হাতে আসনে বসলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন দেবরাজ ইন্দ্র সংগীত সাধনায় মগ্ন হলেন। আমরা যে বিশেষ কিছু জানি না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, আমাদের কিছু সহজ ও মিষ্টি রাগ বাজিয়ে শোনালেন অতবড় সংগীতজ্ঞ, তাঁর কোনো আত্মাভিমান নেই। তখন আমরা কোথাকার কে ? কিন্তু বলার এবং অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র হাতে বসে গেলেন দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যদি গুরুর আশ্রয় গহন করি তাহলে এঁর কাছেই করব। পরবর্তীকালে সংগীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আমাকে আদেশ করেছিলেন, "তোমার যখন মাইহারে থাকা হবে না, তাহলে তুমি কলকাতায় আমার ভাইয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করো। ভাই বলতে তিনি বীরেন্দ্রকিশোরকেই বোঝাতেন আর বাবা বলতে মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে মৈমনসিংহের জমিদাররা সবাই মহারাজ

Dhaka University Institutional Repository

শশিকান্ত, মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর কিংবা মহারাজকুমার স্নেহাংশুকান্ত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু, অন্যান্য স্থানের জমিদারদের অপেক্ষা তাঁরা যে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ও উচ্চততর মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই চর্চার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব মৈমনসিংহ শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্যেও পড়েছিল যে শিল্প উচ্চশিক্তিত সমাজে অপাঙ্ক্তেয় অনাদৃত ছিল, ধীরে ধীরে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আগেই বলেছি, মৈমনসিংহের জমিদাররা প্রায় সবাই নিকট আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজা সুর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী মৈনসিংহ রাজ এস্টেটে উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হওয়ায়, মুক্তাগাছা এস্টেটের রাজা জগৎকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র শশিকান্তকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য সংগীতানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবারে কিছু উচ্চপর্যায়ের সংগীতজ্ঞ অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়ালীয়া পন্ডিত বজরঙ্গ মিশ্র (প্রখ্যাত কথন নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সিতারা, অলকানন্দ ও গোপীকিষণজির পিতা), রামপুরের প্রখ্যাত তবলীয়া খলিফা ওস্তাদ মসীৎ খাঁ, তাঁর পুত্র ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র জিওন খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। শশিকান্তর পুত্রদের মধ্যে সীতাংশুকান্ত ও স্নেহাংশুকান্ত উপরোক্ত সংগীতগুণীদের শিক্ষাধীনে সংগীত সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বজরঙ্গ মিশ্রজিকে মহারাজ শশিকান্ত তাঁর পুত্রদ্বয়ের সংগীত শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পুত্রদের শিখিয়ে সংগীতের পাঠ দিয়ে আবার সেগুলি রিয়াজ করিয়ে দিতে হবে। সেইমতো মিশ্রজি ওদের বেশ খানিকক্ষণ রিয়াজ করাতেন। এ ব্যাপারটা বালক বয়সে সীতাংশুকান্ত ও স্নেহাংশুকান্তের ভালো লাগত না। সে সময়টা তাঁদের খেলতে যাবার জন্য মন ব্যস্ত হয়ে উঠতো একদিন একটা বড় তুরপুন হাতে পেয়ে দুভাইয়ে শলাপরামর্শ করে মিশ্রজির তানপুরায় বেশ কয়েকটা ফুটো করে দিয়েছিলেন। এতে মিশ্রজির কান্না দেখে কে ? সব শুনে মহারাজা শশিকান্ত মিশ্রজিকে নতুন তানপুরো তেরি করিয়ে দেবার কথা বলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর কান্না থামেনি। কেননা, তানপুরাটি ছিল তাঁর ঠাকুরদার হাতের তানপুরা। পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি হিশেবে তাঁর হাতে এসব পৌঁছেছে। মহারাজা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করে তবে তাঁর নানা থামিয়েছিলেন। মিশ্রজির কন্যারা অর্থাৎ সিতারা ও অলকানন্দা এবং তাঁর পুত্র গোপীকিষণ গান না শিখে নৃত্যকরার চর্চা করে অতি উন্নত পর্যায়ের শিল্পীতে পরিণত হয়ে সারা ভারতে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁরা বোম্বাইতে অধিষ্ঠীত হয়ে কয়েকটি ফিল্মোও কাজ করেছেন।

সীতাংশুকান্ত ক্রিয়াত্মক চর্চা খুব না করলেও সংগীতের ঔপপত্তিক জ্ঞান অর্জনের প্রচেস্টায় সদাব্রতী ছিলেন সংগীত দর্পণ গ্রন্থটির মুল সংস্কৃত থেকে তিনি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া, সংগীত বিষয়ে আরো দু-একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাংলার সংগীত সাহিত্যে অতি উল্লেখ্যযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজন বলে স্বীকৃত হয়েছে। মৈমনসিংহ রাজপরিবার ও মুক্তাগাছা রাজপরিবার পরস্পরের অতি নিকট আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ থাকায় কোনো বিখ্যাত সংগীতশিল্পী মৈমনসিংহ বা মুক্তাগাছায় এলে দু'জায়গাতেই তাঁর 'মুজ্‌রো' হত কারণ দুই বাড়িতেই সংগীতের সমান কদর ছিল। তথাপি মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের দরবারে মৈমনসিংহ সভাগায়ক পন্ডিত বজরঙ্গ মিশ্রের যাতায়াত ছিল। এছাড়া রামপুরের প্রখ্যাত খেয়ালীয়া ভ্রাতৃদ্বয় খৈরুদ্দিন খাঁ ও মহম্মদ দীন খাঁ তাঁর দরবারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করা ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বহু বিখ্যাত গুণী সংগীতজ্ঞের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করে জিতেন্দ্রকিশোর একজন অতি উচ্চপর্যায়ের সংগীতজ্ঞে পরিণত হয়েছিলেন।

সংগীত অন্তপ্রান জিতেন্দ্রকিশোর নিজে যেমন সংগীত শিক্ষা ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তেমনি ওস্তাদদের কাছ থেকে যা কিছু সংগ্রহ করতেন, সে সবই অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করতেন ও ভবিষ্যৎ কলাকারদের জন্য অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে তা নথিভুক্ত করতেন। তৎকালীন ওস্তাদরা নিজেদের পরিবারের বাইরে কাউকে কিছু শেখানো মোটেও ভালো মনে করতেন না। তাঁদের মনোবৃত্তি ছিল "মেরে ঘরওয়ানা বিদ্যা তুমকো আয়সাহি দে দেঙ্গে।" এ অবস্থা জিতেন্দ্রকিশোর জানতেন বলে অঢেল টাকা দিয়ে ওস্তাদদের মুখ বন্ধ করে রাখতেন। তিনি অক্লেশে এবং অকাতরে তা দান করে দিতেন। তাছাড়া কোনো কোনো ওস্তাদ স্বেচ্ছায় প্রনোদিতভাবে রচনাগুলিকে বিকৃত করে দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাগদারীর ভুল এবং একরাগের রচনার স্থায়ীর সঙ্গে অন্য রাগের অন্তরা ইত্যাদি নানারকম ভুলভ্রান্তি ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে দিতেন যাতে করে শিক্ষার্থী কোনোক্রমেই সঠিক চিজ্ না পান। স্বয়ং পন্ডিত ভাতখন্ডেজিকেও এ মনোবৃত্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু, জিতেন্দ্রকিশোরকে এ ব্যাপারে ঠকানো কঠিন ছিল। তিনি ছিলেন খাঁটি জহুরি। সোনায় খাদ থাকলে একবার দেখেই ধরে ফেলতে পারতেন। একদিন এক ওস্তাদ তাঁকে নিজের উর্দুতে স্বরলিপি করা খাতা থেকে নিজেদের খানদানের এক অনমেলে চিজ বলে একটি রচনার স্বরলিপি করাচ্ছিলেন। মহারাজ জিতেন্দ্রকিশোর যে একাজ করার জন্যই খানিকটা ফার্সি ও উর্দু শিখেছিলেন, সেটা সেই ওস্তাদ জানতেন না। কাজেই বাঙালি জমিদারের সামনে নিজের উর্দুতে লেখা খাতাপত্র খুলে রেখেই তিনি মনগড়া স্বরলিপি বলছিলেন। ওস্তাদ বলেছিলেন“ ইয়ে মেরা ঘরওয়ানা আসলি শ্যামকল্যাণ হ্যায়-লিখ লিজিয়ে।“ জিতেন্দ্রকিশোর হঠাৎ দেখলেন খাতার মাথায় headign দেয়া রয়েছে “নৌটাঙ্কীকে গানা গাঁওয়ার লোগোঁকো পৈসা লেকে দো” অর্থাৎ গ্রাম্য থিয়েটারের গান, টাকার বিনিময়ে গ্রাম্য লোকদের দেবে। তখন তিনি সেই ওস্তাদকে বলেছিলেন “আপ ইন্সাফসে কুরান ছুয়া করকে বোলিয়ে কি ইয়ে আপকে ঘরানাকে আসলি চিজ্ হ্যায় তব হম্ মান লেঙ্গে। তখন ওস্তাদ মহামুশকিলে পড়ে মাফ্ চেয়ে সেস্থান থেঁকে একেবারে পলায়ন করেছিলেন তাঁর সবাই ছিলেন অত্যান্ত গুণী স্বরলিপিকার। এ সমস্ত অমূল্য সম্পদ দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের নিয়ে আসা দ্রব্যাদির মধ্যে সঠিকভাবে রক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

আছে না দেশবিভাগের ডামাডোলে সব লুপ্ত হয়েছে, সে খবর জানা নেই। মুক্তাগাছার বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডের যা সংগ্রহ ছিল, তাও ছিল এক বিস্ময়ের বস্তু। মহম্মদ হুসেন খাঁ (খস্রু), যিনি জিতেন্দ্রকিশোরের অন্যতম শিষ্য ছিলেন এবং যাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত মহাগুণী গায়ক পূর্ববাংলায় ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না একবার লেখককে বলেছিলেন যে তখনকার দিনের কোন উল্লেখযোগ্য গায়ক-গায়িকা নেই যার গ্রামোফোন রেকর্ড মুক্তাগাছার বাড়িতে নেই। সেগুলো সুদৃশ্য চামড়ার রেকর্ড বক্সে রক্ষিত হত। সেসবও এ-বঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছিল কিনা, জানা নেই।

তাঁর এই মণিমাণিক্য সংগ্রহ তিনি দান করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। সে সময়কার বঙ্গদেশের বহু গুণী শিল্পীও তাঁর কাছ থেকে চিজ সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেকেই কলকাতা থেকে গিয়ে কিছু দিন মুক্তগাছায় আতিথ্য গ্রহন করে ওখান থেকে বহু ধনরত্ন আহরণ করে আনতেন। তবলা নেওয়াজ খলিফা ওস্তাদ মসীৎ খাঁ সাহেব একবার মৈমনসিংহ থেকে জিতেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রনে মুক্তাগাছা গিয়ে কিছুদিন ওখানে অধিষ্ঠান করেছিলেন। সেটা তাঁর স্মৃতিতে ছিল। একদিন লেখককে সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভাইয়া, কাঁহা গিয়া ওহ্ সোনেকা কাল ম্যায় যব মৈমনসিংহের মুক্তাগাছা গিয়া অওর কুছ রোজ বহাঁ ঠাহরা। সির্ফ খাও পিও অওর রিয়াজ কর। মেরা কুচভি কাম নহি থা। দিন ভরমেঁ এক মুরগা খাতা। অওর একজগ লস্যি-উসকে সা মহিন

Dhaka University Institutional Repository

করকে পিশ্‌তা মিশা হুয়া। তন্দুরস্তি মেরা ইতনাহি আচ্ছা থা কী ম্যায় বহুৎ কুস্তিগীরোকো পট্‌কান দে দিয়া। আভি মুরদা বনকে মগরেবা বঙ্গালমে রহনা পড়তা। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হো গিয়া। কেয়া আফশোস কে বাত হ্যায়"।

প্রখ্যাত সংগীতগুণী গায়ক শ্রীঅনাথনাথ বোস মশায়ের কথা মনে পড়ে। তিনি আমার গুরুভ্রাতা কারণ আমি একসময় ছোটে খাঁ সাহেব সারেঙ্গীয়ার কাছে শিখতে যেতাম এবং অনাথদার স্বাভাবিক কন্ঠস্বর খেয়ালীয়ার উপযুক্ত বেশ ভারী গুরুগম্ভীর ছিল। কিন্তু, তিনি কী করে যে এক অদ্ভুত কান্ড করতেন তা আজকাল দেখা যায় না। তিনি অত ভারী কন্ঠস্বর সত্ত্বেও নারীকণ্ঠস্বর নকল করে গাইতে পারতেন। মনে পড়ে, সে কন্ঠস্বর শুনলে ঠিক মনে হত যেন কলকাতার বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা গাইছেন। ওই স্বরে অনাথদার ঠুম্‌রি খুব জনপ্রিয় ছিল-বিশেষ করে হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে। উত্তর প্রদেশের লখ্‌নৌ, কানপুর, বেনারস ও এলাহাবাদে এজন্যে প্রায়ই অনাথদার ডাক পড়তে। তাঁর কিছু অনুষ্ঠান, আমি যখন ওই অঞ্চলে ছিলাম তখন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখিছি তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন বাটানগর থেকে আমি, অনাথদা ও বেহালাবাদক বিনয় সাহা একসঙ্গে কলকাতা ফিরতাম, তখন ওইসব দিনের উল্লেখ করলে অনাথদা বলতেন, "মনে আছে তো আমাদেরও কিরকম ছিল"। কানপুরে একবার ফুলবাগ ময়দানে অনাথদার মতো বলিষ্ঠদেহী লোকের গলায় মহিলা কণ্ঠস্বর শুনে শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে মহিলার হাসতে হাসতে একেবারে কুন হবার জোগাড় হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ছিলেন একজন "বঙ্গালকে বুলবুল।" অনুষ্ঠানের ঘোষকরা এই নামেই তাঁকে প্রচার করতেন। ভীষ্মদেব ও অনাথদা সব সময়ই কোনো জানকার গুণী খেয়াল ও ঠুম্‌রি গায়কের কথা উঠলেই জিতেন্দ্রকিশোরের নামোউল্লেখ করতেন, কারণ তারা উভয়ই ছিলেন গাত্তাবন্ধ। সাগীর্দ না হলেও মহারাজ জিতেন্দ্রকিশোরের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য ও তার অমূল্য রত্ন রাজির সংগ্রাহক। মুক্তাগাছা রাজবাড়ির সেই 'দীয়তাং ভোজ্যতাম' আতিথেয়তায় তাঁরা ছিলেন মুগ্ধ ভক্ত। কারণ তারা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত ভোজনবিলাসী। মুক্তাগাচার মন্ডা আর ঢাকা থেকে আনানো প্রাণহরার কথা উঠলে উভয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। বলতেন, "অমন মিষ্টি ভূ-ভারতে কোথাও খাইনি। এপ্রসঙ্গে সাহিত্যিক পন্ডিতপ্রবর শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের কথা মনে পড়ে। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন। তিনি বলতেন, "দেখ এতদিন ধরে গাঙ্গেয় সভ্যতা ছেড়ে রয়েছি কিন্তু আমি বাঙালপনা ধরিনি। কিসের জন্যে জান ? কেবল খাবারের এত ভ্যারাইটির জন্যে। এরা খেতে জানে, রান্না করতে জানে কিন্তু নামকরণ করতে জানে না। এত ভালো তুলনাহীন মিঠাই 'প্রানহরা' কিন্তু ওটা একটা নাম হল? প্রানই যদি হরণ করে নেয়া হয় তাহলে স্বাদটা অনুভব করবে কিসে? নামকরণ হওয়া উচিত ছিল "মনোহরা' না কিনা প্রানহরা-বাঙালদের সব ব্যাপারই অদ্ভুত।"

জিতেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে অনেক মহিলা শিল্পীও উপকৃত হয়েছেন। তিনি তখনকার দিনের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব মহিলা গায়িকাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট ঠুম্‌রি, গীত ও জগল যেমন সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তেমনিই করেছেন খেয়ালের সংগ্রহ। বিশেষ করে জোহ্‌রা বাঈ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মহিলা কন্ঠসংগীত শিল্পী এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ খেয়াল ঠুম্‌রি রচিয়তা মহিলা শিল্পী শ্রীমতী হায়দরী বাঈ-এর নিকট থেকে তিনি অতি উৎকৃষ্ট কিছু, খেয়াল ঠুমরির রচিয়তা মহিলা শিল্পী শ্রীমতী হায়দরী বাঈ সাহেব তা ওডিও কোম্পানিরও রেকর্ড করে থাকে অমরত্ব দান করেন। গানটি হল "মেরে পেয়াবীন নহি আবত ছৈন" এবং খেয়াল বন্দিশ "পিয়াকে মিলনকে যোগীয়া" রাগের বিলম্বিত খেয়াল। এমনি ধরণের বহু অমূল্য রত্নরাশি তার ভান্ডারে এত বহুল পরিণামে জমায়েত হয়েছিল যে তার বিতরণে তাঁর কৃপণতা করা কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

জিতেন্দ্রকিশোর খাঁটি জহুরির মতো ভারতীয় সংগীতের মহামূল্যবান মণিমাণিক্য সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। ধ্রুপদ রূপরীতির নমুনা বন্দিশ সংগ্রহে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি প্রধানত রামপুরের বিখ্যাত খেয়ালীয়া ওস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খাঁ এবং ওস্তাদ তসদ্দুক হুসেন খাঁর নিকট থেকে বহু বিখ্যাত ও দুষ্প্রপ্য খেয়াল গানের রচনা সংগ্রহ করলেও আরো অনেক ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের নিকট থেকেও বহু নমুনা বন্দিশ সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের তিনি মুজরো করাতেন তারপর অর্থের বিনিময়ে তাঁর পছন্দসই বন্দিশগুলি সংগ্রহ করে রাখতেন। এ ব্যাপারে যে সব মহৎ কলাকারদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত খেয়ালীয়া ওস্তাদ ফৈয়জ হুসেন

Dhaka University Institutional Repository

খাঁ পন্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধন, ওস্তাদ রজব আলী খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

জিতেন্দ্রকিশোর খেয়াল গানের রচনা যেমন সংগ্রহ করেছেন তেমনি করেছেন তেমনি করেছেন তৎকালীন বহু বিখ্যাত মহিলা ঠুম্‌রি গায়িকা শ্রীমতী গহরজান, মালকাজান, জোহ্‌রা বাঈ, মুস্‌তরা বাঈ, আজমা বাঈ এবং আরো অনেকের কাছ থেকে বহু বিখ্যাত খেয়াল বন্দিশের সঙ্গে বহু টপ্পা, ঠুম্‌রি গীতের বন্দিশসমূহ-যাদের সুর গুন ও কাব্যগুণ উভয়ই উচ্চস্তরের। এছাড়াও লখ্‌নৌ, বেনারস, মীরাট ও বোম্বাইয়ের বহুস্থান ঘুরে তিনি প্রচুর গীতি, গজল, কাজরী চৈতীর রচনা সংগ্রহও করেছেন।

জিতেন্দ্রকিশোর তৎকালীন বারাণসীর প্রখ্যাত তবলীয়া পন্ডিত মৌলভীরাম মিশ্রকে তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিশ্রজির শিক্ষা-গুনে প্রখ্যাত তবলীয়া বিপিনবিহারী রায় তাল-বিদ্বান রূপে খ্যাতি লাভ করেন বলে তবলিয়ার বিপিনবিহারী, কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের সংগীতসাধনার সঙ্গে আজীবন ওতপ্রোতবাবে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন পুববাংলায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালাধ্যায় বিষয়ের সেইরকম পন্ডিত-শিষ্য আর কেউ ছিলেন না বললে অতুক্তি হয় না প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকার প্রসন্ন বণিক ও পরবর্তীকালে পন্ডিত মৌলভীরাম মিশ্রের নিকট হলেও তিনি বহু খলিফা তবলীয়ার নিকট থেকে বিদ্যাসংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে লখ্‌নৌ এর খলিফা ওস্তাদ আবিদ হুসেন খাঁ, রামপুরের খলিফা মসীৎ খাঁ,

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ আহ্‌জেনজান খেরাকুয়া, ওস্তাদ আমীর হুসেন খাঁ, দিল্লির খলিফা ওস্তাদ নুখ খাঁ, পাঞ্জাবের খলিফা ফিরোজ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

বিপিনবিহারীর ছাত্রদের মধ্যে উপেন রায়, রামকৃষ্ণ রায় ও সুবোধ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীউপেন রায় প্রখ্যাত লয়কার-গায়ক পূর্ণচন্দ্রীর (পচাবাবু) সংগতীয়া হিশেবে বিশেষ নাম করেছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় তৎকালীন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন এবং সুবোধ চক্রবর্তী সংগীতাচার্য গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'গীতিবিতান সংগীত শিক্ষায়তন'-এর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতাচার্য গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত সংগীত ভারতী বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন তালবাদ্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'গীতিবিতান সংগীত শিক্ষায়তন'-এর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসংগীত বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। এঁরা সবাই বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে নতুন করে জীবন শুরু করেন।

পরম সংগীতপ্রেমিক জিতেন্দ্রকিশোরের সংগীত সাধনার বিষয়ে বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে তিনি উচ্চ স্তরের খেয়াল গায়ক হিসেবে যত না নাম করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি নাম করেছিলেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন রূপরীতির ও রচনার রত্ন সংগ্রাহক এবং জানকার-গুণী হিসেবে। এর স্বীকৃতিও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত ও বিরল

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত মহা সম্মিলনগুলির প্রায় সব কটাতেই বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হত। এসব কাজে মাঝে-মধ্যেই তাঁকে লখ্‌নৌ, বেনারস, এলাহাবাদ, বরোদা, বোম্বাই, পুনা ইত্যাদি স্থানে যেতে হত। সেখানেও অবসর সময়ে তিনি বড় বড় গুণীদের 'মুজ্‌রো' করাতেন এবং তাঁদের নিকট থেকে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ধরণের রচনা সংগ্রহ করতেন। উদারচিত্ত জিতেন্দ্রকিশোর বিদ্যা বিতরণে কখনো বিদ্যা বিতরণে কখনো কার্পণ্য করতেন না।

বহু সংগীত গুণী-গায়ক-বাদক তাঁর নিকট থেকে সংগীতের পাঠগ্রহণ করে নিজেদের সাংগীতিক জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর অন্যতম অবাঙালি কৃতীছাত্র কাশীর সরযূপ্রসাদ মিশ্রজি-লখ্‌নৌ কনফারেন্সে গান গেয়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এছাড়া বহু খ্যাতিনামা বাঙালি গায়ক-বাদক তাঁর নিকট থেকে 'খানদানী' খেয়াল-ঠুম্‌রি ও অন্যান্য রূপরীতির প্রামাণ্য'বন্দিশ' সংগ্রহ করেছেন। এঁদের মধ্যে মহম্মদ হুসেন (খস্রু), সংগীতাচার্য ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, অনাথনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র নন্দী (পচাবাবু), বিজয় ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষ ভাব উল্লেখযোগ্য ছাড়া যাঁরা সংগীত তত্ত্বের ও যন্ত্রসংগীতের প্রয়োজনে 'বন্দিশ' সংগ্রহ ও পাঠগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সুরেশ চক্রবর্তী, উমেশ দাস, হীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ও নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুজন ভারত বিখ্যাত সেতারী এনায়েৎ খাঁর কাছ থেকে সেতারের তালিম নিয়েছেন। বাদক হিশেবে নীরদাকান্ত

Dhaka University Institutional Repository

সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চিন্তাহরণ দেববর্মন নামে তাঁর আরেকটি কৃতীছাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণু দিগম্বর পালুস্করের নিকট প্রাথমিক পাঠ গ্রহন করে জিতেন্দ্রকিশোরের কাছে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর কাছে সুগায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মৈমনসিংহ জেলার 'মুক্তাগাছা' জমিদার পরিবারের সংগীতচর্চা ব্যতীত অন্যান্য জমিদারীগুলির জমিদার পরিবারেও সংগীতচর্চা বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে রামগোপালপুর, কালীপুর, ভবানীপুর ও গৌরীপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষোক্ত গৌরীপুরের রাজপরিবারের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে অবদান কেবল পূব বাংলাতেই নয়-সারা ভারতই বিরল।

মৈমনসিংহের অন্যতম জমিদারী রামগোপালপুরের জমিদার হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দিল্লী খলিফা ওস্তাদ নখু খাঁ ও রামপুরের খলিফা ওস্তাদ নখু ও রামপুরের খলিফা ওস্তাদ মসীৎ খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা করে তালাবিদ্যায় কৃতবিদ্যা হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান তালবিদ্যার একটি অমুল্য পুস্তক রচনা। ভবানীপুরের জ্যোতিষ রায়চৌধুরী তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সেতারীয়া এনায়েৎ খাঁ সাহেবের নিকট সেতার শিক্ষা করে উচ্চকোটির সেতারীয়ারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি সেতারবাদন বিষয়ে একটি প্রামান্য পুস্তক রচনা করে উত্তরপুরুষদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তাতে সেতারবাদন পদ্ধতি ব্যততি এনায়েৎ খাঁর নিকট প্রাপ্ত কিছু অতি উৎকৃষ্ট গৎ-তোড়াও সন্নিবেশিত হয়েছে। কালীপুরের জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

লাহিড়ী চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় জ্ঞানদাকান্ত ও নীরদাকান্ত যথাক্রমে মুক্তগাছার জমিদার-সংগীতজ্ঞ জিতেন্দ্রকিশোরের নিকট কণ্ঠসংগীত ও সংগীততত্ত্ব এবং সেতারীয়া এনায়েৎ খাঁর নিকট সেতার শিক্ষা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

জ্ঞানদাকান্ত জিতেন্দ্রকিশোর ব্যতীত তৎকালীন বিখ্যাত গায়িকা শ্রীজান বাঈ-এর শিষ্যত্ব গ্রহন করে কিছু অতি উৎকৃষ্ট খেয়াল ও ঠুম্‌রি সংগ্রহ করেছিলেন জিতেন্দ্রকিশোর এবং শ্রীজান-এর সংগীত শিক্ষাগুণে তিনি উচ্চপর্যায়ের গায়কে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অন্যতম গুরু জিতেন্দ্রকিশোরের মতো সংগীত প্রচার ও প্রসারের কার্যে প্রচুর সময় ও অর্থব্যয় করেছেন। প্রাক্‌বিভাগ বঙ্গের অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে তনি সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে যোগ দিয়ে সবাইয়ের উৎসাহ বর্ধন করেছেন। অল বেঙ্গর মিউজিক কনফারেন্সের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা ভূপেন্দ্রনাথ ঘোসের তিনি অতি অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন। তাছাড়া ক্রিয়াত্মক সংগীতচর্চার সঙ্গে ঔপপত্তিক চর্চাকে তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। সংগীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর সঙ্গে সংগীতে তাত্ত্বিক আলোচনাতেও তিনি অনেক সময় ব্যয় করতেন।

অনুজ নীরদাকান্ত তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সেতারীয়া এনায়েৎ খাঁর নিকট সেতার শিক্ষা করে প্রথম সারির সেতারীয়ারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। এনায়েৎ খাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত "ওহি মেরা সাগীর্দোমে সবসে কাবিল হ্যায়"-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আমার ছাত্রদের মধ্যে অর্জন করেছিলেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে তাঁর অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে। তাঁর অকালমৃত্যুতে একজন গুণী সেতারীযার জীবনে ছেদ পড়ে যায় এবং সংগীত জগতের এক প্রচন্ড ক্ষতি সাধিত হয়।

মৈমনসিংহ জেলার জমিদারদের জীবনচর্চার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্থানের রাজা ও জমিদারদের জীবনচর্চায় অনেক পার্থক্য ছিল। এরা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার অনেকাংশে প্রভাবমুক্ত ছিলেন বলতে পারা যায়। সংগীত শিল্প চর্চার সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা ও পৌরুষের চর্চাও করেছেন। দেশের নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করা ছাড়া বহু ব্যায়ামাগারেও এরা প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। বিদ্যোৎসাহিতা ও শিল্পকলা চর্চা, তৎসঙ্গে পৌরুষের চর্চা অর্থাৎ নানাবিধ ক্রীড়া, শিকার ও ব্যায়মচর্চার বিষয়ে এদের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মৈমনসিংহ শহরের ও কলকাতার কয়েকটি ক্রীড়া সংস্থার (ক্লাব) এরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদের উৎসাহে মৈমনসিংহে ক্রিকেট খেলার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মের মৈমনসিংহ রাজ এস্টেটের স্নেহাংশুকান্ত আচার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে ব্রতী হয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহন করেন। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে ক্রীড়াচর্চা তাঁর রচিত শিকার কাহিনীগুলি সর্বদা সুখপাঠ্য। কালিকাপুরের জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র ধৃতিকান্ত উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষাব্রতীর পেশা গ্রহণ করলেও শিকারি হিশেবে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জণ করেছেন। দেশের বহু

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত ও বিপদসঙ্কুল শিক্ষার অভিযানে সাফল্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপকরূপে বৃত। মোদ্দাকথা এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর কুফল এদের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে কখনো প্রতিফলিত হত না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে চর্চা ব্যতীত পরবর্তী প্রজন্মের পুত্রকন্যাদের আচার-ব্যবহার বা সর্ববৃহৎ শিক্ষার দিকেও এদের নজর ছিল। শিক্ষকদের ওপর ঢালাও নির্দেশ ছিল যে ব্যবহারে ত্রুটি বা ব্যতিক্রম দেখলে কঠোর শাস্তির বিধান করা। ভারতের অনন্য রাজা-মহারাজা-জমিদারীগুলিতে সংগীতচর্চার প্রভাব মৈমনসিংহ শহরের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যেও পড়েছিল। সাধাণ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতবিদ্যা প্রচার ও শিক্ষার উদ্দেশে পূববাংলায় খুব সম্ভবত সর্বপ্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় মৈমনসিংহ শহরে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সংগীত কোবিদ "সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী" ও সুরনাথ মজুমদার।

সুরেশচন্দ্র আইন অধ্যয়ন করছিলেন কিন্তু ওকালতি করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি গৌরীপুর এস্টেটের সেরেস্তাতে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিভাগে চাকুরি প্রার্থী হয়ে গৌরীপুর সেরেস্তাতে র্ভতি হন। কিন্তু, মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁকে বলেন, তুমি সেরেস্তাতে কাজ করবে কেন? তুমি আমাদের সংগীত সংক্রান্ত বিভাগে কাজ করো। পন্ডিত ভাতখন্ডেজির ছয় খন্ডে প্রকাশিত ক্রমিক পুস্তকমালিকা মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন ওই পুস্তকটির শিক্ষিত সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। ওই পুস্তকটির বাংলাদেশে প্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল মহারাষ্ট্রীয় ভাষা। মহারাজা বইগুলির বাংলা অনুবাদ করান। এ কাজটি সঠিকভাবে করানোর জন্য তিনি সুরেশচন্দ্রকে চার বৎসর বোম্বাইতে রেখেছিলেন কেবল মহারাষ্ট্রীয় ভাষা শিক্ষার জন্য। তিনি ভালোভাবেই মহারাষ্ট্রের ভাষা শিখে এসেছিলেন এবং ভাতখন্ডেজি কৃত ক্রমিক পুস্তকমালিকার ভালো অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু, ভাতখন্ডেজি তা প্রকাশ করার অনুমতি না দেওয়াতে অনুবাদ গ্রন্থাগুলি অপ্রকাশিতই রয়ে যায়। এরপর সুরেশচন্দ্র গৌরীপুরের সংগীত গ্রন্থাকারের ভার নেন। তাঁর পরিচালনায় সংগীত গ্রন্থাগারটি সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এই গৌরীপুর সংগীত গ্রন্থাগারে বসে সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি একজন ভারত বিখ্যাত সংগীত শাস্ত্রীরূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আকাশবাণী দিল্লীর একজন উচ্চ পদাভিষিক্ত কর্মচারী হয়েও অতি উত্তম সংগীতজ্ঞে পরিণত হয়ে, সম্পূর্ণভাবে সংগীত পেশাতেই নিযুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যেও অনেকে কৃতবিদ্য হয়ে সংগীতের পেশা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দীর্ঘদিন তাঁরা মৈমনসিংহ শহরের নতুন বাজারে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের পর কলকাতা চলে আসেন। কলকাতা ও দিল্লী বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে তিনি কর্মসূত্রে যুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। মৈমনসিংহ শহরের অন্যতম বিখ্যাত সংগীতগুরু ছিলেন ললিতমোহন সেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রী বলে তিনি ললিত কবিরাজ বলে

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতজগতে খ্যাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর শিক্ষাধীনে তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় জিতেন্দ্রমোহন (রনা) ও রথীন্দ্রমোহন (মনা) দুজনেই উৎকৃষ্ট খেয়ালীয়া হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরা ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর নিয়মিতভাবে ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে খেয়াল পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া, সংগীতগুরু ললিতমোহনের শিক্ষাগুণে বর্ধিত হয়ে শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষদস্তিদার খেয়ালীয়া হিশেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতা চলে আসেন এবং কলকাতা বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে বহুকাল হয়ে শ্রীমতী বিজনবালা দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনাও করেছেন।

মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র নন্দী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ডাক নাম 'পচা' বলেই তিনি খ্যাত ছিলেন। ঢাকা ও মৈমনসিংহ শহরে তাঁর চেয়ে কোনো জনপ্রিয় শিল্পীর নামোল্লেখ করা যায় না। বিশেষ করে যুবমহলে-তা কোনো উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর হোক কিংবা লঘুসংগীতের আসর-তিনি গান গাইতে বসলে সমাজ একেবারে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল-গুরুগম্ভীর রাগ তিনি যেরমক পরিবেশন করতে পারতেন তেমনি লঘুসংগীত অর্থাৎ ঠুম্‌রি, গীত, গজল এবং বাংলা রাগপ্রধান গানও একই মানের পারদর্শিতার সঙ্গে গাইতে তাঁর গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল-গুরুগম্ভীর রাগ তিনি যেরকম পরিবেশন করতে পারতেন তেমনি লঘুসংগীত অর্থাৎ ঠুম্‌রি, গীত,

Dhaka University Institutional Repository

গজল এবং বাংলা রাগপ্রধান গানও একই মানের পারদর্শিতার সঙ্গে গাইতে পারতেন।

মৈমনসিংহ শহরে জমিদাররা ছাড়াও কোনো কোনো রাজপুরুষ সংগীতশিল্পের প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এদের মধ্যে প্রাকবিভাগ বঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রফুল্লমোহন দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ছাত্রজীবন থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রেমিক এই ভদ্রলোকটি ব্যক্তিগতভাবে সংগীতের ক্রিয়াত্মক চর্চা না করলেও প্রচুর অধ্যয়ন ও খাঁটি জহুরির মতো বহু মহৎ শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে উচাচঙ্গ সংগীতের একজন আদর্শ পৃষ্ঠপোযক,শ্রোতা ও সমজদার ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। পেশায় দেশ শাসনের গুরুদায়িত্বভারসম্পন্ন রাজপুরুষ হলেও, মনে হয় কর্মক্লান্ত দিনের অবসর সময়ের সবটাই তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত শ্রবণে ও তার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করতেন। মফস্বলে নানাস্থানে বদলির চাকুরিকালে তিনি 'গানপাগলা-ডেপুটি' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। বহু সংগীতগুণীর সঙ্গে তাঁকে কলারসিকে পরিণত করেছেন এবং তিনি অনেককে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। তৎকালীন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সংগীত অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ-পরিচালক, প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ মহম্মদ হুসেন খাঁ (সাধারণ্যে খস্রু নামে পরিচিত)-তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মৈমনসিংহ শহরে তাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যেও বেশ কয়েকটি সংগীত চক্রও গড়ে উঠেছিল। প্রফুল্লমোহনের পুত্র প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও সরোদীয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এখনো পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৈমনসিংহ জেলার জমিদারী এস্টেটে, গৌরীপুরের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সেখাকার দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ও তাঁর পুত্র পরবর্তীকালে মহাসংগীতজ্ঞ বলে সারা ভারতে স্বীকৃত ও বিখ্যাত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কথা স্মরণে আসে। গৌরীপুরের সাংগীতিক ইতিহাস এই দুই ব্যক্তির জীবন সাধনার ইতিহাস। প্রায় অক্ষর-জ্ঞান বিবর্জিত, অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান তথা ভারত সন্তানদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এইজন্যে তিনি সীমাহীন অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। যুক্তিবাদী শিক্ষিতের ধ্যান-ধারণা মানসিকতা নিয়ে তাঁর সংগীতের আবিষ্কারে, সংগহে ও রক্ষনাবেক্ষনে ব্রতী হয়েছিলেন প্রচার ও প্রসারের জন্য তাদের ঐকান্তিকভাবে কোনো অভাব ছিল না। বস্তুত ভারতের অন্য কোনো সংগীত-প্রেমিক রাজদরবারে এরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাংগীতিক জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক রাজা-মহারাজাদের দরবারে হাতি, ঘোড়া, পোলো, কুস্তি, ক্রিকেটের সঙ্গে সাধুবাবা, বাঈজীও ওস্তাদরাও রক্ষিত হতেন। কিন্তু, তা ছিল বিলাসব্যসনের অঙ্গ মাত্র। শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়। হায়দারাবাদ, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, পাতিয়ালা ইত্যাদির সঙ্গে অসংখ্য করদরাজ্যগুলির কোনোটিই এর ব্যতিক্রম নয়। বরোদা ও মাইশো স্টেটের মতো দু-একটি ব্যতিক্রম হয়তো ছিল। কিন্তু, তাকে নিয়মের প্রমাণ হিসেবেই ধরতে হবে। গৌরীপুরে সাংগীতিক দলীলপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি প্রায় আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমতুল্য। বহু ভিন্ন পেশার

Dhaka University Institutional Repository

লোক সেখানকার কাগজপত্র হাতড়ে পরবর্তীকালে সংগীতশাস্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। মোদ্দাকথা, গৌরীপুরের পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় সাংগীতিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করে সাধাররণ্যে বিলোবার যতটা প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন কোনো রাজামহারাজা তা করেননি। প্রাকবিভাগ মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর এস্টেটে দানবীর জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জন্মগ্রহন করেন। পিতার অবতৃমানে ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক ব্রজেন্দ্রকিশোরকে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং তাঁকে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের শিক্ষাধীনে গড়ে উঠবার জন্য সারদারঞ্জনকে নিযুক্ত করেন। সেখানে তাঁর প্রতিভার বিশেষ বিকাশ সূচিত হয়। ভারতীয় সংগীত সমাজে সংগীত, নাটক ও সাহিত্যের গভীর চর্চা হত। তৎকালীন কলকাতার অভিজাতবর্শীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে খ্যাতিনামা সংগীতজ্ঞ ওস্তাদদের নিকট সংগীতের পাঠ গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের গান-বাজনা শুনতেন। এখানে তিনি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের গান-বাজনা শুনতেন। পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাট্যাভিনয়ে যোগদান করেন। বিখ্যাত নট ও নাট্য-পরিচালক অমর দত্তের সঙ্গে সেখানে তাঁর পরিচয় হয়।

ব্রজেন্দ্রকিশোর অমর দত্তের সহযোগীরূপে বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে তিনি পরবর্তীকালে অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক হিসাবে তৎকালীন বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কলাকাররূপে স্বীকৃত ছিলেন। আজীবন তিনি অভিনয়বিদ্যার

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন করেছেন। অভিনয় থেকেই তাঁর প্রথম সংগীতানুরাগ জন্মায়। নাট্যসংগীত ও ঐক্যতান বা বৃন্দাবনে তিনি বিশেষভাবে আবৃস্ট হন। বৃন্দাবনে তনি মৃদঙ্গ বাজাতেন এবং মৃদঙ্গ বাদনের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ হওয়ায় তিনি মৃদঙ্গাচার্য মুরারী মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মৃদঙ্গের সঙ্গে সংগতের জন্য তিনি বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ অযোধ্যাপ্রসাদকে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর পর অযোধ্যাপ্রসাদ দেশে চলে যান। তখন তিনি ভারতীয় সংগীত সমাজে এ তাঁর অন্যতম সহযোগী লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে মৃদঙ্গ' বাজানো অভ্যাস শুরু করেন। কিছুকাল পর বিখ্যাত ধামার গায়ক পন্ডিত বিশ্বনাথ রাও কলকাতায় এসে লালচাঁদের আশ্রয়ে বসবাস শুরু করেন। তখন থেকে পন্ডিত বিশ্বনাথ রাও-এর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের এক জীবনব্যাপী সৌহার্দ্যের সূচনা হয়। যখনই তাঁর সুযোগ হত তিনি বিশ্বনাথের সঙ্গে সংগত অভ্যাস করতেন। এ যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব বিশ্বনাথের জীবৎকাল অবধি বজায় ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোর মিস্টার জাস্টিস এ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত সংগীত সংঘর অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। সেখানকার উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষকগণের মধ্যে তিনি পন্ডিত বিশ্বনাথ রাওকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রফল্লমোহনের সুযোগ্য পুত্র শ্রীবদ্ধদেব দাশগুপ্ত বাল্যকাল থেকেই অতি প্রতিভাবান বলে প্রমাণ রাখেন। তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তারপরবর্তী পরীক্ষা গুলিতেও তিনি চোখ ধাঁধানো নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একজন অত্যন্ত কৃতবিদ্য স্থপতি হন। তারপর কলিকাতা ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের একজন বিখ্যাত স্থপতি হন। তারপর কলিকাতা ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের একজন বিখ্যাত স্থাপতিরূপে কর্মজীবন শুরু করলেও তাঁর জীবনের যেটা প্রথম প্রেম অর্থাৎ সরোদে উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চা, তাই-ই চালিয়ে যেতে থাকেন ও দেশের নানাস্থানে বাজিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। পেশায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেখানের সরোদ বাজিয়েছেন, তাতে বিশ্ববিশ্রুত সরোদীয় ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রমুখ কয়েকজন ব্যতীত তাঁর সমকক্ষ এই উপমহাদেশে কেউ ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না । ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা হলেও সরোদের সাধনায় তাঁর কোন দিন শৈথিল্য আসেনি। তিনি পেশায় স্থপতি ও নেশায় সরোদীয়াই থেকে গিয়েছেন। শৈশব থেকেই তাঁর সংগীতজ্ঞ হিসেবে গড়ে ওঠা আমি প্রত্যক্ষ করেছি । ইঞ্জনিয়ারিং পেশার দরুন তাঁকে কিছু স্বার্থপ্রণোদিত বক্তি স্বীকৃতি দিতে চাননি। তাঁর বাদনশৈলী আঙ্গিক এমনকী সাংগীতিক গঠনকেও 'মখীয়া' বা অ্যামেচারিস বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিদগ্ধ মহলে তিনি এই উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ সরোদীয়ার মধ্যে পরিগণিত হন। বর্তমানে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা বর্জন করে সর্বতোভাবে সংগীতের সেবায় আত্মনিয়োগ করে একজন পরিণত আচার্য স্থানীয় সংগীতজ্ঞ হয়ে দেশে, বিদেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচারে ব্যাপত রয়েছেন। তাঁর শিক্ষাগুণে বর্তমান প্রজন্মের কিছু সংগীত শিক্ষার্থী বেশ কৃতবিদ্য হয়ে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র শ্রীমান অনিবার্ণ দাশগুপ্ত, প্রত্যুয্য ব্যানার্জি ও শ্রীদেবাশীষ ভট্রাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেবের অবদানের মধ্যে মহত্তম হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার যন্ত্রসংগীতে রূপান্তকরণ এবং বর্তমানে সরোদে 'একহারা' তান নামে যে জিনিস চলছে অর্থাৎ ডারা, রাডা, রাডা, ডারা বাণী দিয়ে যে তান বাজানো হয়ে থাকে তার প্রবর্তন। উপরোক্ত দুটি ব্যাপারেই তিনিই বোধহয় প্রথম প্রবক্তা, অন্তত তার ব্যাপক ব্যবহারের তো বটেই। বাংলায় একহারা দোহারা চেহারার বর্ণনাতে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত এই বাংলা একহারা কথাটির থেকেই ওটা মিউজিক্যাল পারল্যান্স-এর অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর সংবাদপত্রসেবীরা করেছেন যে সরোদীয়ার অবদান বলে তাঁর প্রচার করে থাকেন তাঁর জন্মেরও আগে থেকে এই তান-এর বাদনশৈলী অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা বুদ্ধদেব করে এসেছেন। ওস্তাদ আশিস খাঁও এগুলি অনাসায়ে এবং অক্লেশে বাজিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে কোনো বাহাদুরী নেই কেননা পূর্বেকার প্রজন্মের সরোদীয়ারাও এ জিনিশ বাজিয়েছেন কিন্তু তা খুব স্বল্পকালীন স্থায়ী বর্তমানের সরোদীয়ারা এটা দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজিয়ে একটা নতুনত্ব করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমনকী স্বয়ং সংগীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর রেকর্ডেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনিও এই বোলই ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারটি একহারা বলার কোনো অর্থ নেই। হিন্দি ভাষায় একহারা বলে কোনো শব্দ নেই। সুতরাং একে 'সেতার অঙ্গ তান' বলাই ভালো মনে হয়। একহারা

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি পরলোকগত সংগীতগুণী রাধিকামোহন মৈত্র মশাই প্রথম ব্যবহার করেন। সেই থেকে এটা চালু হয়েছে।

মৈমনসিংহ-কালিকাপুরের জমিদার লাহিড়ী চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় জ্ঞানদাকান্ত ও নীরদাকান্তের সঙ্গে বুদ্ধদেবের পিতৃদেবের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই অনেকবার বুদ্ধদেবের পিতৃদেব প্রফুল্লমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ি গান বাজনা করে গিয়েছেন। একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে বালক বুদ্ধদেব তাঁদের সেই প্রামাণ্য সংগীতে খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে একটি ন্যাশনাল পোগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গানকে সর্ব প্রথম যন্ত্রে রূপায়িত করেন। রাগটি ছিল পিলু।

'সংগীত সংঘ'-র যন্ত্রসংগীত বিভাগের প্রধানরূপে ১৯১৫ সন অবধি বিখ্যাত সরোদীয়া ওস্তাদ কুকুভ খাঁ কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ্যভাতা ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ 'সংগীত সংঘ'-র অস্তিত্বের শেষ পর্যন্ত তথায় শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় সেখানকার কন্ঠসংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে ওইসব গুণীদের সঙ্গে নিত্যসংযোগ থাকলেও ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর নিজস্ব সংগীত গুরু হিসেবে পন্ডিত বিশ্বনাথ রাও ও সরোদীয়া ওস্তাদ আমীর খাঁকে (রাধিকামোহন মৈত্রের গুরু) নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোরের কর্মসূচির ছিলেন বরিশালবাসী বিখ্যাত গায়ক বিপিন চট্রোপাধ্যায়-যিনি বিপিন তানরাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের অপর একজন

Dhaka University Institutional Repository

বরিশালবাসী সহচর ছিলেন প্রখ্যাত এস্‌রাজবাদক শীতল মুখোপাধ্যায়। শীতল মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় শীতলচন্দ্রের শিক্ষাগুণে তৎকালীন বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম সারির গায়িকারূপে গণ্যা হয়েছিলেন। বাংলার বাইরেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোর এঁদের যথাযোগ্য বৃত্তি দিয়ে গয়া, কাশী দ্বারভাঙা ইত্যাদি স্থানের তৎকালীন সংগীতগুণীদের নিকট থেকে বিদ্যাসংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এস্‌রাজ শিক্ষা করার জন্য তিনি গয়ার বিখ্যাত পন্ডিত হনুমান দাসজি ও পরবর্তীকালে বিখ্যাত সেতারীয়া ইম্‌দাদ খাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। গায়ক সংগীতগুণীরা গৌরীপুরের সংগীত দরবারকে একান্ত আপনার বলে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই বৎসরের কোনো-না-কোনো সময় গৌরীপুরে এসে অবস্থান করতেন। শীতল মুখোপাধ্যায় প্রধানত সরোদীয়া আমীর খাঁর নিকট সংগীতের পাঠ গ্রহণ করলেও আমীর খাঁর পিতা ওস্তাদ আবদুল্লা খাঁর কাছে থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

পরবর্তী জীবনে ব্রজেন্দ্রকিশোর শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত প্রচার ও প্রসারের আন্দোলন ও শিক্ষা প্রসারের আন্দেলনের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উচ্চ পর্যায়ের দৃস্টান্ত রেখেছিলেন। একথা সত্য যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সাহায্য করতে পারেননি। কারণ, তা করা, একজন ইংরেজ আমলের জমিদারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞাতসারে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

অর্থসাহায্য করেছেন। তাছাড়া, কোনো কোনো বিপ্লবী নেতাকে ভারতের নানাস্থানে তাঁর নিজস্ব বাটীতে লুক্কায়িত ভাবে থাকতেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

তিনি স্বনামধন্য বিজ্ঞানী রসায়নচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুসারী ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মতোই তিনি বঙ্গ সন্তানদের চাকুরির লোভ বর্জণ করে ব্যবসায়ে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। এ কাজেও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি আজও বিদ্যমান।

এতদ্ব্যতীত, উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্রিয়াত্মক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ঔপপত্তিক চর্চার গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতা ও সংগীত বিদ্যার্থীদের অবহিত করানোর প্রচেষ্টা তিনি সব সময় করে গিয়েছেন কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত-পন্ডিত কেদারচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ। এই অনুবাদকার্যে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর এস্‌রাজ ও সেতারবাদক ছাত্র জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী। কেদারচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ও ভাষান্তরকরণ ক্ষতমা সর্বজনবিদিত ছিল। জৌতিষচন্দ্র একজন কৃতীশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রকিশোরের শিক্ষাগুণে একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের সংগীত-তাত্ত্বিকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল মুক্তোর মত। তিনি যে-কোনো সংগীত শুনে শুনেই লিপিবদ্ধ করে নিতে পারতেন। এ পার্যের

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধার জন্য তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যাকে শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির স্বরলিপিকরণ বলা যেতে পারে। গৌরীপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত স্বরলিপি গ্রন্থাদি বেশিরভাগই জ্যোতিষচন্দ্রের স্বহস্তে লেখা।

তৎকালীন ভারতের সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সেতারবাদক সেতারী নেওয়াজ ওস্তাদ এনায়েৎ হুসেন খাঁকে ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুরে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। সারা ভারতে তিনি 'এনায়েৎ খাঁন অব গৌরীপুর' বলেই খ্যাত হয়েছিলে। উদার চরিত্র এনায়েৎ খাঁ সাহেবের শিক্ষাধীনে কিছু উচ্চশিক্ষিত বঙ্গসন্তান কৃতবিদ্য সেতারবাদকরূপে সেকালে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (কচিবাবু), নীরদাকান্ত লহিড়ীচৌধুরী, জ্যোতিষ রায়চৌধুরী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর), বিপিন দাস, হীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীনিবাস অধিকারী, নৃপেন্দ্র মিত্র, জনগোমেস প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই ব্রজেন্দ্রকিশোর যা চেয়েছিলেন অর্থাৎ এই বাদ্যযন্ত্রটির মাধ্যমে ভারতীয় সংগীতের প্রচার ও প্রসার সেকাজ সারা জীবন ধরে করে গিয়েছেন। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যেমে কিছু সেতারীয়া রয়েছেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্বনামধন্য পুত্রপরবর্তীকে মহাসংগীতজ্ঞ রূপে খ্যাত বীরেন্দ্রকিশোর এই সময় ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং তাঁর সংগীত শিক্ষাজীবনের শুরু হয় ওস্তাদ আব্দুল্লা খাঁর শিক্ষাধীনে। ওস্তাদ আব্দুল্লা খাঁর উপদেশ ও নির্দেশে তিনি বিলম্বিত আলাপের দিকে আকৃষ্ট হন। তখন পর্যন্ত বীরেন্দ্রকিশোর এস্‌রাজ বাজাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রজেন্দ্রকিশোর পুত্রের জন্য ওস্তাদ কুকুভ খাঁ ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর নিকট থেকে কিছু অতি উত্তম সৎ, তোড়া সংগ্রহের জন্য এই সময় একজন সংগীতজ্ঞকে নিযুক্ত করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর যতদিন বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্য ছিলেন ততদিন অর্থাৎ ১৯২৪ সাল অবধি এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

এই সময় থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুরের বাস বাড়িয়ে দেন এবং সেখানে সেতারী ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবকে কেন্দ্র করে একটি বড় সংগীত দরবার গড়ে ওঠে। পন্ডিত বিশ্বনাথ রাও পূর্বেই গত হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর ওস্তাদ আমীর খাঁ ও ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁকে ইতিমধ্যে গৌরীপুর দরবারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের কলকাতা ও গৌরীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। এনায়েৎ খাঁর পিতার ইম্‌দাদ খাঁ ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের এস্‌রাজ শিক্ষার প্রথম গুরু। এজন্য তিনি এনায়েৎ খাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এনায়েৎ খাঁও তাই সর্বত্র 'এনায়েৎ খাঁন অব গৌরীপুর' বলে পরিচয় দিতেন। তৎকালীন অখিল ভারতীয় সংগীত মহাসম্মেলনগুলিতে এমনকি গ্রামোফোন রেকর্ডেও তিনি একথা বলতে দ্বিধা করতেন না। পূর্বে 'ভারত সংগীত সমাজ' ও সংগীত সংঘ'র বিশিষ্ট সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকরূপে ও মৃদঙ্গাচার্য মুরালী গুপ্তের শিষ্যরূপে বাংলায় সংগীত মহলে ব্রজেন্দ্রকিশোরের যথেষ্ঠ সুনাম হয়েছিল। কিন্তু সারা ভারতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ 'কদরদান' বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁর খ্যাতি ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর দ্বারই প্রচারিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এনায়েৎ খাঁ সেনীয়া কলাবন্তদের মতো 'জানকার' গুণী এবং ভারতীয় সংগীতের আচার্য স্থানীয় না হলেও সেতার ও সুরবাহার শিল্পী হিশাবে সুরে এবং লয়ে অপূর্ব প্রতিভার প্রদর্শনে উত্তর ভারতে অশেষ প্রশংসার অধিকারী হয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মতো শিল্পীর পালক হিসাবে ব্রজেন্দ্রকিশোরের নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে শিক্ষাদান কালে এনায়েৎ খাঁ তথাকার বিপিন দাস নামে একজন তরুণ অভিনেতাকে সেতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের দৌহিত্র বিমলাকান্ত ছাড়াও আশেপাশের কয়েকজন তরুণ জমিদারকে খাঁ সাহেব শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন।

গোয়ালিয়র দরবারের দিকপাল সরোদ নেওয়াজ ওস্তাদ হাফেজ আলী খাঁ ও সংগীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ দুজনই সেনীয়া শিষ্য ঘরানা। এঁদের প্রদত্ত সেনীয়া বিদ্যা অধিগত করার পর তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতগুণী গিধৌর-এর নবাব দরবারের মিঞা তানসেনের পুত্রবংশীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁকে গৌরীপুর দরবারে সংগীতাচার্য রূপে নিয়ে আসার কথা আলোচিত হয় । গৌরীপুরের সংগীত দরবারের কদরদান সংগীত দরবার হিসেবে এতই নাম ছিল, যে, ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ এক কথায় গৌরীপুর দরবারে চলে আসতে রাজি হয়ে যান। এইভাবে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর মিঞা তানসেনের পুত্র বংশীয় সেনীয়া বিদ্যার্জণ দীক্ষিত হন। ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ধ্রুপদীয়া, রবাবীয়া ও সুর শৃঙ্গারীয়া হিসেবে এবং জানকার গুণী হিসেবে তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রায় কিংবদন্তি পুরুষ বলে পরিচিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চবংশীয় মুসলিম ওস্তাদের মতো তিনিও সাধারণ ওস্তাদদের একটু হেয় চোখে দেখতেন। তাঁর কোন আসরে এইরূপ কোন সংগীত কলাকারকে দেখলে তিনি বলতেন, "ইয়ে সব ধারী-মিরাশী লোগোঁকো হঠাও। ইয়ে লোগ গুন গুনকে মেরা চিজ মারেগা অওরা হর চিজ কো গার ধরাকে দেগা।" এমনকি ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁকেও তিনি ব্যতিক্রম মনে করতেন না।

বীরেন্দ্রকিশোর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব এর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এনায়েৎ খাঁর সাহেবের সঙ্গে একান্তে দেখা হত খাঁ সাহেব বলতেন, "আরে খাঁ মহারাজ, আপ জওয়ান আদমি হো আপ কেয়া উও বুড্ডা ওস্তাদ কা মাফিক সাঁজ পকাড়কে সির্ফ টিয়াও টিয়াও করেঙ্গে ? সিতার পকাড় লিজিয়ে আওর উস্‌মেঁ এ্যায়সা সপাট তান রিয়াজ কর লিজিয়ে কি আপকে হাত মে সে বিজরি চমকানো খায়।" বীরেন্দ্রকিশোর আমাদের বলেছিলেন যে আমি তখন "বিজরি চমকনা" আর "টিয়াও টিয়াও করনা" এই দুই সংগীতের মধ্যে কি পার্থক্য তা বুঝে গিয়েছিলাম, তাই এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কথায় কান দিইনি। 'টিয়াই টিয়াই করনা' বলতে খাঁ সাহেব আলাপ বুঝাতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপরীতি আলাপ ও তার দ্বাদশ অঙ্গে বিস্তৃতি ধারী-মিরাশী ওস্তাদরা জানতেন না এবং এত প্রশস্ত ও বিস্তৃতভাবে কোনো রাগকে তারা উপস্থাপিত করতে পারতেন না বলে এই দুই শ্রেণীর ওস্তাদদের মধ্যে খুব একটা সদ্ভাব ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে খেয়াল ও ঠুম্‌রি, যাকে সেনীয়া ওস্তাদরা অন্ত্যজ বলে মনে করতেন এবং বলতেন যে " ওহ্‌ সির্ফ বাঈজী ওয়াইফ লোগোঁকে লিয়ে।" তাই বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠায় আলাপ ও ধ্রুপদের চর্চা কমে যায় এবং ধারী-মিরাশী ওস্তাদরা সম্মুখ সারিতে চলে আসেন। আরেকটি কারন-সেনীয়া ওস্তাদরা সবাই প্রায় দরবারওয়ায়ে ওস্তাদ ছিলেন অর্থাৎ কোন না কোন রাজদরবারে প্রতিষ্ঠত ছিলেন। পরবর্তীকালে এদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কলাবন্তদের আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হলো আর ধার-মিরাশী ওস্তাদ জনসাধারন নির্ভর হওয়ায় তাদের আর্থিক স্বীকৃতি এল। বর্তমানকালে আর্থিক স্বীকৃতি সামাজিক স্বীকৃতি কিন্তু যে উচ্চশিক্ষা, বিনয়-নম্রতা ও রুচি প্রকৃতির অধীকারী কলাবন্তরা ছিলেন তা ধার-মিরাশীদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মম্ভরিতা ও আত্নসচেতনাতে পরিণত হল। এই দুই অবস্থাই খারাপ। কিন্তু গৌরীপুর সংগীত দরবারে এই দুই ভিন্নধর্মী ওস্তাদ থাকা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রকিশোরের ও বীরেন্দ্রকিশোরের পরিচালনার গুণে এঁদের মধ্যে কোনদিন কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। তবে এ স্বীকৃত যে জনসাধারনের রুচি ধ্রুপদ আলাপকে গ্রহন করার মত উন্নত পর্যায়ে পৌছায়নি।

১৯৩০ সালে কোলকাতায় তিনি চলে আসেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর ও তার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিরদিন অবিস্মরনীয় থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মনবাড়িয়া

প্রাকবিভাগ ব্রাহ্মনবাড়িয়া মহকুমার (বর্তমানে জেলা) একটি গ্রাম শিবপুরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম। সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের ঐতিহ্যানুযায়ী তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরাও সঙ্গীতজ্ঞ। তথাপি একথা বলা যায় যে, তিনি এবং তার অনুজ ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ যেমন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুণী, মিঞা তানসেনের কন্যাবংশীয়, রামপুর নবাব এস্টেটের সভাসংগীতজ্ঞ এবং সংগীতশাস্ত্রের (ঔপপিত্তিক ও ক্রিয়াত্মক) স্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা ওস্তাদ মোহাম্মদ ওয়াজীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সঙ্গীতের উচ্চতম সেনীয়া বিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনটি অন্যান্য ভাইয়েরা পারেননি।

জ্যেষ্ঠ সমিরুদ্দিন খুব একটা সঙ্গীত চর্চা করেননি। কিন্তু পরবর্তী ভ্রাতা-সাধক ফকির আপ্তাবুদ্দিন খাঁ পূর্বোল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয়ের মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জ্ঞানের অধিকারী না হলেও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

সংগীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ডাকনাম ছিল 'আলম'। তদ্‌নুসারে আলম ভ্রাতৃগোষ্ঠী বলে পরিচিত ছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ এরা পাঁচটি ভাই এবং তিনটি বোন।

উল্লেখ্য ডাঃ নন্দীর একজন চিকিৎসক, সাধক, দার্শনিক, সমাজসেবক 'টলটয় অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত মহাপুরুস ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীল প্রতিষ্ঠিত উদার ধর্মীয় সংস্থা 'সর্বধর্ম সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলম ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ আফতাবউদ্দিন, আলাউদ্দিন ও আয়েতালী এখানকা শিষ্যত্ব গ্রহন করে সারা দেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ডাঃ নন্দির তিনজন প্রধান শিষ্য 'মলয়া' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তারা হলেন সর্বশ্রী মনমোহন দত্ত, লবচন্দ্রপাল এবং আপ্তাবুউদ্দিন খাঁ (এঁদের নামে আদ্যক্ষর যুক্ত হয়ে তাঁরা 'মলআ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

তানসেনের কন্যাবংশীয় মহাসঙ্গীতজ্ঞ বীণকার ওস্তাদ মোহাম্মদ ওয়াজীর খাঁ রামপুরের নবাব হামিদালী খাঁর নির্দেশে বরণ করে নিলেও প্রথম দিকটায় আলাউদ্দিন খাঁকে কোন শিক্ষা না দিয়েই ফিরিয়ে দিতেন। এর কারণ বোধহয় সাধারন বাঙালি ঘরের সন্তান এবং কোনো খানদানি সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সন্তান নন। এতে সকলেরই ধারনা হয়েছিল যে, ওয়াজীর খাঁ তাঁর বাঙালী শিষ্যকে কিছু শিখাবেন না। ঠিক ঐ সময় আপ্তাবউদ্দিন অনুজের খোঁজ করতে করতে হাজির হন। তিনি একটিবার ওয়াজীর খাঁর দিকে তাকিয়ে এবং একটা কথা বলেই ওয়াজীর খাঁর সব দাম্ভিকতা চূর্ণ করে দেন, "তুমি অত বড় সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত মাধ্যমে তুমি নিশ্চয়ই পরম কারুণিক আল্লাহতালার আরাধনা করে থাক। তোমার কি বিবেকে বাঁধে না যে এই বালকটি ঘরবাড়ি স্ত্রী সব ছেড়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। তোমার বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থেকে একটু দিলেই সে ধন্যবোধ করে আর তুমি তাকে কেবল ঘোরাচ্ছ। খুব সাবধান পরম শক্তিমান আল্লাহতালা তোমার শাস্তি বিধান করতে পারেন।" কথাটি সত্যে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত হয়েছিল তারপর থেকে আলাউদ্দিনের প্রকৃতি শিক্ষা শুরু হয়। তার যোগ্যতম পুত্র পিয়ারুমিঞা একদিন মাত্র রোগভোগ করে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ওয়াজির খাঁ একেবারে ভেঙে পরেছিলেন। শিষ্যদের তিনি বলতেন "বেটা তোম লোগোঁসে হাম বেইমানী কিয়া। ইসলিয়ে খোদানে মুঝে বরদোয়া দিয়া। আভি তুমি লোগ কিতনা লে সকোগে? ম্যাঁয় জ্যাদা অওর দশ সাল জিন্দা রহুঙ্গা। দশ সালমে কে হোগা ? ম্যাঁয় শোচতা হু কি মেরা ইলাম মেরা সাথ করবমেঁ জায়েগাঁ।" এর পর থেকে শিষ্য আফাউদ্দিনকে তার অদেয় আর কিছুই ছিলনা।

শিক্ষাজীবনে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এতই রিয়াজ বা সাধনা করতেন যে, তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। মাঝে মধ্যেই তিনি 'প্রতিজ্ঞ সাধনা' বা চিল্লা রেওয়াজ করতেন। অর্থাৎ কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতেন যে, 'আমি দু'মাস কিংবা তিন মাসের চিল্লা নিলাম'।

এ আলম পরিবারের মহত্ম সন্তান প্রভাত পুরুষ সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিক্ষা, জীবন সংগ্রাম, সঙ্গীত প্রচার ও অন্যান্য বিষয়ে বহুতথ্য এখন সর্বজন বিধিত কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত।

পরবর্তী জীবনে তিনি মাইহার রাজ্যের সঙ্গীত দরবারে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে শিষ্য-প্রশিষ্যদের অকপটে শিক্ষাদান করে গিয়েছেন এবং ভারতীয় সংগীতের বাণী বিশ্বময় প্রচার করে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সংগীতের সর্ববিভাগে বিশেষ করে যন্ত্রসঙ্গীতে তার অবদান অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে, বহু শিষ্য, প্রশিষ্যদের শিক্ষাদান করে, শিষ্যদের জীবনে ও পেশায় প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে এবং বহুজনের নানাভাবে হিতসাধন করে এই মহাজীবনের পরিণতি ঘটে ১১২ বৎসর বয়সে।

তাঁর সাধনা ও কর্মস্থল মাইহারেই তিনি চিরশান্তিতে শায়িত রয়েছে। তাঁর সুযোগ্যা জীবন-সঙ্গিনীকেও তাঁর পাশে রাখা হয়েছে। মাইহার বর্তমানে সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের এক মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

সঙ্গীতসম্রাট আলাউদ্দি খাঁর শিষ্যদের কথা বলতে গেলে স্বভাবতই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, কন্যা সঙ্গীতাচার্যা অন্নপূর্ণা দেবী ও জামাতা পন্ডিত রবিশঙ্করের কথা আসে।

ওস্তাদ্ আলী আক্‌বর খাঁ

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ আলাউদ্দিনের শিক্ষা গুণে ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সরোদিয়াতে পরিণত হয়েছেন। সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করার সময় 'বর্তমান কালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বাদ্যযন্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে তিনি আমেরিকার ক্যালিফোনির্য়াতে থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বময় এই বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে তথা বিশ্বসঙ্গীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সম্মানীয় পি.এইচ.ডি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

সঙ্গীতাচার্য অন্নপূর্ণা দেবী

সঙ্গীতাচার্য অন্নপূর্ণা দেবী পিতার নিকট ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ট্রতম রূপরীতি ধ্রুপদাঙ্গ আলাপের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 'সুরবীণা' বা সুর বাহার যন্ত্র মাধ্যমে তাঁর বিরাট সাফল্যে সাক্ষ্য রেখেছেন।

শিক্ষিকা হিসেবে তিনি তাঁর মহৎ পিতৃদেবের মতই আচার্য্যা স্থানীয়া। বোধহয় কোন ব্যাক্তিগত কারণে তিনি সাধারণ্যে তাঁর গুনপনা প্রকাশ করেন নাই বটে কিন্তু তার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক শিল্পীই প্রচুর সুনাম অর্জণ করে সঙ্গীতজীবনে প্রতিষ্ঠিত।

পন্ডিত রবিশঙ্কর

জামাতা পন্ডিত রবিশঙ্কর আলাউদ্দির খাঁ নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ভারতে শ্রেষ্ঠতম সেতারবাদক হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

প্রচলিত ধারী-মিরাশী সেতারবাদকদের পন্থাত্যাগ করে তিনি হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপরীতিগুলির প্রথাবদ্ধরূপের অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ধ্রুপদীরূপের সমন্বয়ীভূত এমন একটি রূপরীতির সৃষ্টি করেছেন যা ভবিষ্যৎ সেতারীয়াদের আদর্শ হয়ে বহুদিন থাকবে। তার সবচেয়ে বড় অবদান হল ভারতীয় সঙ্গীতের বহির্বিশ্বে প্রচার।

পন্ডিত রবিশঙ্করের একক প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যদেশে এখন ভারতীয় সঙ্গীত কেবল শ্রদ্ধাস্থানীয়ই নয়। তার চাহিদা লক্ষ্যনীয় ভাবে বেড়ে চলেছে। এখন যে কোন সামান্য সংগীত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ইউরোপ-আমেরিকায় পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে অর্থোপার্জণ করতে পারছেন-এ পন্ডিত রবিশঙ্করেই অবদান।

রবিশঙ্করকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু একবার দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানে "My greatest cultural Ambassador" বলে অভিহিত করেছিলেন।

আলাউদ্দিন খাঁর পরবর্তী অনুজ নায়েবআলি খুব একটা সংগীত চর্চা করেনি কিন্তু তার সুযোগ্য পুত্র খাদের হোসেন খাঁ মাইহারে পিতৃব্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষাকে অত্যন্ত কৃতী শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। ঢাকা বেতার কেন্দ্রে দীর্ঘকাল অতি উচ্চপদে থেকে অবসর গ্রহন করেন।

ওস্তাদ আয়েতালী খাঁ

সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ আয়েতালী খাঁ রামপুরের বিখ্যাত সেনীয়া কলাবন্ত সঙ্গীতনায়ক মহম্মদ ওয়াজীত খাঁরই দীক্ষিত শিষ্য। চার বৎসর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ওস্তাদ আলাউদ্দিনের নিকট শিক্ষা লাভ করার পর তিনি আলাউদ্দিন খাঁর নির্দেশে ওয়াজীর খাঁর

Dhaka University Institutional Repository

দরবারে উচ্চতর শিক্ষার জন্য হাজির হন। তার পর থেকে দীর্ঘ পনের বৎসর ওয়াজীর খাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে তিনি কৃতবিদ্য হন। তাঁর শিক্ষাকাল ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিক্ষাকাল প্রায় একই।

প্রথম পর্যায়ে আলাউদ্দিন খাঁর আহারাদি ও অন্যসব কিছুর জোগান দেবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল। সাংসারিক সব কাজই ওস্তাদ আয়েতালী খাঁকে দেখতে হত। সাধক আলাউদ্দিন সঙ্গীত সাধনা ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না।

ওস্তাদ আয়েতআলী খাঁ পরবর্তীকালে কিছুকাল মাইহার দরবারে ও রামপুর দরবারে কাজ করার পর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় তাঁর পরিচালনাধীনে বিশ্বভারতী-সঙ্গীত ভবন একটি উচ্চপর্যায়ের সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে।

ওস্তাদ আয়েতালী খাঁর তবলা ও এসরাজের ছাত্র ওস্তাদ ইয়ার রসুল খাঁকে ওস্তাদ আয়েতালী শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর বাজনা শুনে বিশ্বকবি তাঁকে 'ফুলঝুরি' নাম দিয়েছিলেন।

ওস্তাদ আয়েতালী খাঁ পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। নিজের দেশের সদর শহর ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে তিনি একটি সঙ্গীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাদ্যযন্ত্রের গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠান দুটিকে তার

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দি খাঁর নামে নামাঙ্কিত করেন। প্রথমটি আলাউদ্দিন শিক্ষাকেন্দ্র ও দ্বিতীয়টি আলম ব্রাদার্স।

আয়েতালী খাঁ কিছু নতুন বাদ্যযন্ত্রেরও সৃষ্টি করেন। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রসারং এবং মন্দ্রনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র 'সরোদের' তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। স্বীয় বিশ্ববন্দিত ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সরোদটি তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত।

দেশবিভাগের পর তিনি (বর্তমানে বাংলাদেশ) পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যান। এখানে তিনি বহু রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান তার মধ্যে 'নিশান-ই পাকিস্তান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৭ সালের ২রা সেপ্টম্বের এই সুফি সাধক, ইসলাম ভক্ত ও অনুসারী অথচ সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল এই মহৎ ব্যক্তিটির জীবনের অবসান হয় কুমিল্লা শহরে। কুমিল্লাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর অগনিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য এবং বর্তমানে সঙ্গীত প্রচারে নিয়োজিত এবং নিবেদিত প্রান। এদের মধ্যে ইরসাদ আলী, মতিয়ুর রহমান (মোতী মিঞা), আলী আহ্মেদ খাঁ (ফুলঝুরি), খাদেম হোসেন খাঁ, ইসরাইল খাঁ (যন্ত্র সঙ্গীতে), এবং রাজেন্দ্রলাল রায়, উমেশচন্দ্র বণিক, অশ্বিনীকুমার রায় ও পরেশ দেব প্রভৃতি কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তার সুযোগ্য পুত্রদের মধ্যে সবাই কৃতী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী। জ্যেষ্ঠপুত্র আবেদ হোসেন সেতার ও সরোদ উভয় যন্ত্রেই পারদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তাঁর পুত্র মাহাদাৎ হোসেন খাঁ পিতৃব্য ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁর কাছে সরোদ শিখে উপমহাদেশে বিখ্যাত হয়েছেন।

ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ

ওস্তাদ আয়েতালী খাঁর মেজপুত্র ওস্তাদ বাহাদুর হুসেন খাঁ ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরোদিয়া বলে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি বহুবার বিদেশ সফর করেছেন এবং বিশেষ কৃতীত্বের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বেতার ও দূরদর্শনে অংশগ্রহন করেছেন।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ কেবল সরোদিয়াই ছিলেন না তিনি উচ্চশ্রেণীয় সুরকার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সুরাপিত 'মেঘে ঢাকা তারা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'গর্ম হাওয়া' ইত্যাদি চলচ্চিত্র তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শিক্ষক হিসাবেও তিনি অত্যন্ত সফল হয়েছেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীতেজন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শ্রীমনোজ শঙ্কর, শ্রীমতী স্তুতি দে (মোম্বাই) ও পুত্রদ্বয় কিরীট খাঁ ও বিদ্যুৎ খাঁ প্রমুখ গায়ক ও যন্ত্রীরা খ্যাতনামা গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রী হিশেবে খ্যাত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মনবাড়িয়ার তালবাদ্যবিশারদগণ

ব্রাহ্মনবাড়িয়া তালবাদ্যবিশারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ছিলেন শ্রীঅমর চক্রবর্তী। তিনি ঢাকা নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র বসাকের নিকট তালবাদ্য শিক্ষা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাছাড়া সুযোগ্যপুত্র শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী ও শ্রীসুরেন্দ্র দেব আচার্য অমর চক্রবর্তীর নিকট তবলার পাঠ গ্রহন করে কৃতবিদ্য হন।

তাছাড়া শ্রীসুরেন্দ্র সূত্রধর, প্রসন্ন বণিক, ও হরিচরণ সাহা ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার সঙ্গীত আসরে তাদের পরিবেশনা ও সহযোগিতা ছিল।

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য

ব্রাহ্মনবাড়িয়া তবলিয়াদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য তিনি হলেন শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য। ইনি প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্গীতাচার্য ওস্তাদ আয়েতালী খাঁ প্রমুখ গুণীর নিকট থেকে তবলার প্রাথমিক পাঠ গ্রহন করে পরবর্তীকালে লখ্নৌতে পন্ডিত সুদর্শণ অধিকারী ও পরে লখ্নৌর ঘরানার প্রখ্যাত খলিফা মহম্মদ ওয়াজীদ হুসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করে লখ্নৌ ঘরানার অতি উন্নত শৈলী বা বাজ আয়ত্ত করে বিখ্যাত হন। দেশবিভাগের পূর্বেই তিনি কলকাতায় আসেন এবং কয়েকটি 'অল ইন্ডয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এ বাজিয়ে বিখ্যাত হন। 'তানসেন মিউজিক কনফারেন্স-এ একবার তিনি একক তবলা প্রায় দেড়ঘন্টা বাজিয়ে শ্রুতি মন্ডলীকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর সেই বাজনার পর ওই আসরে উপস্থিত পন্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

কিষান মহারাজ, পন্ডিত শামতাপ্রসাদ, ওস্তাদ আল্লারাখা খাঁ, ওস্তাদ সৌকৎ আলী খাঁ. ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, ওস্তাদ কালে খাঁ প্রমুখ তবলীয়ারা সবাই উঠে এল অনিল ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর সেই বাজনার ভূয়সী প্রশংসা করে যান।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আগরতলা ও কুমিল্লা উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য খ্যাত এবং নাম গুরুত্বপূর্ণ হলেও কুমিল্লা শহরে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ব্যাপকতা অন্যান্য শহরের বেশী ছিল। পূর্ববংলায় আদিমতম উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার শুরু এই কুমিল্লা শহরেই হয়েছিল-একথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মুঘল সম্রাট শাহ্জাঁহানের মৃত্যুর পর মুঘল তক্তুতাউসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুবরাজ শাহ্সুজা কুমিল্লার ওপর দিয়ে আরাকানের দিকে চলে যান। সেসময় তিনি বেশ কিছুকাল কুমিল্লা শহরে ছিলেন। তাঁর সম্মানে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য গোমতী তীরে এক সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করান। সেই বিখ্যাত মসজিদ সুজা-মসজিদ নামে এখনো বিদ্যমান এবং কুমিল্লা শহরের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থল।

সুজা বাদশার পারিষদবর্গের মধ্যে বেশকিছু সংগীত শিল্পী থাকলেও তাঁদের বেশিরভাগই লঘুসঙ্গীত অর্থাৎ গীত, গজল ও নৃত্য সম্বলিত গীতেরই শিল্পী ছিলেন। কারণ শাহ্সুজা এ ধরণের সংগীতেই বেশি আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু, এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাঁর পারিষদবর্গের মধ্যে একজন অভিজাত সেনীয়া বংশের কলাকারকে সসম্মানে স্থান দিয়েছিলেন। সুজা মস্জিদের কারীসাহেবের বংশের কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাঠগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই অধস্তন পুরুষেরা সেই বিদ্যা রক্ষা ও প্রচার করে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অতি উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ-

Dhaka University Institutional Repository

ধামার চর্চার সঙ্গে কুমিল্লাতে খেয়াল, ঠুমরি, গজল ও কাওয়ালীর বেশ চর্চা হয়েছিল। শাহ্‌সুজার সেইসময় থেকে এর ধারাবহিকতা অবশ্য প্রমাণ করা শক্ত-কারণ দালিলিক প্রমাণের অভাব।

ধ্রুপদিয়া শ্রী শ্যামাচরণ দত্ত

কুমিল্লার প্রথম উল্লেখযোগ্য খ্যাত ধ্রুপদীয়া শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রথমে কোনো পূর্ববর্ণিত সেনীয়া কলাকারের শিষ্যের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাঠগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা নিবাসী হরিওস্তাদ বা হরিচরণ কর্মকারের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি আগরতলায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সভাগায়ক স্বনামধন্য রঙ্গনাথ যদুভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধ্রুপদ ও টপ্পা গায়ক হিসেবে বিখ্যাত হন। উল্লেখযোগ্য যে, সেসময় খেয়াল ও ঠুম্‌রি গান অপেক্ষা ধ্রুপদ ও টপ্পা গানেরই প্রচলন ছিল বেশি। শ্যামাচরণের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে খুবই আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু, সেকালের শিক্ষিত মধবিত্তের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষ করে ধ্রুপদ খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কুমার শচীনদেব বর্মনের পিতৃদেব মহারাজকুমার নবদ্বীপ দেববর্মন বাহাদুর কোনো রাজনৈতিক কারণে আগরতলা ত্যাগ করে কুমিল্লায় বাস করতেন। সাধারণ্যে তিনি নবদ্বীপ বাহাদুর বলে পরিচিত ছিলেন। নবদ্বীপ বাহাদুর অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সংগীতানুরাগী ছিলেন। মূলত তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় শ্যামাচরণ কুমিল্লা শহরে 'সংগীত সমাজ' নামে একটি উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন। বস্তুতপক্ষে মহারাজকুমার নবদ্বীপ বাহাদুরকেই বিখ্যাত বাঁশের বাঁশি 'ত্রিপুরা ফ্লুটের' আবিষ্কর্তা বলে ধরা হয়ে থাকে। তাঁর প্রপৌত্র কুচবিহারের রাজবংশের কুমার মনুনারায়ণ ত্রিপুরা প্রবক্তা হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় বিখ্যাত বংশীবাদক কুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ (রাজাবাবু) ও কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ (চানুবাবু) বেশ কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজিয়ে ও ফিল্ম ইত্যাদিতে বাজিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সংগীতের মৌলিক বুনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি বেশ সুনাম ও সাফল্য অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে বেশ কিছু বিখ্যাত কলাকারের সংগীতিক শিক্ষাজীবনের সেখানেই আরম্ভ। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শচীন্দ্র দত্ত, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত (কলকাতা), কুমার শচীনদেব বর্মন (বোম্বাই), ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁ খস্রু (কলকাতা), জ্ঞান দত্ত (বোম্বাই), সত্যবক্সী (ঢাকা) ও শ্যামাচরণের কন্যা মায়াদেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামাচরণের সুকন্যা মায়াদেবী অবশ্য পরবর্তীকালে রামপুরের ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ ও আগ্রার গফুর খাঁ প্রমুখ সংগীতজ্ঞের নিকট খেয়াল ও ঠুম্‌রি শিক্ষা করে তৎকালীন ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে শ্যামাচরণের একান্ত-একনিষ্ঠ প্রচেষ্ঠায় তৎকালীন অতি রক্ষণশীল সামাজিক বর্তাবরণ থাকা সত্ত্বেও কুমিল্লা শহরের অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা বিষয়ে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাচরণের অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য সুরসাগর হিমাংশু দত্তর জ্যোষ্ঠ্য ভ্রাতা শচীন্দ্রনাথ দত্ত অতি প্রতিভাবান বলে সংগীতজ্ঞ মহলে খ্যাত হয়েছিলেন। লখ্‌নৌর মারিস কলেজ অফ মিউজিকে যন্ত্র ও কন্ঠ উভয় বিভাগেই চোখ ধাঁধানো ফলাফল অর্জণ করে তিনি পন্ডিত ভাতখন্ডেজি এবং প্রিন্সিপ্যাল শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার মহোদয়ের খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ম্যারিস্ কলেজে সেসময় সারা ভারতেরই কিছু প্রতিভাবান সংগীত শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং জীবনে অতি উচ্চ পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন। শচীন্দ্রনাথ উচ্চ কোটির শিল্পী ছিলেন বটে কিন্তু সংগীতের তাত্ত্বিক দিকটি কখনো উপেক্ষা কিংবা অবহেলা করেননি। ব্যক্তিগত ক্রিয়াত্মক রেয়াজ বা সাধনা ছাড়া তিনি দিনরাত্রির বহুসময় অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। তাঁর সংগীতিক গ্রন্থাগার লক্ষ করার মতো ছিল। নানা দেশের সংগীত সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংগ্রহ তো ছিলই তাছাড়াও মোগল ও পাঠান যুগের উর্দু ও ফারসি কিতাবের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। তিনি এক সম্পর্কে আমাদের কাকা হতেন। বাল্যকালে বাজনা শোনার আগ্রহে প্রায়ই তাঁর বড়িতে যেতাম। আমার বাড়ির পরেই একটা মাঠ। তারপরেই ওঁদের বাড়ি। মাঠ পেরিয়ে হেঁটেই ওঁদের বাড়িতে যেতাম। আমার সংগীতে আগ্রহ দেখে নানা উপদেশ দিতেন- লেখাপড়া আর সংগীত সাধনা একসঙ্গে কি করে চলতে পারে। মনে পড়ে-আমাকে চিত্রস্বলিত একটা মোটা বই দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন "বুঝলি, এই বইটা সাহেবদের দেশের সংগীতের আদি ইতিহাস"। বইটার নাম এখনো মনে আছে।"Joniam mode and its

Dhaka University Institutional Repository

further divelopments" । তাঁর সংগ্রহের উর্দু কিতাবগুলোও আমাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করত। যদিও একটি অক্ষরও আমরা বুঝতাম না তাহলেও কিতাবগুলোর আকাঁবাঁকা হরফগুলি দেখতে বেশ মজা পেতাম। একথা একদিন তাঁকে বলাতে তিনি আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে টাইপোগ্রাফি বা হরফ লিখনে মুসিলমরা যে চর্চা করেছিলেন অন্য ধর্মাবলম্বীরা তা করেননি। এর কারণ হিসেবে বলেছিলেন যে মুসলিম দেশগুলির অধিবাসীদের শিল্পচেতনার কোন অভাব ছিল না কিন্তু ওদের ধর্মে মূর্তি রচনা করা নিষিদ্ধ বলে ওদের শিল্পচেতনা টাইপোগ্রাফি বা হরফ রচনার ও স্থাপত্যের পথে পরিচালিত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথের রন্ধনপ্রণালীর দিকেও বেশ নজর ছিল। লখ্নৌর খানদানি মুসলিম পরিবারের মহিলাদের কাছ থেকে শিখে এসে বহু মোগলাই রান্না তিনি আমার দিদিদের শিখিয়েছিলেন।

সুর সাগর হিমাংশু দত্ত

শচীন্দ্র নাথ দত্তের অতিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরকার সুরসাগর হিমাংশু দত্ত মহাশয়ের তিনি ছিলেন প্রকৃত সংগীত গুরু। তিনিই সুরসাগরকে উত্তর প্রদেশের কিছু সৃষ্টিশীল সুরকারের রচনা শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীত ঘেঁসা রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত মনোরঞ্জক। লখ্নৌর ছোটখাটো ফিরিওয়ালারা পর্যন্ত মাঝেমধ্যে এমন সুন্দর রচনা গেয়ে বেড়াতেন যে বলার নয়। লখ্নৌর হালুয়া বিক্রেতার গান এবং চানাচুরওয়ালারা পর্যন্ত এমন সুন্দর সুন্দর রচনার পরিচয় দিতেন

Dhaka University Institutional Repository

যে তাতে তাঁদের অতি উঁচুদরের সংগীত চেতনার পরিচয় পাওয়া যেত। হালুয়া বিক্রেতা একজনের গান আমার মনে আছে। সুরসাগর এইসব গানের সুর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুনসিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ফিল্‌মি দুনিয়ায় এবং রেকর্ড রেডিওর জগতে সুরসাগরের নাম কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য এই কথা ভাবলে চলবে না যে তাঁর রচনায় কোনো মৌলিকত্ব ছিল না। তবে তিনি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গ্রাম্য সুর খোঁজা রচনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অতি সুন্দরভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পিছনে অনেকটাই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শচীন্দ্রনাথের অবদান রয়েছে। শচীন্দ্রনাথের সংগৃহীত হালুয়া বিক্রেতাদের একটি গানের নমুনা দেয়া গেল। এর থেকে লখ্‌নৌর সাধারণ লোকদের কাব্যিক এবং সাংগীতিক চেতনার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

"লে লো গরমাগরম হালুয়া
এ বিক্তা হ্যায় শস্তা।
বানা হুয়া হ্যায় ঘি চিনিকো
কিস্‌মিশ্‌ বাদাম ঔর পেস্তা ইত্যাদি

এইসব সহজবোধ্য সুর চট করে সাধারণকে আকৃষ্ট করত এবং তাঁরা গুনগুন করে তা গাইতে পারতেন। সুরসাগরের জনপ্রিয়তার কারণও বোধহয় তাই।

শচীন্দ্রনাথ পন্ডিত শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডেজি প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'ম্যারিস কলেজ অফ মিউজিক'-এর প্রথম যুগের ছাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত মেধাবী আর ধীরস্থির স্বভাবের জন্য তিনি পন্ডিত ভাতখন্ডেজির অতি প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম বলে পরগণিত হয়েছিলেন। ম্যারিস কলেজের প্রথম পর্যায়ের ছাত্র হিসেবে তিনি স্নাতক পর্যায়ের দুইটি পরীক্ষা 'সংগীত বিশারদ' (কন্ঠসংগীত) ও 'বাদ্যবিশারদ' (যন্ত্রসংগীত) এই উভয় পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত মাইহার দরবারের সংগীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে দিল্লি শহরকের্মকেন্দ্র করে তিনি বহুকাল নানা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সংগীত শিক্ষাদান এবং প্রচার ও প্রসারের কার্য করে গিয়েছেন। তিনি 'আকাশবাণী'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টারূপে আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর দিল্লিতেই দেহান্ত ঘটেছে।

অধ্যাপক হরিহর রায়

পরবর্তীকালে কুমিল্লা শহরে খেয়াল ও ঠুম্‌রির চর্চা আরম্ভ হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হরিহর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত তাঁরই শিক্ষাধীনে কুমিল্লায় সাধারণ্যে খেয়াল ও ঠুম্‌রি আদৃত হয়ে ওঠে। ইনি মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের সংগীতজ্ঞ ও দানবীর জমিদার মহারজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষাধীনে গড়ে উঠেছিল এবং গৌরীপুর বাটীর সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছিলেন দেশবিভাগের পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এই শহরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খেয়ালিয়া ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন

কুমিল্লার প্রথম উচ্চপর্যায়ের এবং উল্লেখযোগ্য খেয়ালীয়া-ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁ (খস্রু সাহেব)। খস্রুভাই নামেই তিনি অবিভক্ত বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীতমহলে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রিয়দর্শন, অভিজাতবংশীয়, উচ্চশিক্ষিত, মৃদুভাষী, সংগীত অন্তপ্রাণ এই ভদ্রলোকটি উচ্চ সরকারি পদাধিকারী হয়ে এবং তাঁর গুরুদায়িত্বের প্রতি অবহেলা না করেও অবসরের প্রায় সব সময়ই সংগীতচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তিনি সংগীতজগতের সর্বস্তরে খস্রুভাই বলে পরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সেই দাসীপনার যুগে তিনি যেভাবে এই মহৎ শিল্পীর প্রকৃত রূপটি সাধারণ্যে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তা সর্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে কিছুমাত্রও সাংগীতিক গুণাগুণ দেখলে তিনি তাকে নানাভবে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তিনি তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের প্রায় সব মহৎ সংগীতগুণী ও শিল্পীদের সঙ্গ করেছেন। বস্তুত এই অতি নিরহঙ্কার মহৎ সংগীতগুণী ব্যক্তিটি সংগীত ব্যতীত আর বেধহয় কিছুই ভাবতে পারতেন না। তিনি প্রধানত রামপুরের প্রখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ এবং ওস্তাদ তমদ্দুক হুসেন খাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করলেও খলিফা ওস্তাদ বদল খাঁ, মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ মুশতাফ হুসেন খাঁ, ওস্তাদ খাদিম হুসেন খাঁ প্রমুখ বহু সংগীতগুণীর নিকট থেকে অতি উৎকৃষ্ট চিজ, বন্দিশ ও ঔপপত্তিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত মৈমনসিংহ-

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাগাছার জমিদার বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর অমূল্য সংগ্রহ থেকেও বহু সাংগীতিক ধনরত্ন আহরণ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহের ভান্ডার এতই বৃহৎ ছিল যে তিনি যেকোনো রাগের ১৫-২০ খানি বন্দিশ অক্লেশেই শুনিয়ে দিতে পারতেন। প্রাক-বঙ্গ বিভাগ বাংলার প্রখ্যাত গায়কগণ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, সত্যেন ঘোষাল প্রমুখ গায়করা তাঁকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

খসরু সাহেব প্রধানত কন্ঠসংগীজ্ঞ হলেও ভারতীয় সংগীতের অন্যতম বৃহৎ বিভাগ-তালাধ্যায়কে অবহেলা করেননি। তিনি খলিফা মসীৎ খাঁর (রামপুর) শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘকাল তাঁর কাছ থেকে তবলার পাঠগহণ করেছেন। তাঁর তবলার গুরু ভারতবিখ্যাত খলিফা মসীৎ খাঁর সংগে তাঁর সম্পর্ক অতি মধুর ছিল। মসীৎ খাঁ সাহেব সর্বদাই বলতেন খসরু "বহত দিমাকদার আদমী হ্যায়, চিজোঁকো তুরন্ত সমঝলেতা ও কব্জা করভি লেতা।" বহু আসরে বহু গুণীর সঙ্গে সংগত করেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। বঙ্গবিভাগের পর তিনি পুর্ববাংলাতেই থেকে যান (তখনকার পূর্ব পাতিস্তান)। ঢাকার বিখ্যাত সংগীত অ্যাকাডেমি 'বাফা'র তিনি প্রধান হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিছুকাল পরে কুমিল্লায় তাঁর দেহান্ত ঘটে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রী বীরেন্দ্র পাল, সমরেন্দ্র পাল, সুবোধ গাঙ্গুলী, খলিলুর রহমান এবং যন্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে মহম্মদ হবিবুল্লা খাঁ, মহম্মদ তোতামিঞা সেতারীয়া হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পুববাংলার বিখ্যাত তবলীয়া

Dhaka University Institutional Repository

সুবোধচন্দ্র দাস (কেষ্টবাবু) তবলার বহু চিজ খসরু সাহেবের কাজ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। খসরু সাহেবের কণ্ঠসংগীত তৎসহ কেষ্টবাবুর তবলাসংগত উচ্চাঙ্গ সংগীতমহলে খুবই আদৃত ছিল। দুজনের লয়কারী অনেক সময় শ্রোতাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

শ্রী সমরেন্দ্র পাল

খসরু সাহেবের প্রধানতম শিষ্য ছিলেন শ্রীসমরেন্দ্র পাল। সমরেন্দ্র ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত খেয়াল ও ঠুম্‌রি পরিবেশন করতেন। তাছাড়া অবিভক্ত বাংলার মফস্বল শহরেও গান গেয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সমরেন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্র পাল (গুলু) ও অলোক পাল (আলো), শ্রীঅমিয় চৌধুরী (বর্তমানে দাদাজি নামে বিখ্যাত সাধু) ও রাম ভট্টাচার্য বেতারে ও নানা উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরে সংগীত পরিবেশন করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। শেষোক্ত জন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন ও পুববাংলার বিভিন্ন স্থানে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহম্মদ হোসেন খাঁ-খসুকে সরাকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার দরুন অবিভক্ত বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বদলির চাকুরিতে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হত। কুমিল্লা শহরে তিনি চাকুরির দরুন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারতেন না। তজ্জন্য কুমিল্লা শহরে তাঁর ছাত্রসংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। অন্যান্য শহরের খেয়াল ও ঠুম্‌রি গায়কদের অবশ্য এর জন্য তাঁর নিকট থেকে উচ্চাঙ্গে চিজ

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন। খেয়াল ও ঠুম্‌রির ব্যাপক প্রচারের বিষয়ে যে দুজন সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দাস ও শ্রীসমরেন্দ্র পাল। সুরেন্দ্রনারায়ণ কলকাতায় দীর্ঘকাল নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিজগুণে সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হন। গিরিজাশঙ্কর অকপটে তাঁকে সংগীত বিদ্যা দান করেন। এই শিক্ষাতে কৃতবিদ্য হয়ে সুরেন্দ্রনারায়ণ কুমিল্লা শহরেই বসবাস করতে থাকেন। এমনকী বঙ্গবিভাগের পরও তিনি কুমিল্লাতেই থেকে যান। পরবর্তীকালেও তাঁর কাছে বহু সংগীত বিদ্যার্থী উপকৃত হয়েছেন। বস্তুত সুরেন্দ্রনারায়ণ ও সমরেন্দ্র পালের শিক্ষাগুণে কুমিল্লা শহরে খেয়াল ও ঠুম্‌রি গান বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শিক্ষিত সমাজে অবহেলিত এই মহৎ শিল্পটি অনেকাংশে ঁএদের প্রচেষ্টায় তার পূর্বমর্যাদা ফিরে পায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যাপক চর্চার জন্য কুমিল্লা শহরের যে খ্যাতি হয়েছিল তার মূলে ঁএদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। সুরেন্দ্রনারায়ণ মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের এবং মুক্তাগাছার রাজবাটীর সঙ্গে পরিচিত এবং যুক্ত হয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচুর অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছিলেন এবং তা তিনি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতি অলকা দাস পিতার তালিমগুণে বেশ কৃতবিদ্য খেয়ালীয়াতে পরিণত হয়েছেন। তিনি নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ বেতারে অংশগ্রহণ করে খেয়াল ও ঠুম্‌রি পরিবেশন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীসমরেন্দ্র পাল তাঁর গুরু ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁ (খস্রু) নিকট থেকে রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ তমদ্দুক হুসেন খাঁ ও মেহেদী হুসেন খাঁর কিছু খানদানি খেয়াল ও ঠুম্‌রি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিও সেইসব উচ্চপর্যায়ের চিজ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করতে কার্পণ্য করেননি। অকপটে তিনি তাঁর শিষ্যদের তা দান করেছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীরাম ভট্টাচার্যকে তিনি পুত্রস্নেহে সেইসব অমূল্য চিজ দান করেছিলেন। যার দরুন রামবাবু অতি উঁচুদরের গায়ক হয়ে উঠেছিলেন এবং তৎকালীন পূর্ববাংলায় অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। রামবাবুর ঈশ্বরদত্ত অতি সুরেলা ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ওইসব খানদানি রচনাগুলি শুনে শ্রোতার অভিভূত হয়ে পড়তেন।

শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী

কুমিল্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল ও ঠুম্‌রি গায়ক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর (মৈমনসিংহ নিবাসী সংগীতকোবিদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নন) শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্র প্রধানত কলকাতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি মেধাবী ছাত্র সুরেশচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রয়োজনে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আসেন। ইতিপূর্বে তিনি সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনে মোহিত হয়েঠিলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য তাঁর চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ভীষ্মদেব তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। এই বিরাট উপমহাদেশের বহুস্থানে এবং প্রধান উচ্চাঙ্গ সংগীত কেন্দ্রগুলিতে তিনি কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে ভারতের সর্বত্র শ্রোতাদের মন জয় করে ফেলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এহেন আচার্যের শিক্ষাদানের সম্মতি পাওয়া তৎকালীন সামাজিক-সাংগীতিক পরিবেশে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কেননা, তখনকার সংগীতাচার্যরা শিষ্যগ্রহণ করতেন কেবল গুণের বিচারে, অর্থের জন্যে নয়। আচার্যদের বালক সুরেশচন্দ্রের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন যে একটি সাধারণ বাংলা গান শুনেই তিনি সুরেশচন্দ্রকে শিষ্যত্বে বরণ করে নেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আচার্যদেবের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য চিজ গুরুর কৃপায় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পর তিনি আচার্যদেবের প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। সবসময় সুরেশকেই তাঁর প্রয়োজন হত। এই করে সুরেশচন্দ্রের ভারতের বহু স্থান ঘোরা হয়ে গিয়েছিল। সুরেশচন্দ্রের উচ্চ শিক্ষার্জিত বিচারবোধ তাঁর সংগীত ক্ষেত্রেও কার্যকরী ছিল। কাকে গ্রহণ করতে হবে এবং কাকে বর্জন করতে হবে এ বোধের অভাব সাধারণত অশিক্ষিত সংগীত চর্চাকারীদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষিত হয়। সংগীত যে একটি কণ্ঠ ব্যায়াম মাত্র নয় তার নান্দনিক দিকটিই মহত্তর এ বোধের অভাব সুরেশচন্দ্রের কখনো হয়নি। কর্মজীবনে বিশাল মার্কিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও সংগীতচর্চায় তাঁর ছেদ পড়েনি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগীত গ্রন্থের তিনি সম্পাদক এবং তাঁর রচিত 'সুধাসাগর তীরে' ও 'স্মরণ বেদনার বরণে' -বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দুটি অবশ্য পাঠ্য আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। কুমিল্লার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সংগীত সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীও আচার্য ভীষ্মদেবের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবিভাগের পূর্ববর্তীকালে গায়ক হিসেবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য সেবাতেই তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সংগীত সাহিত্যে তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর কিছু সংগীত গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

শ্রীমতি মায়া সেনগুপ্ত

কুমিল্লার যে কজন মহিলা উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সংগীত শিল্পী অল্পকালের মধ্যে সারা দেশেই সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা হলেন শ্রীমতী মায়া সেনগুপ্ত-যিনি মায়াদেবী নামে সারা ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি পূর্বে উল্লেখিত ধ্রুপদীয়া সংগীতাচার্য শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যা। শ্যামাচরণ খেয়াল ও ঠুম্‌রি গানকে ধ্রুপদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে একবারেই মানতেন না। বরঞ্চ, তিনি খেয়াল ও ঠুম্‌রিকে ধ্রুপদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের বলেই প্রচার করতেন। কিন্তু, তাঁর কন্যা সেকালের বিখ্যাত মহিলা শিল্পী গহরজান, জোহ্‌রা বাঈ, মুস্তরী বাঈ প্রমুখের গান রেকর্ড-মাধ্যমে শুনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই, একরকম পিতৃআদেশ অমান্য করেই মায়াদেবী কলকাতায় উচ্চপর্যায়ের খেয়াল-ঠুম্‌রির পাঠ গ্রহণ করতে চলে আসেন। এভাবেই তাঁর খেয়ালীয়া জীবনের শুরু। রামপুর ঘরানার দুজন প্রখ্যাত সংগীতগুণী প্রথমে ওস্তাদ খাদিমহোসেন খাঁ ও পরে ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁর নিকট থেকে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। কিছুদিন পর ওস্তাদ খাদিম হুসেন খাঁ বোম্বই চলে গেলে পর তিনি রামপুর ঘরনার অন্যতম ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁর

Dhaka University Institutional Repository

কাছে শিখতে থাকেন। পরবর্তীকালে মেহেদী হুসেন খাঁ রামপুর চলে গেলে তিনি আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ গফুর খাঁর কাছে দীর্ঘকাল সংগীত শিক্ষালাভ করে কৃতবিদ্য হন। তৎকলীন বঙ্গসমাজে কোনো শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা ও সাধারণ্যে তা নিবেদন করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মায়াদেবীকেও তাই প্রচুর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দৃঢ়পদক্ষেপে তিনি নিন্দা, কুৎসা ও বিদ্রূপ এবং আরো অনেক সক্রিয় বাধা ও বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য সংগীত প্রতিযোগিতা ও সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজে। বিশিষ্ট বিচারকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন মাইহারের সংগীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ শীল, প্রখ্যাত অধ্যাপক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভুপেন বসু প্রমুখ গুণীবৃন্দ। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মায়াদেবী সংগীত মহাসম্মেলন (অযয ইবহমধষ সঁংরপ পড়হভবৎবহপব)-এ অংশগ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেই সম্মেলনে আফতাব-ই-মৌসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ (বরোদা), ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (মাইহার), নৃত্যাচার্যা বালাসরস্বতী (মাদ্রাজ) এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট গুণীরা কলকাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। উপরোক্ত গুণীবৃন্দ ব্যতীত তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী-গুণীরা সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর, ভীষ্মদেব, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ গায়করা ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল-ওই সম্মেলনের মূল অতিথি ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। সিনেট হলে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলন সারা বাংলাদেশে উচ্চঙ্গ সংগীত বিষয়ে এক বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় মায়াদেবী প্রথম পুরস্কার পান এবং ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে প্রথম হয়ে গোয়ালিয়র স্টেট মেডেল পান। এরপর তিনি দিল্লি, লাহোর, লখ্নৌ, মাইশোর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি ভারতের বিখ্যাত সংগীত কেন্দ্রগুলিতে আমন্ত্রিত হয়ে তথাকার সংগীত মহাসম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৩৫ সাল থেকে তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়িকা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর সেখানকারও নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়িকা হিসেবে দীর্ঘকাল উচ্চাঙ্গ সংগীত নিবেদন করেছেন। সংগীতকে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর থেকে তিনি শেষ অবধি মহাসাধিকা মীরাবাঈ-এর মতো এক সাধিকার জীবন যাপন করে গিয়েছেন।

শ্রীমতি শৈল দেবী ও শ্রীমতি মীনা বন্দোপাধ্যায়

অপর দু'জন মহিলা উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী শ্রীমতী শৈলদেবী ও শ্রীমতী মীনা বন্দোপাধ্যায় অনবদ্য কণ্ঠ মাধুর্য ঈশ্বরের দান হিসেবে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, অকালমৃত্যু এঁদের দুজনকেই তাঁদের কর্মকৃতি থেকে সরিয়ে দেয়। শ্রীমতী শৈলদেবী প্রথমে কুমিল্লার সংগীতাচার্য সমরেন্দ্র পালও পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে

Dhaka University Institutional Repository

অল্পদিনের মধ্যেই অতি খ্যাত হয়ে ওঠেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রেডিও, রেকর্ড ও ফিল্মের নেপথ্য গায়িকা হিসেবে তিনি সারা দেশকে একেবারে মুঠোয় করে নেন। শ্রীমতী শৈলদেবীর কণ্ঠ মাধুর্যের জন্য তাঁকে 'নাইটিঙ্গেল অব বেঙ্গল' উপাধি দেয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত একটি দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে তাঁর জীবনের ছেদ পড়ে যায়। শ্রীমতী মীনা বন্দোপাধ্যায়ের জীবন আরো করুণ। কুমিল্লার অন্যতম সংগীতাচার্য শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ দাসের শিক্ষাধীনে থাকার সময় তিনি কলকাতায় আসেন নিজের গানের রেকর্ডিং করতে। মাত্র একটি রেকর্ডের প্রচারের দরুন তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, কিন্তু, তাঁরও জীবনের ছেদ পড়ে যায় একটি সংক্রামক ব্যাধিতে।

পূর্বে উল্লেখিত যন্ত্রসংগীতজ্ঞদের মধ্যে কেবল শচীন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলা হয়েছে। তিনি লখ্নৌ-র বিখ্যাত 'ম্যারিস কলেজ অফ মিউজিক' থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্র (সেতার) উভয় বিভাগেই স্নাতক হয়ে এবং মাইহারের সংগীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কৃপাধন্য হয়ে বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লি শহরকে কর্মকেন্দ্র করে ওইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। দীর্ঘকাল সংগীত শিক্ষাদান ও প্রচারের কর্মে ও বহু সরকারি সংস্কৃতি কর্ম পরিষদের ও সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘকাল নিরলস কর্ম করে সম্পতি তিনি দেহরক্ষা করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের সেতারীয়াদের মধ্যে সর্বশ্রী রাজা রায়, শৈলেশ সেন, জিতেন দাশগুপ্ত (মধু), ধীরেন দাশগুপ্ত (ননী) শ্রীতোতা মিঞা, মহম্মদ হবিবুল্লা খাঁ, শান্তি দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাজা রায় ও

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত সেতারবাদনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে দীর্ঘকাল কলকাতায় সংগীত সাধনা করেছেন। বঙ্গবিভাগের পর শ্রীরাজা রায় কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানকালে তিনি কলকাতা শহরের প্রবীণতম-অতি অভিজ্ঞ সেতারীয়াদের মধ্যে অন্যতম পরিগণিত বলে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং আকাশবাণী কলকাতার একজন নিয়মিত সেতারবাদক। শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত বঙ্গবিভাগের পূর্বে থেকেই আকাশবাণীর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ৺সুরেন্দ্রলাল দাস পরিচালিত কলকাতা বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব বৃন্দবাদ্য (অর্কেষ্ট্রা) যন্ত্রীসংঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য বৃন্দবাদনে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া দীর্ঘকাল কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে তাঁর একক বাদ্যও প্রচারিত হয়েছে। সর্বশ্রী শৈলেশ সেন, তোতামিঞা, ধীরেন দাশগুপ্ত, মহম্মদ হবিবুল্লারা কেউই পেশাদার হননি বটে কিন্তু সবাই কৃতবিদ্য হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সরোদীয়াদের মধ্যে সর্বশ্রী জিতেন দাশগুপ্ত (ভোলাবাবু), নীহারবিন্দু চৌধুরী (পুতুলবাবু), আশু রায়, হেমেন দাশগুপ্ত (উষাবাবু) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত (ভোলাবাবু) গোয়ালিয়রে থেকে সরোদ নেওয়াজ ওস্তাদ হাফেজালী খাঁর কাছে সরোদ শিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঢাকা-বলধা এস্টেটের জমিদার বাড়ি যখন ওস্তাদ হাফেজালী খাঁ নিয়মিত যাতায়ত করতেন তখন তিনি তাঁর আত্মীয় বলধার জমিদার শ্রীনরেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে থেকে ওস্তাদ হাফেজালী খাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নিকট থেকে সংগীত পাঠ গ্রহণ করেছেন। ওস্তাদ হাফেজালী খাঁ গোয়ালিয়র দরবারে দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এজন্যে, তিনি বলধায় স্থায়ীভাবে বাস করতে না পারায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ নব্বু খাঁকে বলধায় রেখে যান। নব্বু খাঁর কাছেও জিতেন্দ্র তালিম গ্রহণ করেছিলেন দীর্ঘকাল। অত্যন্ত যোগ্য সরোদীয়াতে পরিণত হয়েছিল শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত। কিন্তু, হঠাৎ একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে যায়।

নীহারবিন্দু চৌধুরী

নীহারবিন্দু চৌধুরী বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে অত্যন্ত কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সংগীতের তাত্ত্বিক চর্চার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তী জীবনে তিনি একজন প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত সংগীত তত্ত্বজ্ঞেতে পরিণত হয়ে ওঠেন। বহু সংগীত গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি কর্মসূত্রে জড়িত। কণ্ঠসংগীত সম্পর্কিত একটি পুস্তক রচনার জন্য সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত। শ্রীহেমেন দাশগুপ্ত (উষাবাবু) প্রথম জীবনে শ্রীজিতেন দাশগুপ্তর (ভোলাবাবু) কাছে সরোদ শিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে দীর্ঘকাল সুরেন্দ্রলাল দাস পরিচালিত যন্ত্রীসংঘের বৃন্দবাদনে অংশগ্রহণ করেছেন। যন্ত্রীসংঘের প্রয়োজনে ও সুরেন্দ্রলালের নির্দেশে তিনি মহানাটক বীণা (পোট্টুবাদ্যম) বাজাতে শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে সরোদ ত্যাগ করে এ যন্ত্রটিতেই তিনি পারদর্শী। তিনি গোয়ালিয়রে ভারত সরকারের লিটল ব্যালে গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বেহালাবাদক শ্রীফটিক সাহা ও শ্রীধরণী চৌধুরী যথাক্রমে মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও কুমিল্লার ওস্তাদ মহম্মদ হেসেন খাঁ (খস্রু)-র নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। এরা কুমিল্লার 'সুরলোক' সংগীত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বাজাতেন। শ্রীফটিক সাহা পরবর্তীকালে ঢাকা ও গৌহাটি বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হয়েছিলেন।

কুমিল্লার বাঁশের বাঁশি প্রাকবিভাগ বঙ্গে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। টিপেরা ফ্লুট নামে এ বাঁশি শ্যামের বাঁশি নামে কথিত আড়বাঁশি থেকে ভিন্ন। দুয়ের ফুৎকার পদ্ধতি ও বাদন পদ্ধতিতেও ভিন্ন। এ দুয়ের স্বরগুণ বা টোন্যাল কোয়ালিটিতেও দুয়ের বিভিন্নতা বেশ প্রকট। এই কারণেই এই বাঁশি 'ত্রিপুরা ফ্লুট' নামে পরিচিত হয়েছিল। তৎকালীন আধুনিক বাংলা গান ও ফিল্ম-সংগীতে এই বাঁশির ব্যবহার বেশ প্রচলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বেশ কজন বাঁশুরিয়া সম্পূর্ণভাবে ফিল্ম-সংগীতজগতে আত্মনিয়োগ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে সর্বশ্রীকুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ (চানুবাবু), মোহিত সিংহরায় (গগু), অজয় বর্ধন (টগু) খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংগীতের সেবা করেছেন। এছাড়া যাঁরা কেবল উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরেই অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী মনু রায়, সুধীন্দ্র চন্দ (ভোলাবাবু), ধীরেশ সেন ও চিত্ত চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাজা রায় ও শ্রীশৈলেশ সেন ভালো বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তাঁরা সেতারবাদনে আত্মনিয়োগ করে বাঁশি বাজানো ছেড়ে দেন।

শ্রীমনু রায় সর্বশ্রী ওয়ালীউল্লা খাঁ, শচীন্দ্র দত্ত প্রমুখ শিল্পীদের নিকট থেকে সুর তালিম গ্রহণ করে বাজিয়ে হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত গায়ক, সুরকার সংগীত পরিচালক কুমার শচীনদেব বর্মনের ভাগিনেয় কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ কলকাতায় তৎকালীন সঙ্গীতজগতে ত্রিপুরা বাঁশির প্রবক্তা হিসেবে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গ ও লঘু উভয় সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেহান্তরিত হয়েছেন। শ্রীসুধীন্দ্র চন্দ (ভোলাবাবু) পুববাংলার অনেক সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর পেশার বিভিন্নতা দরুন তিনি সংগীত চর্চা ছেড়ে দেন। শ্রীমোহিত সিংহরায় 'নিউ থিয়েটার্স' -এর যন্ত্রীসংঘে রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় বহু চলচ্চিত্রের নেপথ্য সংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে কলকাতা বেতার কেন্দ্রতেও অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রীঅজয় বর্ধন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে বাঁশুরিয়া হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রীচিত্ত চৌধুরী আকাশবাণী গৌহাটি ও শিলঙের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে বহুকাল সুনামের সংগে কাজ করেছেন। শ্রীধীরেশ সেন প্রাকবিভাগ বঙ্গের অনেক সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের ভ্রাতা শ্রীধীরেশ দত্তগুপ্ত অতি উত্তম বংশীবাদকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী (স্টাফ্ আর্টিস্ট) হয়ে দীর্ঘকাল বেতারের এবং চলচ্চিত্র কোম্পানির কাজ করেছেন। কুমিল্লা শহরে

Dhaka University Institutional Repository

যে কজন তালবাদ্য বিশেষ করে তবলার চর্চা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী উমেশ দাস, মণীন্দ্র সরকার, সুবোধচন্দ্র দাস(কেষ্টবাবু), ধীরেণ সেন ও সমরেন্দ্র সাহা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাকবিভাগ কলকাতায় বিশ-তিরিশের দশকে তবলীয়া শ্রীউমেশ দাস লখ্নৌ-এর খলিফা ওস্তাদ আবিদ হুসেন খাঁ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সুধীমহলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রীমণীন্দ্র সরকার রসিক-তবলীয়া হিসেবে কুমিল্লায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কুমিল্লার তবলীয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুনাম অর্জন করেছিলেন শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (কেষ্টবাবু)। কেষ্টবাবু হিসেবেই তিনি সাধারণ্যে খ্যাত হয়েছিলেন। কেষ্টবাবু তৎকালীন কলকাতার শ্রেষ্ঠ গায়কবাদকদের প্রায় অপরিহার্য তবলীয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ, সত্যেন ঘোষাল, কুমার শচীনদেব বর্মন প্রমুখ গায়করা এবং মুস্তাক আলী খাঁ, রাধিকামোহন মৈত্র এবং শ্যাম গাঙ্গুলী প্রমুখ যন্ত্রসংগীতজ্ঞরা সবাই কেষ্টবাবুকেই প্রথম সংগতীয়া হিসেবে চাইতেন। সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব তাঁকে দুটি চলচ্চিত্র কোম্পানির সংগীত বিভাগে সারাক্ষণের স্থায়ী শিল্পী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবিভাগের তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি চিকিৎসার্থে কলকাতায় আসেন এবং এখানেই দেহত্যাগ করেন। সর্বশ্রী ধীরেন সেন ও সমরেন্দ্র সাহা সুবোধবাবুর (কেষ্টবাবু) কাছে তবলা শিক্ষা করে অত্যন্ত যোগ্য তবলীয়াতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু,

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবিভাগের পর জীবিকার্জনের প্রয়োজনে অন্য কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হওয়ার দরুন তাঁদের তালবাদ্যচর্চা খানিকটা ব্যহত হয়েছিল। শ্রীঅমিয় চৌধুরী (চিনুবাবু) তবলীয়া হিসেবে বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। সংগীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তিনি কুমিল্লায় রতনপুর এস্টেটের জমিদার নবাব স্যার কে জি এম ফারুকী সাহেবের কুমিল্লাস্থ ফারুকী হাউসে এক গুরুত্বপূর্ণ আসরে তবলা বাজিয়ে সকলের প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। স্বয়ং আলাউদ্দিন খাঁ অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকে ভালো বাজানোর জন্য আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

ভবানী প্রসাদ

কুমিল্লার কুশারী ভ্রাতৃদ্বয় ভবানী প্রসাদ ও রামপ্রসাদ ভালো তবলা বাজাতে পারতেন। তাঁদের এ বিষয়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রখ্যাত তবলীয়া শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (কেষ্টবাবু)। রামপুর দরবারের খলিফা ওস্তাদ মসীৎ খাঁর প্রিয় শিষ্য সুবোধবাবু ওরফে কেষ্টবাবুর কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভাবানীপ্রসাদ সুরকার হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার তাগিদে তালবাদ্যের চর্চা কমিয়ে দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সুরারোপিত কিছু বাংলা রাগাশ্রয়ী গান সাধারণ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ (ভক্তবাবু) অনেক নামীদামি শিল্পীর সঙ্গে তবলাসংগত করে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

কুমিল্লা শহরে সৃষ্টিশীল এবং সৃষ্টিধর্মী সংগীতচর্চার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সর্বশ্রী অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরাকায়স্থ, সঞ্জয়

Dhaka University Institutional Repository

ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুধীর সেন, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঅমল দত্ত, অধ্যাপক কাজীমোতাহার হোসেন, অধ্যাপক মজলুল করিম, অধ্যাপক অশোক গুহ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের কর্মকৃতির সঙ্গে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সুরকারদের সংযোগ সাধিত হওয়ায় শচীন দেববর্মনের মতো প্রভাবশালী গায়কদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই মণিকাঞ্চনযোগ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং নবদিগন্তের সূচনা। হিন্দি গীতিকাব্যের বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীত ক্ষেত্রের সাহিত্যদৈন্য শিক্ষিত বঙ্গ সন্তান মাত্রেরই মনে উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে খানিকটা অনীহার সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল এ অনীহা অনেকটা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরোক্ত কবি-সাহিত্যিগণের রচিত গান, রাগাশ্রয়ী বাংলা গান এবং গজলভাঙা বাংলা গানের প্রতিও বাঙালি শ্রোতার মন আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্বশ্রী পরিমল চৌধুরী ও শ্রীসত্যগোপাল দেব ওইসব গান গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীপরিমল চৌধুরী নিজে অত্যন্ত যোগ্য সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ভারতীয় বেতার বিভাগের সঙ্গে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত থাকার দরুন ততটা নিজের সংগীত পরিবেশনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। দিল্লির ওস্তাদ নাসির হুসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বেশ যোগ্য খেয়ালীয়া ও ঠুম্রি গায়কে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু, উপরোক্ত কারণে সাধারণ্যে তিনি অতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় বেতার সংস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সংগীতের সেবা করেছেন। বেতারে কোনো নতুন শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত হতে যে কষ্ট ও মেহনত করতে হয় তা সর্বজনবিদিত। শ্রীপরিমল চৌধুরী মেধাবী ও প্রতিভাবান শিল্পীদের নানাভাবে সাহায্য করে শিল্পীমহলে একেবারে দেবতুল্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমানকালের অনেক শিল্পীই তাঁর উপকার মুক্তকণ্ঠে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। বেতার কেন্দ্রে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে তিনি এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্র অধিকর্তা হিসেবে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

শ্রীসত্যগোপাল দেব ঢাকা বেতার কেন্দ্র ও দেশবিভাগ পরবর্তীকালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে বহুদিন সংগীত পরিবেশন করেছেন। অসুস্থতার জন্য তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

শ্রীদেবব্রত দত্ত সংগীতাচার্য শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীর (কুমিল্লা) কাছ থেকে খেয়াল ও ঠুম্‌রির তালিম গ্রহণ করে উচ্চপর্যায়ের শিল্পীসত্তার অধিকারী হয়েছেন। তিনি বহুকাল কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর সংগীত পরিবেশন করেছেন। তিনি বর্তমানে সংগীতের উপপত্তিক চর্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন। এর ফলশ্রুতি হল তাঁর প্রণীত সংগীততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বেশ কয়েকটি পুস্তকের রচনা। তাঁর প্রণীত সবকটি পুস্তকই সাধারণ্যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। তাঁর স্থাপিত 'ব্রতী প্রকাশনী' কেবল

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত গ্রন্থই প্রকাশ করে থাকে। তাঁর সংগীত সম্বন্ধীয় নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা সংগীতজগতে আদৃত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে।

কুমিল্লার সংগীতচর্চার বিষয় প্রাকবিভাগ ভারতের সর্বত্র আলোচিত হত। উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল গীতির কুমিল্লায় ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। কুমিল্লার রবীন্দ্রসংগীতের প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীপরিমল দত্ত। পরহিতব্রতী, দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মহান ব্যক্তিটি প্রথম জীবনেই গান্ধীজির আহ্বানে নিজের অতি উজ্জ্বল ভবিষৎকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশমুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত 'অভয় আশ্রম'-এর-কর্মী, সদস্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অভয় আশ্রমের আদর্শ ও দৈনান্দিন জীবনচর্চাতে ইংরেজদের বলপূর্বক তাড়ানোর নীতি ছিল না। তার বদলে ছিল নিজ ঘুমিয়ে থাকা দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং শিক্ষামাধ্যমে সব কুসংস্কার দূর করা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন করা এবং এদেশবাসীকে এক সৎ ও স্বদেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা। তাঁর হাতিয়ার ছিল নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীত। দেশবিভাগের পরও তিনি কুমিল্লা শহরে থেকে রবীন্দ্র-নজরুলের মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকায় একটি পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কুমিল্লার যেকজন সুরকার উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রায় সব রূপরীতি আয়ত্ত করে সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছিলেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে নতুন সুর রচনার দিকে সমস্ত শক্তি নিয়মিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত, কুমার শচীনদেব বর্মন, শ্রীজ্ঞান দত্ত ও শ্রীশৈলেশ দাসগুপ্ত। নতুন সুর সৃষ্টির ধারকবাহক হয়েই বোধহয় সুরকার শ্রীশৈলেশ দাসগুপ্ত বাংলার সংগীত সভায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর রচিত সুরে প্রখ্যাত গায়ক সুধীরলাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত হয়ে কিছু রেকর্ড বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়েছে। তাঁর সুরারোপিত কিছু চলচ্চিত্রও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে সাধারণ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা আরো দৃঢ়তর করে দিয়েছিল। তাঁকে কুমিল্লার নতুন সুরকার-সুরসৃষ্টি কর্তাদের একজন প্রকৃষ্ট উত্তরসূরি বলে ধরা যায়।

শ্রীশৈলেশ দাসগুপ্ত সুরসাগরের অসুসরণকারী সুরকার হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তিনি সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব, ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ প্রমুখ কলাকারদের কাছে বিশেষ করে খেয়াল ও ঠুম্‌রির চর্চা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের ওপর একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এই প্রভাবই বোধহয় তাঁর সুরকার জীবনের গতি নির্দেশ করে দিয়েছিল। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে তাঁর সুরে গাওয়া বাংলা গান প্রাকবিভাগ বঙ্গের সর্বত্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

সুরসাগর হিমাংশুকুমার কুমিল্লার সংগীতাচার্য শ্যামাচরণ দত্ত ও ওস্তাদ মহম্মদ হুসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুম্‌রি ইত্যাদি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিভিন্ন রূপরীতি ভালোরকমই আয়ত্ত করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

লঘুসংগীতের অর্থাৎ চৈতী, কাজরি, ভজন, বাউল, ও ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীতেরও সর্বোপরি ছিল তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় এসে রেকর্ড, রেডিও ও ফিল্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধারণ্যে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত বলে পরিচিত এবং বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।। তাঁর সুরারোপ সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ আচার্যদেরও প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে। ফুসফুসের ব্যাধির জন্য তাঁকে গান ছেড়ে দিতে হলেও তিনি সুর সৃষ্টির জগতে সমসাময়িক কালে অদ্বিতীয় বলে পরিগণিত হয়ে ওঠেন। উপরোক্ত কালব্যাধিতে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্টিশীল সংগীতজগতের এক অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

সুরসাগরের সুররচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব ও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কেননা, পাশ্চাত্য সংগীতের ভিত্তিভূমির সঙ্গে তিনি ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া পাশ্চত্য স্বরলিপি পদ্ধতি তাঁর খুব ভালোরকম দখলে ছিল। সুরসাগর ব্যক্তিগতভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা করতেন, তিনি কয়েকটি রাগও রচনা করেছিলেন তাঁর এই রাগসমূহ রচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ বিদগ্ধ সংগীতাচার্যরাও উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "শ্রীমান হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের রচনায় ভারতীয় রাগরাগিণীর যে গুণাগুণ, ধর্ম, লক্ষণ ও নিয়ামাবলী থাকা প্রয়োজন তার সবই আছে। একে অনায়াসে এক নতুন রাগের সংযোগ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সঠিক আরোহণ, অবরোহণ থেকে সব নিয়মাবলীই ঠিক আছে।" তাঁর সৃষ্ট রাগ 'রাগপুষ্প চন্দ্রিকা'

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল। অন্য রাগটি রাগ 'চামেলী কল্যাণ' তিনি প্রকাশ করেননি। একবার মাত্র সে রাগটি তাঁরই কণ্ঠে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর ছোট ভাই টুনুদা তবলা বাজিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে টুনুদা অত্যন্ত যোগ্য তবলীয়াতে পূর্বেই পরিণত হয়েছিলেন। আমরা কুমিল্লার ছেলেরা তাঁকে হিমুদা বলেই ডাকতাম যদিও সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমাদের কাকা।

কুমিল্লাতে সুরসাগরের সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের 'রূপম নাট্যসংঘ' নামে একটি সংঘঠন বা ক্লাব ছিল যাকে একটি সংস্কৃতির দুর্গ বলা যায়। সেই 'রূপম' থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী বেরিয়ে এসে কুমিল্লার সংস্কৃতিকে এক অনন্য সাধারণ রূপ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই দেশের মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একে অনায়াসেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চা চক্র বা ফরাসি দেশের ওয়ে সাইড ট্যাভর্ন-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চায়ের দোকানে বসে প্রচুর চা সহযোগে যা গুরুগম্ভীর আলোচনা এদের মধ্যে হত অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করত। এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন কবি অজয় ভট্টাচার্য কবি-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য-যিনি পরবর্তীকালে কলকাতায় হাতে ধরে বহু খ্যাতনামা লেখক, সংবাদপত্রসেবী ও কবিকে তৈরি করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রস্নেহধন্য অধ্যাপক শ্রীসুধীর সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅজিত গুহ, প্রখ্যাত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যিক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী-যিনি পদ্মাপাড়ের পরশুরাম বলে খ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালক-অভিনেতা শ্রীসুশীল মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঅমল দত্ত, অর্থনীতিবিদ শ্রীসুধীর সেন-যিনি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের উপদেষ্টা পদে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন-সবাই এই 'রূপম নাট্যসংঘ' থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন। এমনিই রূপম নাট্যসংঘকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলেন অভিনেতা শ্রীশৈলেন চৌধুরী, সুরকার হিমাংশু দত্ত-সুরসাগর, গায়ক ও সংগীত পরিচালক শ্রীজ্ঞান দত্ত, সুরকার-সংগীত পরিচালক শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত, গায়ক-সংগীত পরিচালক কুমার শচীনদেব বর্মন, মহৎ সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মহম্মদ হুসেন খাঁ (খস্রু) প্রমুখ সংস্কৃতি কর্মীরা। এই প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হল কুমিল্লার উন্নত পর্যায়ের সংস্কৃতিচর্চা। 'রূপম নাট্যসংঘ'-এর কোনো নিজস্ব অফিস ঘর ছিল না। একটি চায়ের দোকানের পাশে খোলা জায়গায় বসে চা সহযোগে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুগম্ভীর ও গঠনমূলক এমন আলোচনা হত যার নজির পাওয়া দুস্কর। একে প্যারিস শহরে মধ্যযুগে ফরাসি দেশের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর ঔপন্যাসিকদের আড্ডা ও আলোচনাস্থল ওয়েসাইড কাফের সঙ্গে তুলনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথও বোধহয় এ উদ্দেশ্যেই চা-চক্রের সৃষ্টি করেছিলেন। এরকম আড্ডা ছাড়া বোধহয় কোনো দেশেই সংস্কৃতির প্রসার হয়নি।

সুরসাগর হিমাংশুকুমারের চিরসুহৃদ-সখা কুমার শচীনদেব বর্মনকেও তাঁর উত্তরসূরি বলে ধরা যায়। কুমার শচীনদেব ত্রিপুরার রাজবংশীয় ব্যক্তি হলেও তিনি কুমিল্লা নিবাসী এবং শিক্ষা, দীক্ষা,

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম, সাধনা সবই কুমিল্লা থেকে। তাঁকে কুমিল্লাবাসীরা কুমিল্লার বলে দাবি করেন ও কুমিল্লার বলে গর্ববোধ করেন। তিনিও সংগীতাচার্য শ্যামচরণ দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও পরবর্তীকালে সংগীতাচার্য ভীষ্মদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উচ্চপর্যায়ের সংগীতজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে বোম্বাই শহরে এসে চলচ্চিত্র জগতে সুরারোপের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব নজির রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্র সংগীতের প্রয়োজনে তাঁর উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ছেদ পড়ে গেলেও তিনি সর্বদা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ও তাঁদের কাছ থেকে চিজ গ্রহণ করে তাঁর সংগীতের জ্ঞানভান্ডার বাড়াতেন। বহু চলচ্চিত্রে তিনি অতি কৃতিত্বের সঙ্গে সুরারোপ ও পরিচালনা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীরাহুল দেববর্মন বর্তমান চলচ্চিত্র সংগীতজগতে একটি নাম। তিনি পিতৃদেবের ঐতিহ্য অতি সাফল্যের সঙ্গে বহন করে চলেছেন। শ্রীজ্ঞান দত্ত অনেক পূর্বেই বোম্বাইতে এসে প্রতিষ্ঠিত হন। চলচ্চিত্র জগতে তিনি দত্তসাহেব বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আচার্য শ্যামাচরণের কাছ থেকে তিনি ধ্রুপদের পাঠ ও ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন (খস্রু)-র কাছ থেকে খেয়াল ও ঠুম্‌রির পাঠ গ্রহণ করে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তিনি বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গজল গানে বেশি মনোনিবেশ করে খুব সুনাম অর্জন করেন। কবি নজরুল রচিত ও সুরারোপিত কয়েকটি বাংলা গজল গ্রামোফোন রেকর্ড-মাধ্যমে প্রকাশ করে তিনি অতি খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বোম্বের সেভেন আর্টস সেন্টারের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুলু দত্ত সেভেন আর্টস সেন্টারের

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্য বিভাগের শিক্ষক-পরিচালক ছিলেন। এঁদের একটি শাখা কলম্বোতে স্থাপিত হয়েছিল।

কুমিল্লার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কুমিল্লা শহরে সংস্কৃতিবান পুরুষ এবং শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ছিল। তাঁর গৃহে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে সংগীতেরও চর্চা হত। তাঁর পুত্রদের তিনি এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতেন। পুত্ররা সবাই পরবর্তী জীবনে খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের পারিবারিক চর্চা অক্ষুণ্ন এবং অব্যাহত ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় রেণু ও বেণু বসু সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর খ্যাতনাম শিষ্য শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে খেয়াল ও ঠুম্‌রির চর্চা করে বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। তাঁরা জুড়িতে গান গাইতেন এবং তাঁদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান বেশ উচ্চাঙ্গের ছিল। তাঁরা কলকাতায় ও পূববাংলার নানা স্থানে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কলকাতায় তাঁদের বিপিন পাল রোডস্থ বাসভবনে প্রতি রবিবার সকাল থেকে একটা দুটো অবধি সংগীতের আসর চলত। দীর্ঘদিন এ চর্চা অব্যাহত ছিল তাঁদের নিজেদের গান তো হতই, তার সঙ্গে বহু গাইয়ে বাজিয়ে সেখানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেছেন। বেণু বসু সামান্য রোগ ভোগের পর হঠাৎ করে মারা যান। তার জন্যেই হয়তো রেণুবাবু কণ্ঠসংগীত জনসমক্ষে পরিবেশন করা ছেড়ে দেন। কিন্তু, জনসমক্ষে না গাইলেও তাঁর ব্যক্তিগত চর্চা ও উৎসাহ অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সংগীত মম্মেলন ও মেহ্ফিলে তাঁর উপস্থিতি লক্ষণীয়।

কুমিল্লার তৎকালীন সংগীতচর্চাকারীদের মধ্যে দুই বন্ধুর সংগীতচর্চা একটি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবি রাখে। এঁরা হলেন মদীয় মধ্যমভ্রাতা শ্রীদিলীপ সিংহরায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু শ্রীসত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য-আমাদের অনেকেরই সত্যদা। দিলীপকুমার ছিলেন কিন্নর কণ্ঠ। তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল ঈশ্বদত্ত-সহজাত। কণ্ঠস্বরের অপূর্ব মাধুর্য নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। পাশ্চাত্যের কণ্ঠস্বর বিভাগের নিয়মানুসারে তাঁকে একজন অতি সুন্দর ব্যারিটোন স্বরের অধিকারী বলে ধরা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন ভারী তেমনিই সুরেলা ও মিষ্ট ছিল। কবি নজরুলের তিনি স্বাভাবিকভাবেই এসে গিয়েছিলেন। কুমিল্লার সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে তখনকার চালু পাঁচটি রেকর্ডিং কোম্পানির মধ্যে পাঁচটিতেই সুরকার হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন কুমিল্লার পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্পী। কোম্পনিগুলির নাম ছিল হিজ মাস্টারস ভয়েস, হিন্দুস্থান, কলম্বিয়া, মেগাফোন ও সেনোলা। আরেকটি কোম্পনি 'টুইন' ছিল হিজ মাস্টারস ভয়েস কোম্পানিরই পার্শ্বচর প্রতিষ্ঠান। এতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যথাক্রমে হিমাংশু দত্ত, শচীনদেব বর্মন, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, জ্ঞান দত্ত ও হরিপদ রায়। কবি-সুরকার নজরুল ইসলাম এই পাঁচটি কোম্পানিরই মধ্যমণি হিসেবে বিরাজ করতেন। নজরুল দিলীপকুমারের কণ্ঠে 'সেনোলা' কোম্পানিতে দুটি রেকর্ড করেছিলেন। গানগুলি সাধারণ্যে বেশ আদরণীয় হয়েছিল। এছাড়া দিলীপকুমার বেতারে গান গেয়েও

Dhaka University Institutional Repository

বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সংগীতাচার্য ডাঃ যমিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বেশ কৃতবিদ্য হয়ে স্বদেশ কুমিল্লাতেই সংগীতসাধনা ও শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন। দেশবিভাগের কিছুদিন পর তিনি কিছুদিন 'আগরতলা" থেকে বাংলাদেশ হবার পর পুনরায় কুমিল্লা চলে যান। কুমিল্লা ও ঢাকায় বেশ কজন সংগীতশিক্ষার্থী তাঁর শিক্ষাধীনে গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি কুমিল্লাতেই তিনি পরলোক গমন করেছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য-যাঁকে আমরা সবাই সত্যদা বলেই ডাকতাম-তাঁর সাংগীতিক চেতনা ও সংগীতপ্রেম অত্যন্ত উচুঁদরের ছিল। তিনি শিক্ষাজীবনে অতি মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচুর কর্ম করেছেন। দলের অতিপ্রয়োজনীয় সংযোগ রক্ষাকারীর কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যেভাবে তৎকালীন টিকটিকি পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে Gun running I Despatch Rider-এর কাজও করেছেন তার কাহিনী বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় এসে রেলওয়েতে উচ্চপদে চাকুরি করে সম্প্রতি কিছুকাল হল অবসর গ্রহণ করেছেন। অতসব করলেও সংগীতই ছিল তাঁর ফার্স্ট লাভ বা প্রথম প্রেম। ৫৩নং শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি রোড (হাজরা মোড়)-এ অবস্থিত তাঁর ফ্লাটবাড়িটি ছিল কুমিল্লার ছেলেদের একটি ঘাঁটিস্বরূপ। সেখানে নানা ধরণের নানা পেশার লোক আসতেন। সত্যরঞ্জন তখন প্রখ্যাত তবলীয়া সুবোধ দাস (কেষ্টবাবু)-এর কাছে তবলার পাঠগ্রহণ করছেন। অল্পদিনের মধ্যেই মেধাবী

Dhaka University Institutional Repository

সত্যরঞ্জন ভালো সংগতীয়া হয়ে উঠে অনেক নামী শিল্পীর সঙ্গে সংগত করে বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরাও অনেক কুমিল্লার হবু সংগীতজ্ঞ এবং সংগীতমন্য ছেলেরা সত্যদার ওখানে প্রায়ই সন্ধ্যেয় হাজির হতাম। কারণ ওটা আমাদের একটা রেয়াজের স্কুল হয়ে গিয়েছিল। তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরা ও একটি প্রামাণ্য সেতার সেখানে রাখা ছিল। সময়ের কোন মাপামাপি ছিল না। সকালের দিকে হলে সত্যদার রন্ধনশালতেই সকলের দ্বিপ্রাহরিক আহারের বন্দোবস্ত হয়ে যেত। কজন সেকথা শুধু বলে দিলেই সত্যদার কাজের লোক সব বন্দোবস্ত করে ফেলত। বড়ই আনন্দের দিনগুলি ছিল তখন। ইতিমধ্যে সত্যদা তবলার সঙ্গে কণ্ঠসংগীত (খেয়াল ও ঠুম্‌রি) এবং যন্ত্রসংগীতেরও (সেতার) চর্চা শুরু করেছিলেন। আমাদের তাতে প্রচুর সুবিধে হত কারণ সত্যদার তানপুরা এবং সেতার দুই-ই আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। সত্যদার ওখানে নানা ধরণের লোকেদের আনাগোনার দরুন রাজনীতি থেকে সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা ও সংগীত ইত্যাদির আলোচনা হত। এর সঙ্গে প্রচুর নোনতা খাবারের আনাগোনা হত নিকটবর্তী খাবারের দোকানগুলি থেকে। বলা বহুল্য সত্যদা সবই আনন্দের সঙ্গে বহন করতেন। এভাবে তাঁর হাজরা মোড়ের বাড়ি একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সত্যদার বিবাহোত্তর কালে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার কর্মকৃতি অনেকাংশে কমে গিয়ে থাকলেও তাঁর সুযোগ্য পত্নী তাঁর আতিথেয়তায় সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। সত্যদার লেখার হাতটি ছিল চমৎকার। ইংরেজি সাহিত্যে ছাত্র সত্যদা

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার বাংলাও লিখতে পারতেন। এখনো এই পরিণত বয়সেও তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য প্রচুর লেখেন। দিলীপকুমার কলকাতায় এলে দিনের বেশিরভাগ সময়ই এখানে কাটাতেন। দুজনের একত্রে সংগীতচর্চা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কুমিল্লায় 'রূপম নাট্যসংঘ'-এর পূর্বসুরি ছিল অন্য আরেকটি নাট্যসংস্থা-নাম ছিল 'দ্য ভারনেল থিয়েটার'। যাকে কেন্দ্র করে কিছু মঞ্চ অভিনেতা, পরিচালক-প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক গড়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে সর্বশ্রী জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, রসময় চৌধুরী, জিতেন্দ্র নাহা, সুরেশ দেব, রহুল আমিন, মাখনলাল চৌধুরী, কালু গুপ্ত, সুশীল মজুমদার, অধ্যাপক সুধীর সেন, নরেশ দত্তগুপ্ত, অসিত চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। 'রূপম নাট্যসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় কবি অজয় ভট্টাচার্য ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখের উদ্যোগে। তাঁদের সহযোগী হিসেবে অধ্যাপক অমিত গুহ, সুনির্মল পুরকায়স্থ, কবি সুবোধ পুরকায়স্থ, অজিত চৌধুরী, জিতেন্দ্রজিৎ বর্ধন (দাগুবাবু), কালু চক্রবর্তী, রণেন্দ্র বিনোদ চক্রবর্তী (ভোলাবাবু) প্রমুখের নাম উল্লেযোগ্য।

কুমিল্লার সংস্কৃতিচর্চার গভীরতার কথা একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হবে যে কুমিল্লার সংস্কৃতিচর্চা কতটা উর্ধ্বগামী হয়েছিল এবং তৎসহ রবীন্দ্রচর্চাও কোন স্তরে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও সুরের রাজকীয়তা কিভাবে সাধারণ লোকেদেরও আকৃষ্ট করেছিল তা নীচের ঘটনাটি থেকে বোঝা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের মনে আছে যে-একদিন তিনি একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রে কুমিল্লার রাজপথ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। একই রাস্তায় একই রাত্তিরে তিনটি বাড়ির ছাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ চাঁদের মায়ায়, মোর ভাবনারে, আমার পথ ভোলে, যেন সিন্ধুপারের পাখি, গানটির সুর ভেসে আসছিল। গ্রীষ্মের রাত্রে খোলা ছাদের ওপর থেকে ভেসে আসা সেই গান যেন স্বপ্নলোকে নিয়ে গেল। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে কুমিল্লা কলেজের একজন অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ির উঠোনে বসে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞ পরিমল দত্ত গান গাইছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাধনার ফল সাধারণ লোকদের মধ্যেও কেমন প্রতিফলিত হয়েছিল তার এটি একটি প্রমাণ। সংস্কৃতির এমন সার্বিক চর্চা আর কোনো মফস্বল শহরে ছিল বলে জানা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা

অবিভক্ত বঙ্গদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবর্তন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপূর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সে তুলনায় পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবর্তন ও প্রচার কাহিনী খানিকটা তমসাচছন্ন। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য স্থানেও বহুপূর্ব থেকেই রাগ রাগিনীর প্রচলন ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দিল্লী থেকে সেনিয়া কলাবন্ত বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গী পীরবক্স কয়েক বছর অধিষ্ঠান করেন। সেই সময় থেকেই পূর্ব বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিকাশ ও তার নানা বিধানের প্রচার শুরু হয়। ঐ ঘটনার পর আজ প্রায় দুইশত বছর অতিক্রান্ত।

সেই ধারায় বর্ধিত শিক্ষিত হয়ে বিষ্ণুপুরবাসী কয়েকজন সঙ্গীতগুনী ক্রমে কোলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গেও নানা রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি জনপ্রিয় করে তোলেন। মুঘল আমলের শেষ পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাবদের বিলাস ও সৌখিনাতার সংগে সঙ্গীতের যোগাযোগ হয়েছিল। তারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব একটা ভক্ত ছিলেন না। লঘু সঙ্গীত অর্থাৎ গীত-গজলের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই তাদের নাম বেশী ছিল। তাঁরা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর কিছু বাইজী এবং তাদের সঙ্গীত গুরু সারেঙ্গীয়া সারেঙ্গীয়াদের অনুসারী কিছু তবলিয়াদের ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে কিছু প্রতিপালন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পর মুঘল তক্তাউস অধিকারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ সুজা পূর্ববেঙ্গর ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মধ্যদিয়ে পালিয়ে গিয়ে আরাকানে অবস্থান করেন।

পূর্ববাংলার শহর কুমিল্লা সঙ্গীতের একটি পীঠস্থান হিসেবে দীর্ঘকাল থেকে পরিচিত। তথাকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সূত্রপাত সাহসুজার পারিষদ পূর্বলিখিত সেই সেনিয়া কলাবন্তের দ্বারাই হয়েছিল। শাহ সুজা ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুকাল কুমিল্লায় অধিষ্ঠান করেন। এবং পরে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে আরাকানে চলে যান। এ বন্ধুত্বের স্মৃতি রক্ষার্থে গোবিন্দ মানিক্য কুমিল্লা শহরের একপাশে গোমতী নদীর তীরে একটি অতি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। সেই ইতিহাস বিখ্যাত মসজিদ 'সুজা মসজিদ' নামে এখনও বিদ্যমান।

রুদ্রবীনা বা রবাব্ বাদক কাশেম আলী খাঁ

রুদ্রবীনা বা রবাব বাদক কাশেম আলী খাঁ এর মত গুনী তৎকালীন ভারতবর্ষে ছিল না বলে অত্যুক্তি হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আমন্ত্রনে তিনি ত্রিপুরা দরবারে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ বীর চন্দ্রকে বিক্রমাদিত্য এবং মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাঁর গুণগ্রহীতার জন্য। আকবরের মত তিনি নিজ দরবারে একটি নবরত্ন সভা স্থাপন করেছিলেন। দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী গুনী লোকদের নিজ দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ ত্রিপুরা দরবারে অধিষ্ঠিত হবার পরে সেখানে রঙ্গনাথ যদুভট্ট যোগদান

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর মত গায়ক এতদ্দেশে ছিল না। রঙ্গনাথ উপাধি মহারাজ বীর চন্দ্রেরই দান। যদু ভট্টের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি যদু ভট্টকে রঙ্গনাথ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ঐ সময় কাশেম আলী খাঁ প্রায়ই ভাওয়াল থেকে ঢাকায় যেতেন। তাঁর সহযোগী ও শিষ্য সরোদিয়া ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ ও সঙ্গতীয়া তবলিয়া ওস্তাদ আতা হোসেন খাঁকে তিনি জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ওস্তাদ প্রসন্ন বনিক (তবলা বাদক)

ঢাকার তবলা বাদকদের মধ্যে প্রসন্ন বনিক চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। জয়দেবপুরে রাজার অনুগ্রহে তিনি তবলিয়া আতা হোসেন খাঁর সমগ্র বিদ্যা অধিগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মত দ্রুত অথচ মধুর তবলা বাদন তৎকালে অতি বিরল ছিল। তিনি কিছুকাল কোলকাতার অভিজাত ও বিখ্যাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'ভারতীয় সমাজে' তালবাদ্য বিভাগের প্রধানরূপে ব্রতী হয়ে কিছু ছাত্রকে তবলা শিক্ষাদান করেছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে অতি গুরুত্বপূর্ন বিভাগ তালাধ্যায় বিষয়ে তিনি একটি প্রামান্য গ্রন্থ দুটি খন্ডে রচনা করে গবেষক-শিক্ষার্থী উত্তর পুরুষদের দান করে গিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম 'তবলা তরঙ্গিনী'। তার অপর গ্রন্থ 'পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ প্রবেশিখা'। এখনও তার তালাধ্যায়ের উচ্চতর শিক্ষার্থী ও গুনীদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এ গ্রন্থটির প্রকাশনার পূর্নব্যয়ভার তার সুযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্য ঢাকার মুড়াপাড়ার জমিদার রায়বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বহন করেছিলেন। প্রসন্ন বনিকের ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীকালে উত্তম তবলা বাদক হিসেবে সুনাম অর্জণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আসাম- গৌরীপুরের মহারাজা- প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা- প্রভাত কুমার বড়ুয়া। ময়মনসিংহ-গোপালপুরের জমিদার মহেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ঢাকা- মুড়াপাড়ার জমিদার কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঢাকা- কাশিমপুরের জমিদার সারোদা প্রসাদ রায় চৌধুরী, অক্ষয় কুমার কর্মকার ও প্রান বল্লভ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভগবান দাস (সেতার)

উপরোক্ত সঙ্গীত বিদ্যান ও কলাকার সমাগমের ফলে, তাঁদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ঢাকার বিখ্যাত সেতারিয়া ভগবান দাসের জীবন গঠিত হয়। তিনি উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদাঙ্গ আলাপ শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করলেও সেতারের সর্বচিত্র, লয়কারি ও বোলের বাহারে এক অদ্বিতীয় সেতারিয়া রূপে সর্বত্র সমাদৃত হন। গৎ-এর বিন্যাসে তিনি যেভাবে লয়কারী ও বোলের ব্যবহার করতেন তার তুলনা পূর্ব ভারতে ছিল না। তিনি জয়দেবপুর ও রুপলাল দাসের দরবারে থাকালীন বিশেষ চর্চার দ্বারা রবাবীয়া কাশেম আলী খাঁর কিছু তালিম সংগ্রহ ও আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবান দাসের সঙ্গে তার অনুজ শ্যামচাঁদ ও অন্ধ ভাগিনীয় যদুনাথ দাসের সেতার শিক্ষালাভ হয়েছিল। তাঁরাও বেশ সুনাম অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তবে এদের মধ্যে ভগবান দাসই সর্মধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকায় পূর্বলিখিত সঙ্গীত গুনীদের উপস্থিতির দরুন ধ্রুপদ, ধামারের প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে ধ্রুপদ- ধামার, রাজা- জমিদারদের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারনকে আকৃষ্ট করেছিল। তথাপি বলা যায় যে সে- চর্চার ব্যাপকতা তেমন ছিল না। ঢাকার কিছু সঙ্গীত শিল্পী রঙ্গ নাথ ভট্ট ও বিষ্ণুপুরের অন্যান্য গুনীদের কাছে শিক্ষা গ্রহন করে ধ্রুপদের সমাদর বৃদ্ধি করেছিলেন।

ওস্তাদ হরি কর্মকার (ধ্রুপদীয়া)

ঢাকার নবাবপুরে ধ্রুপদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হরি কর্মকার। তিনি সাধারন্যে হরি ওস্তাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হরি ওস্তাদের সমসাময়িককালে ঢাকার মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়ীতে সঙ্গীতজ্ঞ-সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ধ্রুপদিয়া এমদাদ হোসেন খাঁ। তাকে সেনীয়া প্রশিষ্য বংশীয় বলে ধরা হত। তিনি প্রধানত ধ্রুপদিয়া হলেও খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই গাইতে পারতেন। তাঁর কন্ঠস্বর বহু শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছিল।

ঢাকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ করে ধ্রুপদ ও ধামার সাধারণভাবে ছিল বিষ্ণুপুর কেন্দ্রিক। অর্থাৎ ঢাকার কিছু গায়ক বিষ্ণুপুরে শিখে এসে ঢাকায় প্রচলন করেন। এদেও মধ্যে কিছু

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার বাইরের লোকও ছিলেন। এঁদের কর্মকৃতিত্বে ঢাকায় বেশ কয়েকটি উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তখনকার দিনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদকেই সঙ্গীতের উচ্চতর রূপরীতি বলে ধরা হত। ঠুমরীর তো কথাই নেই, এমনকি খেয়াল রুপরীতিও ধ্রুপদের চেয়ে নিম্নতর রূপরীতি বলে পরিগনিত ছিল। সেনিয়া খেলাবন্তরা খেয়াল গান ও ঠুমরি শিখাতেন বটে কিন্তু নিজেরা গাইতে চাইতেন না। 'ওহ্ বাইজি ঔর-তয়াইফ লোগোকী কাম হ্যায়' বলে খেয়াল ও ঠুমরীকে অন্তজ শিল্প প্রমানিত করতে চাইতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ধ্রুপদিয়াদের এই গোড়ামীকে পরাস্ত করে খেয়াল ও ঠুমরী ও অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইমদাদ হোসেন খাঁকে অনেকে হরি ওস্তাদের শিষ্য বলে মনে করে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে হরি ওস্তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট ও বন্ধুতা ও যোগাযোগই এর মূল কারণ।

হরি ওস্তাদের শিষ্য পরম্পরা ঢাকার বসাক পরিবারে কয়েকজন বেশ ভাল ধ্রুপদ আয়ত্ব করেছিলেন। এদের মধ্যে মহেন্দ্র বসাকদ্বয়ের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পর্কে এঁরা ছিলেন মামা ও ভাগ্নে। দু'জনের নাম ছিল মহেন্দ্র। তাই শ্রোতাদের সুবিধার্তে হাজী মহেন্দ্র ও পাজি মহেন্দ্র নামে দ'জনকেই ভূষিত করা হয়। হাজী মহেন্দ্র গাইতেন ধীরস্থিরভাবে আর দ্বিতীয়জন পাখোয়াজী উপেন্দ্র বসাকের সঙ্গে লয়ের মারপ্যাচ করতেন বলে তিনি পাজি মহেন্দ্র নামে ভূষিত হয়েছিলেন। হাজী মহেন্দ্র ভাল তবলাও বাজাতে পারতেন। এই ধ্রুপদ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে যারা বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় ধ্রুপদের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রী মেঘনাধ বসাক রাধারামন বসাক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধারামন খেয়াল গানও করতেন।

ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন

মহম্মদ হোসেনের কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। তিনি ওস্তাদ তসদুখ হোসেন খাঁ এর কাছে তলিম নেন। কিন্তু নানা প্রতিকুলতার অবস্থার দরুন তিনি সাময়িকভাবে সঙ্গীত ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। হয়ত কন্ঠ সঙ্গীত চর্চা ছেড়েই দিতেন- যদিনা তাঁর কিছু ভক্ত ও শিষ্য তাকে এ রকম জোর করে সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁকে ফিরিয়ে না আনতেন। এদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিত ও গুনী ব্যক্তিও ছিলেন। পাবনা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বনোয়ারী লাল বসু, মোহম্মদ হোসেনের কাছে দীর্ঘকাল খেয়াল ও ঠুমরী শিখেছিলেন। ঢাকা কলেজের ডাক্তার নির্মল কুমার সেন ও ডাঃ বি.এন. রায়ের নাম তার ভক্তদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিরাজ দাস নামে খাঁ সাহেবের একটি ছাত্র ঠুমরী গান খুব ভাল গাইতেন। বিরাজের ছাত্র রাধা গোবিন্দ ঠুমরী গান গেয়ে ঢাকায় খুব নাম করেছিলেন।

এছাড়া উচ্চ শিক্ষিত সঙ্গীত রসিকদের মধ্যে এসরাজী মন্মথনাথ রায় ওরফে পিলু বাবু বিশ্ব বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ সত্যেন বসু, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সহাধ্যক্ষ তবলিয়া শ্রী সমরেশ চৌধুরী, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সুকুমার রায় প্রমুখদের

Dhaka University Institutional Repository

তার আসরে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত। উল্লেখ্য সঙ্গীত গুনী রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া 'সোহাগে মৃনাল ভূজে' এ গানটি যারা শুনেছেন তারাই বলতেন যে, কি দক্ষতার সঙ্গে তিনি টপ্পা অঙ্গেও পুরাতনী বাংলা গান বাজাতে পারতেন।

ওস্তাদ কালে খাঁ

ওস্তাদ কালে খাঁ তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক ছিলেন। কিন্তু ঢাকা শহরে দীর্ঘ ৭-৮ বছর অবস্থিতি সত্বেও তার গায়কীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারার মত তার কোন সাগরীদ বা শিষ্য ঢাকায় ছিল না। ঢাকার অনেক ওস্তাদই তাঁর কাছ থেকে চিজ সংগ্রহ করেছেন।

ওস্তাদ ওয়ালিউল্লা খাঁ (সেতার)

বিশের দশকের শেষপাদে ঢাকায় আসেন লক্ষ্মৌর ঘরানার প্রখ্যাত সেতারিয়া ওয়ালিউল্লাহ খাঁ। ওয়ালিউল্লা মুড়াপাড়ার জমিদার প্রখ্যাত জমিদার কেশব বন্দোপাধ্যায়ের সভাবাদক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হন। কেশব চন্দ্র ঢাকার বাড়ীতে প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞ ও রসিক শ্রোতাদের আমন্ত্রন করে আসর বসাতেন। ঢাকার বিভিন্ন 'কদর দান' গুনগ্রাহী জমিদারদের দরবারে প্রায়ই ওয়ালিউল্লাহ্‌র নিমন্ত্রন থাকতো এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর তিনি নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তৎকালীন সময়ে অন্যান্য সেতারিয়াদের মধ্যে মনোরঞ্জন মূখোপাধ্যায়, পরেশ আচার্য্য ও বঙ্কিম পালের নাম উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এরা সবাই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

বঙ্কিম কুমার পাল (সেতার বাদক)

ঢাকার অন্যতম সেতারিয়া বঙ্কিম কুমার পাল বিশের দশকের শেষ পাদেই ঢাকায় পরিচিত হন। পারিবারিক বৈষ্ণব ঐতিহ্যে মানুষ হয়ে বালক বয়স থেকেই তিনি কীর্তন ও ভক্তিমূলক গানের চর্চায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কিছুকাল পর তিনি এনায়েত খাঁর শিষ্য মনোরঞ্জন মূখোপাধ্যায়ের কাছে সেতার ও এস্রাজ শিক্ষা করে ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসাবে কাজ শুরু করেন।

উপরোক্ত সঙ্গীত গুনীদের প্রায় সমসাময়িক ঢাকার অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী বেহালা বদক শ্রী প্রাণ বল্লভ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। পন্ডিত দাস নামেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁর নিকট তিনি টপ্পা অঙ্গের বেশ কিছু গান আদায় বা আয়ত্ব করেছিলেন।

ভাওয়ালের অন্যতম জমিদার শ্রী ফনীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (তবলা বাদক)

পন্ডিত মৌলভী রাম মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহন করে অতি উত্তম তবলিয়াতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাধীনে শান্তি বন্দোপধ্যায়, নীরেন রায় প্রমুখ তরুন শিল্পী ঢাকায় আগামী কালের কলাকার হিসাবে নাম করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিশ দশকের শেষভাগে ও চল্লিশের প্রথম দিকে ঢাকায় যাদের সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়েছিল তাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র নন্দী ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ডাক নাম 'পচা' নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন।

ঢাকায় যে কটি পরিবার সঙ্গীত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে নবাব ষ্টেট, জয়দেবপুর (ভাওয়াল) এবং কাশিমপুরের কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া, ঢাকায় জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রূপলাল দাস ও তার উত্তরাধিকারীগন, বলদা স্টেটের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী ও মুরাপাড়ার জমিদার রায়বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরনীয়। রূপলালের উত্তর পুরুষগণ পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী লক্ষ্মী দেবী ও স্বরস্বতী দেবী উভয়েরই সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। রূপলালের পুত্র রাধা বল্লভ ব্যবসায়ী হিসাবে সুনাম অর্জণ করলেও সঙ্গীতের প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

ঢাকার বলধা স্টেটের জমিদার শ্রী মহেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী ভাল বাঁশি ও এসরাজ বাদক ছিলেন। পয়ার স্বনামধন্য ঠুমরী গায়ক সোনিজি মহারাজ এবং প্রখ্যাত এসরাজবাদক হনুমান দাসজি বলধায় সভাবাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। হনুমান দাস জীর শিষ্য বিখ্যাত এসরাজবাদক চন্দ্রিকা প্রসাদ দুবেজী মুড়াপাড়ায় নিযুক্ত থাকলেও নিয়মিতভাবে বলধায় গিয়ে নরেন্দ্র নারায়নকে শিক্ষা দিতেন। এইসব গুনীদের সঙ্গে মুরাপাড়ার জমিদার শ্রী কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তবলায় সঙ্গত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ঢাকার বলধা স্টেটের জমিদারদের বিশেষ সুনাম ছিল। তারা বহু সঙ্গীত গুনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

গয়ার বিখ্যাত ওস্তাদদের কাছে বলধা স্টেটের ঢাকার বাড়ি যেন একটি ঘাঁটির মত ছিল। ওখাঁন থেকে কেউ এলেই তারা বলধার বাটিকে তাদের কর্মকেন্দ্র করে ঢাকায় অবস্থান করতেন। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নিজে একজন সুদক্ষ এসরাজ বাদক ছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অবদান হল পরিবারের মহিলা মহলেও সঙ্গীতের উৎসাহ সঞ্চার করা। তিনি তার স্ত্রীর জন্য গোয়ালিয়ার দরবারের ভারত বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। গোয়ালিয়র দরবারে সভা সঙ্গীতজ্ঞ এই মহাকলাকাটির উপস্থিতে বলধায় বেশ সুন্দর একটি সাংগিতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

সরোদ নেওয়াজ ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ গোয়ালিয়রে ও বলধায় একই সময়ে কর্মরত থাকতে পারবেন না বলে তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ নব্বু খাঁকে বলধায় অধিষ্ঠিত করেন।

রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

একালে ঢাকার সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা মুড়াপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় উচ্চ পর্যায়ের তবলিয়া হিসেবে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থেকে সম্প্রতি তিনি গত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেশব চন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকার বিখ্যাত তবলিয়া শ্রী প্রসন্ন বনিকের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন ঘরানার বহু তবল নায়কের নিকট থেকে বিদ্যা সংগ্রহ করেছেন। এদের মধেই বেনারসের সনামধন্য তবলিয়া পন্ডিত মৌলভী রাম মিশ্র, দিল্লীর খলিফা নকতু খাঁ ও রামপুরের খলিফা মশিদ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

ঢাকায় বেতার কেন্দ্র স্থাপন কেশব চন্দ্রের জীবনে অন্যতম কীর্তি বলে ধরা যেতে পারে। ঢাকায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রভাব লক্ষ্য করে নিজ উদ্যোগে শিমলাতে তখনকার ইংরেজ কন্ট্রোলার অব ব্রডকাষ্টিং ইন ইন্ডিয়া মিঃ লায়নেল ফিল্ডেন এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফিল্ডেন প্রথমে রাজী না হলেও কেশব চন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনার পর কেশব চন্দ্রের যুক্তির স্বপক্ষে মত দেন।

বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর ঢাকা তথা সমগ্র পূর্ব বাংলায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এক নব দিগন্ত খুলে যায়। ব্যাপকতর সঙ্গীত চর্চা লক্ষ্য করে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু গুনী ব্যক্তি ঢাকায় আসতে আরম্ভ করেন। বঙ্গ বিভাগের আগে কেশব চন্দ্র ছিলেন ঢাকায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যমনি। বঙ্গবিভাগের পর কোলকাতা প্রবাসী হয়ে তিনি একজন প্রবীনতম গুনী তালবাদ্য বিশারদ বলে পরিগনিত ও স্বীকৃত হন। তবলা বাদনে স্বীকৃতি হিসাবে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি এই দীর্ঘকাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা ঢাকার জনজীবনের আনন্দের সৃষ্টি ও বিতরনই কেবল করেনি একটি আদর্শেরও সৃষ্টি করেছিল। সেটি হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি।

গুল মুহাম্মদ খাঁ (১৮৭৬-১৯৭৯)

বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসে যারা স্বরনীয় ও বরনীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে ওস্তাদ গুল মুহাম্মদ খাঁ অন্যমত। তিনি ১৯৭৬ সনে দাঁড় ভাঙ্গার তিরহুত শহরে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম আহম্মদ খাঁ। শৈশবে পিতার কাছেই তার সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয়। দুর্ভাগ্য বশত: মাত্র চৌদ্দ বৎসর তিনি পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য হায়দার বখস গুল মুহম্মদের সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহন করেন এবং তাঁর অধীনেই এর সঙ্গীত জীব গঠিত হয়। পিতৃব্যের কাছে অন্তত সাত বৎসর তালিম লাভের পর তিনি আগ্রা গিয়ে বসবাস করেন ও আগ্রা ঘরনার ঐতিহ্যে তালিম পান। ১৯০৮ সালে গুল মুহাম্মদ ঢাকা আসেন এবং তারপর থেকেই এ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ও জোড়ালো গায়কী ঢাকার সঙ্গীত রসিকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জণ করে এবং শীঘ্রই তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সংগীত পরিমন্ডল গড়ে ওঠে।

শিষ্য গঠন করেও তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা ও প্রসারে ব্রতী হন এবং সেই থেকে সুদীর্ঘ কাল ধরে এই শহরে সঙ্গীত শিক্ষাদান কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। নিবেদিতা মন্ডল, সুকুমার রায়, মুন্সী রইসউদ্দিন, উৎপলা সেন, লায়লা আর্জুমান্দবানু প্রমুখ গুল মুহম্মদ

খাঁর তালিম লাভ করেন। তার পুত্রদের মধ্যে ইয়াসিন খাঁ খেয়াল গায়ক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। শাস্ত্রীয় সংগীত-এ বিশেষ অবদানের জন্য গুল মুহাম্মদ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন। তার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ২১শে পদক ও ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর নব-বর্ষীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করে আমাদের ছেড়ে চলে জান।

ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন (১৯০১-১৯৭৩)ঃ

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা, কণ্ঠশিল্পীও সঙ্গীতাচার্য। ওস্তাদ মুন্স রইজউদ্দিন ১৩০৮ সনের ২৪শে পৌষ যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার নাকোল গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম মুন্সী আব্বাস উদ্দিন। তাঁর পিতা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

উচ্চাঙ্গ সংগীতে তিনি প্রথম পাঠ নেন তার ফুফাত ভাই সঙ্গীত শিল্পী শামসুল হকের কাছে। সতের বৎসর বয়সে সঙ্গীত শিক্ষার অভিলাষে কলকাতা যান। সেখানে প্রাথমিকভাবে তাকে যথেষ্টভাবে অর্থকষ্ট সহ্য করতে হয়। কলকাকাতয় তিনি রাস বিহারী মল্লিকের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা লাভ করেন। তারপর সঙ্গীত বিশারদ শরজিৎ কাঞ্জিলালের কাছেও কিছুকাল গানের তালিম গ্রহন করেন। প্রায় একযুগ ধরে গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তীর কাছেও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা বেতার থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা চলে আসেন ও প্রথমে নারায়নগঞ্জ সংগীত বিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষ হন। তারা ছাড়া তিনি মাগুরা, নড়াইল, খুলনাতেও সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকার বুলবুল একাডেমী স্থাপিত হলে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সহ অধ্যক্ষ রূপে কর্ম গ্রহন করেন। এছাড়াও তিনি বহু সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকায় তিনি গুল মুহাম্মদ খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ করেন বলে জানা যায়। শাস্ত্রগীতির প্রসার, ছাত্র গঠন ও সঙ্গীত সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি ছিল তার সকল কর্মের লক্ষ্য। এদিক থেকে বিভাগ পরবর্তী কালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) সঙ্গীত ক্ষেত্রে তার অবদান ঐতিহাসিক। সঙ্গীত শিক্ষার সিলেবাসগত ভাবে চালু হলে তিনি স্কুল পাঠ্য সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীত শিক্ষা সিলেবাসেরও তিনি অন্যতম প্রণেতা ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে ছোটদের 'সারেগামা', 'অভিনব', 'শতরাগ', সঙ্গীত পরিচয়, 'রাগ লহরী' ও গীত লহরী। তাঁর গবেষনামূলক সঙ্গীত গ্রন্থ "অভিনব শতরাগ" রচনার জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

১৯৬৭ সালে সঙ্গীতে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' ভূষিত করেন। ১৯৭৩ সালের ১১ই এপ্রিল ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দিন ইন্তেকাল করেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

তিন পুত্র ও এক কন্যা। ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দিন একজন সত্যিকারের সঙ্গীতজ্ঞ রূপে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ওস্তাদ মুহাম্মদ হোসেন খসরু ঃ

যুগে যুগে আমাদের বঙ্গভূমিতে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যাঁরা জন্মগ্রহন করেছেন তাদের মধ্যে ওস্তাদ মুহাম্মদ হোসেন খসরুও একজন। তিনি ১৯০৩ সালে কুমিল্লার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম জাইদুল হোসেন। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট বংশীবাদক ছিলেন। মুহাম্মদ হোসেন খসরু শৈশবে পিতার নিকট বাঁশী বাজানো শিখেন। তিনি খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন এবং ভাল বাঁশি বানাতেও পারতেন।

তাঁর নানা ওস্তাদ জানে আলম চৌধুরী ছিলেন তখনকার প্রখ্যাত সংগীজ্ঞ। মোহাম্মদ হোসেন বাঁশি ছেড়ে কণ্ঠ সংগীতে তালিম গ্রহন করেন। ছাত্র হিসাবে মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯১৮ সালে দু'টো লেটার সহ তিনি প্রবেশীকা পাশ করেন। তিনি বি.এ.পাশ করেন ১৯২৩ সালে। প্রথম পর্ব এম.এ.ও আইন পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেনী লাভ করেন।

সঙ্গীতের প্রতি মোহাম্মদ হোসেনের আকর্ষণ ছিল প্রবল। জলসার খরব শুনলেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতি শক্তি আর সুর জ্ঞান। যা শুনতেন তা অনায়াসে আয়ত্ব করে ফেলতে পারতেন। তাঁর সঙ্গীত সাধনার প্রথম সোপান ছিল স্মৃতি শক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ সাধনার বলে মোহাম্মদ একজন কৃতী সংগীতজ্ঞ হয়ে উঠলেন। ত্রিপুরায় মহারাজ তাঁর সুনাম শুনে তাঁকে দরবারে গান পরিবেশনের আহবান জানান। সেখানে বেনারস থেকে মিশিরজি নামে দু'ভাই সঙ্গীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। তাঁরা মোহাম্মদ হোসেন খসরুর গান শুনে তারিফ করলেন এবং তাঁকে বেনারসে যাবার অনুরোধ করেন। আরেকবার ত্রিপুরাধিপতির রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁন। তাঁর সঙ্গীত শুনে মোহাম্মদ হোসেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরু মেহেদী হোসেনের কাছে ধ্রুপদ, ধামার, সাদরা ও হোরী অংগের রাগ রাগিনীর তালিম নিয়েছেন।

মোহাম্মদ হোসেনের ডাক নাম ছিল খোরশেদ। আমিরুল ইসলাম শর্কী নামে তাঁর এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু ছিলেন। শর্কী সাহেব খোরশেদের মধ্যে বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ ওস্তাদ আমীর খসরুর গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে খোরশেদ নাম বদলিয়ে খসরু রাখলেন। সেই থেকে তিনি খসরু নামে পরিচিত হতে লাগলেন।

মোহাম্মদ হোসেন খসরু লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, রামপুর, আগ্রা ও বেনারসে, ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর কাছে ধ্রুপদ; ওস্তাদ কালে খাঁর কাছে টপ্পা, ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খাঁ, জদ্দান বাঈ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল, ওস্তাদ করিম খাঁ ও ওস্তাদ মঈজুদ্দিন খাঁর কাছে ঠুমরী শিখেন। তিনি শুধু গানেই নয় তবলাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি ওস্তাদ

Dhaka University Institutional Repository

মসিত খাঁর কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ করেন। তিনি তবলা বাদন ও তাল-লয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু 'লক্ষ্মৌ মরিস সংগীত কলেজ'এর সহ-অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোলকাতার মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর রচনা ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি বাংলা, উর্দু, ও হিন্দিতে প্রচুর গান ও গজল রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন গান পাগল। গানের আসরে বসলে ঘন্টার পর ঘন্টা গান গাইতেন।

১৯২২ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। তিনি বিদ্রোহী কবির কয়েকটি গান সুরারোপ করেন। কবি ওস্তাদ খসরুর কাছ থেকে বহু রাগ-রাগিনীর তালিম গ্রহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খুব বিনয়ী ছিলেন। সদা হাস্যময় অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর। অত্যন্ত নিরাভিমানী ছিলেন তিনি। অদ্ভুত ছিল তাঁর গাইবার শক্তি। বিশ্বরবেণ্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর সংগীত পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয় 'দেশমণি' রূপে আখ্যায়িত করেন।

১৯৫৪ সালে ওস্তাদ খসরু "করোনারী থ্রম্বসিসে" আক্রান্ত হন। তাঁর বাম পা ও বাম হাত পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে তিনি "বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর" অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি বুলবুল ললিতকলা ও ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণীর সংগীত সিলেবাস প্রণয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ১৯৫৯ সালে ৬ই আগষ্ট তিনি মৃত্যুর মুখে পতিত হন। তাঁর একমাত্র কন্যা কানিজ ফাতেমা একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী।

১৯৬১ সালে ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুকে পাকিস্তান সরকার মরণোত্তর 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত করেন এবং ১৯৭৮ সালে তিনি মরণোত্তর 'শিল্পকলা একাডেমী পদকে' ভূষিত হন।

সংগীত ইতিহাসে মোহাম্মদ হোসেন খসরু একটি চির স্মরনীয় নাম।

ওস্তাদ আখতার শাদমানী

এই উপমহাদেশে ওস্তাদ আখতার শাদমানী সাহেব তাঁর সুন্দর কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে অসংখ্য শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে রেখেছেন। ১৯৩৬ সালে ওস্তাদ আখতার শাদমানী সাহেব ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আকবর আলী। আখতার শাদমানী বরিশাল জেলার চাখারের বিখ্যাত খাঁন বাহাদুর হাজী আব্দুল গণি সাহেবের পৌত্র। শৈশব তাঁর কলকাতায় অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তিনি সঙ্গীত প্রেরণা ও উৎসাহ পান তাঁর পিতার কাছে। মাত্র ১০ বছর বয়সে কলকাতার স্বনামধন্য ওস্তাদ জমীর উদ্দিন খাঁ সাহেবের অন্যতম ও সুযোগ্য শিষ্য প্রফেসর ববি ডানিয়েলের কাছে তাঁর হাতে খড়ি হয়। প্রফেসর ববি ডানিয়েল পুত্রতুল্য হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন ও সঙ্গীতে তালিম দিতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালে ওস্তাদ ববি ডানিয়েলের সহায়তায় তিনি ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ ওমর খাঁ সাহেবের সাহচার্যে আসেন। ববি সাহেবের উৎসাহেই শাদমানী ওস্তাদ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওস্তাদ ওমর খাঁ সাহেব তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং আপন পুত্রের ন্যায় তাঁকে সঙ্গীতে তালিম দেন ও তাঁর সাহচর্যে রাখেন। ঐ সময়ে ওস্তাদ ওমর খাঁ ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতপীঠ লাক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৫৭ সালে ওস্তাদ ওমর খাঁ ব্যক্তিগতভাবে শাদমানীকে ভারতের সংগীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও ইন্দোরম্ব ঘরনার ধারক ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ওস্তাদ ওমর খাঁর মহানুভবতায় শাদমানী মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে শাদমানী ওস্তাদ ওমর খাঁর কাছে সর্বদা পরামর্শ গ্রহণ করেছেন ও সংগীতে তালিম নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ রজ্জব আলী খাঁ সাহেবের দিক দিয়ে ওস্তাদ আমীর খাঁ ও ওমর খাঁ দু'জনে ছিলেন গুরু ভাই। আখতার শাদমানী ব্যক্তিগত জীবনেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের প্রভাব বেশীরভাগ লক্ষনীয়। ফলে ওমর খাঁ ও ওস্তাদ আমীর খাঁর কণ্ঠ ও ওস্তাদ ওমর খাঁর সরোদের কারুকার্য শাদমানীর কণ্ঠে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ওস্তাদ আমানত আলী, ওস্তাদ ফতেহ্ আলী, ওস্তাদ মঞ্জুর হোসেন খাঁন ও ওস্তাদ ফয়েজ মোহাম্মদের সাহচর্যে আসেন ও তাদের কাছেও সঙ্গীতে তালিম গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সালে শাদমনী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬২ সালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলাদেশ বেতারে ঢাকা কেন্দ্রে সঙ্গীত প্রযোজকের দায়িত্ব লাভ করেন। ওস্তাদ আখতার শাদমানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী সৃষ্টি, প্রচার ও প্রসারকল্পে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯৮০ সালে 'একাডেমী অব ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী।

উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীতে (নজরুল, আধুনিক, লোকোগীতি, দেশাত্মবোধক, পল্লীগীতি) বরেণ্য শিল্পীগণ

ফেরদৌসী রহমান

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীতে তাঁর অবদান শ্রোতাদের কাছে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তিনি নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। তাঁর পরিবেশনায় এই উপমহাদেশের অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের তালিমের প্রভাব দেখা যায়।

ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি ও আধুনিক গানে তাঁর গাওয়া গানগুলি আজও এ মেঠো বাংলার মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

নিলুফার ইয়াসমিন (প্রভাষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অঙ্গনে শ্রদ্ধেয়া শিল্পী নিলুফার ইয়াসমিন তাঁর সুন্দর গায়কির মাধ্যমে এদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ও শ্রোতাদের

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। নজরুল সঙ্গীতেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন পরিবেশনা মনোমুগ্ধকর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এম.ফিল. কোর্সের শিক্ষিকা।

বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে তাঁর গাওয়া গানগুলি এ উপমহাদেশের শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিতউচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীগণ

ওস্তাদ জাকির হোসেন

ওস্তাদ জাকির হোসেন বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর খেয়াল ও ঠুম্‌রী পরিবেশনায় গায়কীর এক মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

"শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নে সভাপতি আসনে উপবিষ্ট থেকে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতের শিল্পীদের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একজন স্বার্থক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় মেহের হোসেন (তবলা), শিল্পকলা একাডেমীতে চাকুরীরত। তিনি তবলা লহরা ও সঙ্গতশার হিসাবে সুপরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

জাকির হোসেনের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সাজিত হোসেন সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের যন্ত্র বিভাগে (তবলা) প্রশিক্ষক হিসাবে চাকুরীরত আছে।

ডঃ কৃষ্ণপদ মন্ডল

ভারত থেকে তিনি মিউজিকের উপরে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী নিয়ে আসেন। তিনি মরহুম ওস্তাদ আবদুল বাচ্চু সাহেবের উল্লেখযোগ্য শিষ্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তাঁর সুন্দর সুমিষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে ধ্রুপদী অঙ্গের খেয়াল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর সহধর্মিণী স্মৃতি বিশ্বাস (এম.মিউজ) বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত আধুনিক গানের শিল্পী।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা সঙ্গীত বিভাগে এম.ফিল. কোর্সে ধ্রুপদ ও ধামারের প্রশিক্ষক।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীগণ হলেনঃ-

নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, ইয়াকুব আলী খাঁন, লিয়োজো বাড়ৈ, অনলি কুমার সাহা, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (তবলা), তপন কুমার সরকার (পাখোয়াজ) ও মঙ্গল চন্দ্র মন্ডল।

Dhaka University Institutional Repository

আমার অজ্ঞাতসারে যদি কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের জীবন নিয়ে এই অভিসন্দর্ভ পত্রে উল্লেখ না হয়ে থাকলে আমি আমার এই গবেষণা পত্রের মাধ্যমে অপারগতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

'সদারঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ'

ঢাকায় 'সদারঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ'-এর পরিচালক তপণকান্তি বৈদ্য কোলকাতার শান্তি নিকতেন থেকে এম.মিউজ পাশ করে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে 'সদারঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' (ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল) নামে ১৯৮৪ সালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই একাডেমীটি চালু করেন। সম্পূর্ন তানপুরা যন্ত্রটির উপর নির্ভর করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের তালিম দেয়ার প্রচলন করেন।

'সদারঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' তৎকালীন সময়ে ঢাকায় ঘরোয়া ও মঞ্চে একাধিক শিল্পীর সমন্বয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলন করেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্যন ছিল সমবেত ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী পরিবেশনা। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনটি বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা ও প্রসারে এগিয়ে আসতে পেরেছিল।

ধ্রুপদী শিল্পী তপনকান্তি বৈদ্যের ধ্রুপদ পরিবেশনা ছিল মনোমুগ্ধকর। কোলকাতায় সঙ্গীতে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার আগে তিনি বাংলাদেশে অবস্থানকালীন নজরুল সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

পদক পান। তাঁর সহধর্মিনী দূর্বা বৈদ্য (এম.মিউজ) তিনিও একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী।

ধ্রুপদী শিল্পী তপনকান্তি বৈদ্যের উল্লেখযোগ্য শিষ্যরা হলেন আমিনা আহমেদ, সাদিয়া আফরিন মল্লিক, সুনীল কুমার মন্ডল, সামিয়া মাহাবুব, হেনা ইউনুস, কিসি ইসলাম, রানু মহসিন, দিলরুবা ওহাব ও মিন্টু কৃষ্ণ পাল। এদের অনেকেই বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। বর্তমানে তপনকান্তি বৈদ্য আমেরিকায় অবস্থান করছেন। সদারঙ্গ সঙ্গীত সমারোহে অনুষ্ঠানে তবলা ও পাখোয়াজে সহযোগিতা করতেন দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, পূলিন চক্রবর্তী, একরাম হোসেন প্রমূখ শিল্পীরা

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ও ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন।

এই ঐতিহ্যবাহী দুটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সঙ্গীত জগতে প্রাচীন সঙ্গীত একাডেমী হিসাবে খ্যাত। উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিষ্ঠান দু'টি অনেক সঙ্গীত শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশে স্বনামধন্য বহু শিল্পী এই প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর নৃত্য বিভাগের পরিবেশনা প্রশংসনীয়। ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীত বিভাগ নজরুল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে শিক্ষা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম

সমুদ্রবিধৌত কর্ণফুলি নদী অধ্যুষিত এ স্থানটির নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন বহু ভ্রমনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তেমনই এ স্থানটি বহু দেশের বহু ধর্মের এবং বহু সংস্কৃতির একটি মিলনকেন্দ্র হিসেবেও বিখ্যাত ছিল। এদেশে বহু মহৎ বঙ্গসন্তানকে জন্ম দিয়েছে। মহাবিদগ্ধ পন্ডিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ থেকে শুরু করে অনেক বিদ্বান বঙ্গসন্তানকে যেমন জন্ম দিয়েছে তেমনি দিয়েছে লোকমান খাঁ শেরমানী থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের নমস্য ব্যক্তিত্ব মহাবীর শ্রীসূর্য সেন (মাস্টারদা)- এর মতো দেশ প্রেমিক নায়কদেরও। লোকমান খাঁ শেরমানী দেশ গৌরব সুভাষ চন্দ্রের অনুগামী হিসেবে এবং দেশ নায়ক হিসেবে সারা ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, আর মাস্টারদার নেতৃত্বে চাটগাঁর বিপ্লবীরা কয়েকদিনের জন্যে হলেও দেশকে স্বাধীন করেছিলেন ইংরেজ বিতাড়ন করে। ইংরেজ অফিসার কর্তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে স্টিমার করে সমুদ্রের মধ্যে সেই সময় অবস্থান করেছিলেন। চাটগাঁয় তাঁদের ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুন্ঠনের কাহিনী সর্বজনবিদিত। Chittagong Army Case হিসেবে তা পরবর্তীকালে সারা পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিল। মাস্টারদার নেতৃত্বে যে ইস্পাতদৃঢ় বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেক সভ্যই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের যে নজির রেখেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবেই হয়তো চাটগাঁর বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌবহরকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও পর্যুদস্ত করে বাংলাদেশ কায়েম করেছিলেন।

অতি লক্ষনীয় বিষয় হল এই যে, এ স্থানটিতে বহু ধর্মের ও বহু সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল বহু পূর্ব থেকেই। এখানে পর্তুগীজ জলদস্যুদের যেমন আগমন ঘটেছিল তেমনি ঘটেছিল ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদেরও। পরবর্তীকালে ইংরেজরা যখন এখানে ঘাঁটি করল তখন তারাও এদেশীয় সংস্কৃতিতে কিছু দান করল। তাছাড়া চৈনিক, বর্মী, আরাকানীয়দেরও প্রভাব এদেশীয় ভাষায় ও সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করার বিষয়।

এতদ্ব্যতীত এখানকার ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির তৎকালীন কার্যকলাপও লক্ষনীয়। চাটগাঁর চট্টলেশ্বরীর মন্দির, পাহাড়ের ওপর অবস্থিত কৈবল্যধাম প্রভৃতি যেমন সর্বধর্মের একটি মিলন কেন্দ্রের মতো ছিল তেমনিই ছিল বায়েজীদ বোস্তান, বায়তুল-মোকাররাম প্রভৃতি পীরের মাজার ও মসজিদের প্রাঙ্গণ। বহু অমুসলমান সেখানে দরগা জেয়ারৎ ও প্রার্থণা করে প্রানে শান্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন।

এমনি মহামিলন কেন্দ্র চট্টগ্রাম সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য কলা শিল্পের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্প সঙ্গীতকেও স্থান দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কোন পথে কিভাবে চট্টগ্রামে এসেছিল তার বিশেষ নজির প্রমানের অবকাশ রয়েছে।

সঙ্গীত তাত্ত্বিকরা ধারনা করেন যে, বাকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং ঢাকা হয়ে তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদ চাটগাঁয় আসে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী প্রাণ হরিদাস

চট্টগ্রামের সঙ্গীতের প্রানপুরুষ সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রী প্রাণহরিদাস ধ্রুপদ গান করতেন। তিনি কোথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তা জানা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, বিষ্ণুপুরে সেনীয়া ওস্তাদদের অবস্থান দরুন তথায় যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল তাই ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলার শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ সেনিয়া কলাবন্ত ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন। সহজেই অনুমেয় যে ঢাকা থেকেই চট্টগ্রাম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঠিক কোন সময় থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। কিন্তু শ্রী সুরেন্দ্র লাল দাস ও তার কিছু সহকর্মীদের দারাই যে চট্টগ্রামে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি ব্যাপক চর্চা শুরু হয় সেই বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে চট্টগ্রামের নানাস্থানে কোন কোন ব্যক্তি হয়ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন। কিন্তু সুরেন্দ্র লালই যে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দেন সেই বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত লক্ষ্য করা যায় না।

চট্টগ্রামের বিখ্যাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'আর্য্য সঙ্গীত সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। কিন্তু তখন তাকে একটি নিছক জলসা ধর্মী বৈঠকী গানের আড্ডা বলে ধরা হ'তো। কিন্তু ১৯২০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

সুরেন্দ্র লাল দাস যিনি ঠাকুরদা নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন 'আর্য্যসঙ্গীত'-এ যোগদান করে প্রতিষ্ঠানের নাম করেন 'আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপিঠ'। এভাবে চট্টগ্রামে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রচার ও প্রসারের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদার নাম এই উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপিঠের উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম সঙ্গীত মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চিটাগাং মিউজিক কনফারেন্সের কথা সারা উপমহাদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়ে।

বহু দূর-দূরান্ত থেকে বড় বড় সঙ্গীতকলাকার ওস্তাদরা চিটাগাং মিউজিক কনফারেন্সে যোগদানের ইচছা প্রাকাশ করে ঠাকুরদাকে পত্র মারফৎ অনুরোধ করতেন। এই কনফারেন্সে অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয় সারা ভারতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। চট্টগ্রামে ঐ রকম উচ্চ পর্যায়ের গান পরিবেশন করার পরই তাঁকে হায়দ্রাবাদ, এলাহাবাদ, কাশী, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে তাকে আমন্ত্রন জানানো হতে থাকে। অবশ্য পশ্চিম ভারতে ও দক্ষিন ভারতে তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যদিও তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের সেই সঙ্গীত মহাসম্মেলনের পর বিভিন্ন সময়ে বহু মহাশিল্পী স্বেচছা প্রনোদিতভাবে এসে চট্টগ্রামে গান বাজনা করে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সঙ্গীত নায়ক ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ, পন্ডিত ওমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পন্ডিত রাধিকা মোহন মৈত্র, সঙ্গিতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, মহাসঙ্গীতজ্ঞ সেনিয়া ঘরানা, কূলতীলক বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ কলাকারেরা। পরবর্তী কালে জগৎ বিখ্যাত নিত্যাচার্য্য উদয় শংকর ও তার বিশ্বনন্দিত ভ্রাতা পন্ডিত রবিশংকর পন্ডিত এ কানন ও সঙ্গীতাচার্য জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্র লাল

১৯শে জানুয়ারী ১৮৯২ সালে চট্টগ্রামের কাউলী গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রান হরিদাস ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা করতেন এবং অত্যন্ত সুগায়ক ছিলেন। জন্মসূত্রে সুরেন্দ্র লাল সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিতৃদেবের নিকট উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদী রীতি, আঙ্গিক ও শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিতি তাকে উত্তর জীবনে একজন মহৎ গবেষকের পদে উন্নীত করেছিল।

তিনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার বিভিন্ন রূপরীতির সংমিশ্রন ও তা থেকে কিছু মহৎ সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী ব্যতীত অর্কেষ্ট্রা রচনার প্রাথমিক পর্যায়ের পথ প্রদর্শক হিসেবেও তিনি চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন। “His master voice” তার রেকর্ড করা কিছু রেকর্ড এখনও শ্রোতা সঙ্গীতজ্ঞদের মুগ্ধ-বিস্মিত করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মোদ্দাকথা যেসব কলাকারদের মূলতঃ তৈরী বলে ধরা যেতে পারে তাদের মধ্যে সর্বশ্রী সুজিত নাথ দক্ষিনা মোহন ঠাকুর, অলোক নাথ দে, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত ও জিতেন দাসগুপ্ত বিখ্যাত হয়েছিলেন। শ্রী সুজিত নাথ পিয়ানো বাজাতেন। তাকে তিনি হাওয়াইন গিটার ধরিয়ে ভারত বিখ্যাত করেন। তেমনি দক্ষিনা মোহনকে সেতারে ইলেক্ট্রোনিক ব্যবহার করে তরিৎবিনকারে পরিণত করেন। দক্ষিনা মোহন তার সানাই যন্ত্রটি এমন আয়ত্ব করেছিলেন যে মুম্বাই এর ফিল্ম ষ্টুডিওগুলির চত্বরে তার নাম কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুজিত নাথের গিটার ও দক্ষিনা মোহনের তার সানাই-এ দ্বৈত যন্ত্রসঙ্গীত His master voice কোম্পানীতে রেকর্ড হয়ে সর্ব ভারতে খ্যাতি হয়েছিল এবং His master voice কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। বাংলাদেশে (প্রাক-বিভাগ বঙ্গে) এই রেকর্ডটি ঘরে ঘরে বেজেছে।

সুরেন্দ্র লাল দাস (ঠাকুরদা) সঙ্গীত মহলে ঠাকুরদা নামেই পরিচিত ছিলেন। এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি দেখতে গৌরকান্তি এবং তার দাড়িগোঁফ সব মিলিয়ে ঠাকুরদার মতই যেমন ছিলেন তেমনি তার ধ্যান, ধারনা মানষিকতা ছিল ঋষিতুল্য।

আমির খাঁ যখন ওস্তাদ আমির খাঁ হন নি- বৌ বাজারের মুন্নী বাঈ ও জগমোহীনী দাসির আশ্রিত ছিলেন। তখন তিনি কোলকাতা রেডিওতে দুপুরবেলা গাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হতেন। অর্থাৎ রাত্রির প্রোগ্রামের অনুপযুক্ত। সেসময় ঠাকুরদা তাকে অনেকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য করেছিলেন। এমনকি বিখ্যাত চট্টগ্রাম মিউজিক কনফারেন্সে গাইবার জন্য তার আর তারাপদ চক্রবর্তীর সুপারিশক্রমেই আমীর খাঁ সেখানে গাইবার অনুমতি পেয়েছিলেন।

ওস্তাদ আমীর খাঁ বলেছিলেন 'এ্যায়ছা ইনছান হাজার ছালামে এক হি পয়দা হোতে হ্যায়'

বিয়াল্লিশের মন্বন্তরে যুদ্ধ চলাকালীন মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের চেহারা দেখে তিনি এতই পিড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি সারাক্ষণ ফেমিন রিলিফ ফান্ডের অর্থ সংগ্রহ করার কাজে কোথাও অর্কেষ্ট্রা, কোথাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, কোথাওবা আধুনিক গানের জলসা সংগঠিত করে বেড়িয়েছেন। এ কাজে অমানুষিক পরিশ্রম করার দরুন তিনি মিনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এ মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি পরলোক গমন করেন। চট্টগ্রামের 'আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপিঠের' নাম রাখা হয় সুরেন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যাপিঠ। ঠাকুরদা ইতিপূর্বে আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপিঠের কয়েকটি শাখাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের কিছু শাখা ব্যাতীত রেঙ্গুন ও আকিয়াবে শাখা স্থাপিত করে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার করে গিয়েছেন।

সঙ্গীত সম্রাট ঠাকুরদার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই চট্টগ্রাম গিয়ে ঠাকুরদার নিকট থাকতেন এবং শিক্ষাদান ইত্যাদি নানাভাবে তাকে সাহায্য করতেন। ঠাকুরদার মত মানব দরদী মানবপ্রেমী ব্যক্তিত্ব অতি দুর্লভ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী গঙ্গাপদ আচার্য্য

ঠাকুরদা চট্টগ্রাম ছেড়ে কোলকাতা বেতার কেন্দ্রেও কাজ নিয়ে যখন চলে আসেন তখন তার সহযোগী শ্রী গঙ্গাপদ আচার্য্যকে তার স্থলে নিযুক্ত করে আসেন। শ্রী গঙ্গাপদ আচার্য্য ধ্রুপদিয়া, খেয়ালিয়া হিসাবে প্রথম শ্রেনী বিবেচিত হয়েও সেতার বাদনে অসামান্য দক্ষতা অর্জণ করেছিলেন। তাছাড়া শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য অধ্যক্ষ হিসাবে আর্য্য সঙ্গীতে যোগ দেবার পূর্বে সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্র লাল দাসের আহবানের প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রী সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রায় তিন বৎসর আর্য্য সঙ্গীতের অধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। সুরেশ চন্দ্র ও সুরেন্দ্র লালের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। দু'জনে অনেক সময় সঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যয় করেছেন। দূ'জনে অনেক সময় তর্কযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হতেন। এতে দু'জনের গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত।

চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী পটিয়ার হাবলাইশ দ্বীপ নিবাসী শ্রী বিপিন চন্দ্র আচার্য্যের দুই পুত্র গঙ্গাপদ ও শ্রীপদ শৈশবেই তাদের সঙ্গত প্রতিভার জন্য বিখ্যাত হন।

শ্রীগঙ্গাপদ আচার্য্যের অনুজ শ্রীপদ আচার্য্য মূলতঃ ধ্রুপদিয়া খেয়ালিয়া ও উচ্চকোটির একজন সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে সুনাম

Dhaka University Institutional Repository

অর্জণ করেছিলেন। তিনি নিয়মিত আর্য্য সঙ্গীতে তার ক্লাশ নিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর শিক্ষক।

শ্রী সৌরেন্দ্র লাল দাস (চুলু বাবু)

গঙ্গাপদ আচার্য্য মহাশয়ের খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রী সৌরেন্দ্র লাল দাস। তার কন্ঠস্বর ছিল যেমন সুরেলা তেমনি উদাত্ত। ধ্রুপদ গানের আঙ্গিক এবং শৈলী তার পরিপূর্ণভাবে অধিগত ছিল। কেবল চট্টগ্রামে বসে উচ্চমানের ধ্রুপদী তিনি গান করেননি একবার কোলকাতায় সর্বভারতীয় ধ্রুপদ প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তার বন্ধু বিশিষ্ট সেতার শিল্পী শ্রী প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল আর্য্য সঙ্গীতে বহু শিষ্য প্রশিষ্য তৈরী করেছেন। চুলু বাবুর ধ্রুপাদঙ্গ আলাপ বিশেষ করে প্রিয়দা বাবুর সেতারের আলাপে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রূপ পেত।

শ্রী শিব শঙ্কর মিত্র

চট্টগ্রামের প্রখ্যাত তবলা শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত শ্রী শিব শঙ্কর মিত্র ছিলেন ঠাকুরদার বিশেষ স্নেহধন্য। তিনি তবলার সঙ্গে কন্ঠ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহন করেছিলেন বিশিষ্ট গুনী জনের কাছ থেকে। তিনি বরিশালের বিখ্যাত ওস্তাদ সখানাথ ও আনোয়ারার জমিদার শ্রী প্রসন্ন রায়ের নিকট তবলা শিক্ষা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী প্রিয় গোপাল গুপ্ত (অধর বাবু)

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট বেহালা বাদক শ্রী প্রিয় গোপাল গুপ্ত (অধর বাবু) অতি শৈশবেই বিখ্যাত বেহালা বাদক ও শিক্ষক জ্ঞানদা চরন গুপ্তের নিকট দিক্ষিত হন। পরবর্তীকালে তিনি লালন চন্দ্র অধিকারের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আর্য্য সঙ্গীতে যোগদান করে আর্য্য সঙ্গীতে বেহালা বাদক শিক্ষক শ্রী শান্তিময় ঘোষের কাছে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। সেই সময় আর্য্য সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বেহালা বাজিয়ে বিখ্যাত হন।

তিনি ১৯৩৭ সালে আর্য্য সঙ্গীতে যোগদান করে এবং এখনও তিনি নিরলসভাবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের তালিম দিয়ে থাকেন।

শ্রী আস্ত ভট্টাচার্য্য

চট্টগ্রামের অন্যতম বিখ্যাত তবলিয়া শ্রী আস্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় চট্টগ্রামের নিকটবর্তী পটিয়ার সুচক্রদন্তীতে জন্মগ্রহন করেন। কিন্তু কাশিধামের ভারতবিখ্যাত তবলিয়া পন্ডিত কণ্ঠে মহারাজের কাছে তালাধ্যায়ের শিক্ষালাভ করে কাশীধামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শ্রী আস্ত ভট্টাচার্য্য সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ থেকে শুরু করে বহু মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তবলার সঙ্গত করেছেন।

চট্টগ্রামের জমিদার পরিবারগুলির অনেকেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত। বেশ কয়েকটি বাড়ীতে প্রায়ই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। বাইরে থেকে কোন বড় শিল্পী এলে

Dhaka University Institutional Repository

এরা উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে তাদের নিজ গৃহে আসার নিমন্ত্রন করতেন। এদের মধ্যে জমিদার যোগেশ বাবু ও জমিদার প্রসন্ন বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশ বিভাগের পর উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের চর্চা কমে যেতে শুরু করে। পূর্ব বাংলায় যেসব ওস্তাদ, শিল্পী, শিক্ষক ছিলেন তারা কেউই বা ভারতে বা কেউবা পাকিস্তানের ভুমিতে পারি দেন।

শ্রী নীরোদবরণ বড়ুয়া

সেই সময় চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী নিরোদবরণ বড়ুয়া কোলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এসে 'আর্য্য সঙ্গীত'-এর হাল ধরেন। তিনি আসার পর চট্টগ্রামের হারানো ঐতিহ্যও পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করা হয়। তিনি একাধারে পঁচিশ বৎসর সুরেন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যাপিঠের (আর্য্য সঙ্গীত) অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থেকে তার হৃত গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করেন।

তিনি অনেক গুনীজনের কাছে সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছেন। সঙ্গীত গুরুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রী প্রফুল্ল কুমার সেন।

প্রফুল্ল কুমার সেন

পিতৃদেব জমিদার শ্রী প্রসন্ন কুমার সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রী প্রফুল্ল কুমার একজন অতি উচুদরের সঙ্গীতজ্ঞে পরিনত হয়ে দেশ বিভাগজনিত নানা কারনে কোলকাতা চলে আসেন। অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

তৎসঙ্গে নিজেকে আরো অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্ম প্রতিষ্ঠা দেবার তাগিদও যথেষ্টই ছিল ।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্ল কুমারের জন্ম হয় চট্টগ্রামের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পিতৃদেব ছিলেন সনামধন্য শিল্পপতি ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর প্রসন্ন কুমার সেন ।

চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত তাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করে তথাকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে পরিগনিত হয়েছিল ।

উক্ত জ্ঞানীগুণী ও মহৎ শিল্পীর উপস্থিতিতে 'প্রসন্ন ধাম' ধন্য হয়েছে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর মত মহাপন্ডিত যেমন 'প্রসন্নধামে' অবস্থান করে জ্ঞান বিতরণ করেছেন তেমনি সন্ত-দরবেশ-শিল্পী-সাধক আপ্তাবউদ্দিন খাঁ, চারন কবি গায়ক শ্রী মুকুন্দ দাস সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, মহা সঙ্গীতজ্ঞ কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পন্ডিত রবিশঙ্কর, সঙ্গীতাচার্য্য সত্য কিংকর বন্দোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশিল্পী সঙ্গীতার্য্য শ্রী তারাপদ চক্রবর্তী, কিংকর কণ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সঙ্গীত কবি ডঃ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পংকজ কুমার মল্লিক প্রমূখেরা ।

এহেন কলাচর্চা ব্যতীত প্রফুল্ল কুমার পারিবারিক সূত্রেও সঙ্গীতের অধিকার পেয়েছিলেন। পিতৃদেব রায়বাহাদুর প্রসন্ন কুমার অল ধ্রুপদ কীর্তন গাইতে পারতেন। অগ্রজ প্রতুল কুমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বেশ অগ্রসর হয়েছিলেন। তার এই আগ্রহে প্রফুল্ল কূমার

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ মরিস মিউজিক কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতে থাকেন।

প্রফুল্ল কুমারের অগনিত শিষ্য, শিষ্যা ও প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকেই সুনামের সঙ্গে সঙ্গীত চর্চা করে চলেছেন। এদের মধ্যে নিরোদ বরণ বড়ুয়াই নন আরও অনেকে বিখ্যাত হয়ে দেশ ও বিদেশে সঙ্গীতের বানী প্রচার করে চলেছেন। তাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত গায়ক বাদকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী পিনাকি প্রসাদ মূখোপাধ্যায়, শ্রী কিশোর ঘোষ , ভিষগা চার্য্য, শ্রী প্রধীর চন্দ্র দাসগুপ্ত।

শ্রী পিনাকি প্রসাদ জীবনের প্রথম বারেই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে কোলকাতায় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি আকাশবানীর একজন কৃতী শিল্পী হিসাবে সর্বজন পরিচিত এবং বহু সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সর্বজন নন্দিত হয়েছেন।

শ্রী মিহির লালা ও জয়ন্তী লালা

প্রফুল্ল কুমারের অন্যানা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শ্রী মিহির লালা ও জৈয়ন্তী লালা উচ্চ কুটির সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে চট্টগ্রামে যথাক্রমে আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপিঠের অধ্যক্ষের কর্মে নিযুক্ত থেকে বহু শিক্ষ্যর্থীর পথ নির্দেশ দিয়ে যাচেছন। এ ছাড়া শ্রীমতি মলিনা পাল সঙ্গীত বিশারদ হয়ে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং ডঃ শ্রী মতিছন্দা হাজরা, এম.এ ও উচ্চকুটির সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল দাস গুপ্ত চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সুরকার গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় গোপাল দাসগুপ্ত মশাই চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্র লাল দাস ওরফে ঠাকুরদার সহযোগী ছিলেন। ঠাকুরদা প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সঙ্গীত পর্তিষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে গোপাল দাসগুপ্ত মশাই কোলকাতায় এসে আকাশবানীর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তার মৃত্যুর পর প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ মশাই শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন- 'গোপাল দাসগুপ্ত একজন মহান সুরকারই ছিলেন না বাংলার রাগশ্রয়ী গানের প্রথম পথিকৃতদের অন্যতম বলেও বিবেচিত হবেন তিনি।

চট্টগ্রামের সাধারনের ভাষায় যেমন বহুবিধ ভাষার শব্দের প্রয়োগের নজির পাওয়া যায় তেমনি চট্টসংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বহু জাতির বহুভাষা ও রীতি নীতির মিলনের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মের সমন্বয়ের মতই সঙ্গীত চর্চাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির যে মেইল বন্ধন ঘটেছিল চট্টগ্রামে তার ছিল যথার্থই অনুকরণযোগ্য। বস্তুত বাংলাদেশের সঙ্গীত চর্চা বিশেযত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এমন এক পরিমন্ডল রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে ভাষা সংস্কৃতি ধর্মের সকল সংকীর্নতা তুচ্ছ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী

ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর রাজশাহীর সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে যে দু'টি সংগীত ধারার প্রবর্তন হয় তার একটি ধারার নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত সংগীত সাধক ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন।

১৯১৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হারান উদ্দিন ছিলেন একজন সৌখিন সেতারবাদক। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই সাধক ১৯২৭ সালে দশ বছর বয়সে সঙ্গীতের তালিম গ্রহন করেন, উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সেনী ঘরানার উল্টরসূরী খলিফা বদল খাঁর শিষ্য প্রফেসর নগেন দত্ত মহাশয়ের কাছে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৩২-৩৩ সালে এই সুর সাধক খলিফা বদল খাঁর একান্ত তত্ত্বাবধানে রাগ সঙ্গীতে তালিম নিতে শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি তবলায় তালিম নিতে শুরু করেন ওস্তাদ গোপাল প্রামানিকের কাছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নবদ্বীপ থেকে তিনি রাজশাহীতে চলে আসেন এবং এখানে এসে সঙ্গীত শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীতে ১৯৫৮ সালে **"সরবাণী সঙ্গীত বিদ্যালয়"** প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত **"কাকলী ললিতকলা একাডেমীতে"** প্রধান সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে আমৃত্যু

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রদের তিনি বলতেন "তোমরা ভাল শিল্পী হতে না পার ভাল শ্রোতা হও"।

১৯৭২ সালের ৬ই অক্টোবর রাজশাহী "সূর্যশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী" সংগীত সাধককে সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য সম্বর্ধনা দেয়। এবং ১৯৭৮ সালে রাজশাহীর 'উত্তরা সাহিত্য মজলিশ' এই মহান সুর সাধককে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করে। নিয়তির অমোঘ নির্দেশে ১৯৭৬ সালের ২রা জুলাই এই বরণীয় সংগীত গুরু পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান পরলোকে। রেখে যান তার কর্মজীবনের মহৎ ও অনুকরণীয় আদর্শ। যা এখনও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে।

পীর হোসেনীগঞ্জ গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম রওশান উদ্দিন আহমেদ খাঁন।

তাঁর ওস্তাদ ছিলেন ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন। দীর্ঘদিন তাঁর থেকে তালিম গ্রহন করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী।

ওস্তাদ অমরেশ রায় চৌধুরী

ওস্তাদ অমরেশ রায় চৌধুরী বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে এক অসাধারণ প্রতিভাধর। তাঁর পিতা স্বর্গীয় অবিনাশ রায় চৌধুরী তিনি ফরিদপুর জেলার চৌদ্দরশি গ্রামে ১৯২৮ সালের

Dhaka University Institutional Repository

১৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহন করেন। ওস্তাদজী পরবর্তীতে রাজশাহীতে চলে যান।

ঢাকার 'শুদ্ধসংগীত প্রসারগোষ্ঠী' নিযমিত মাসিক ও বাৎসরিক উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের আমন্ত্রন জানিয়ে থাকেন। এমনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনগুলিতে ওস্তাদ অমরেশ রায় চৌধুরীর পরিবেশনা দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত স্রোতাদের বিমুগ্ধ করে রাখত। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী।

এ প্রসংগে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী রবিউল হোসেনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা ও পরিবেশনা উল্লেখযোগ্য।

অতীন্দ্র নাথ গুপ্ত ভায়া

রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সঙ্গীত সাধনায় আত্ম-নিবেদিত প্রাণ প্রয়াত তবলাবাদক অতীন্দ্র নাথ গুপ্ত ভায়া। এই প্রয়াত তবলা সাধকের জন্ম ১৯২৮ সালে এবং মৃত্যু ১৯৯৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে।

মজলিশী মেজাজের অধিকারী অতীন্দ্র নাথের পিতা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ গুপ্ত ভায়ার কাছে তাঁর প্রথম তবলায় হাতেখড়ি ১৯৪০ সালে। ১৯৪৫ সালে ইস্টার্ন সিম্ফনী ক্লাবে ওস্তাদ ভবানী প্রসাদ রায় চৌধুরীর কাছে পদ্ধতিগত তালিম শুরু হয়। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ওস্তাদ যতীন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরীর কাছে নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন।

অতীন্দ্র নাথ গুপ্ত ভায়া ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলনে তবলা লহরা পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জণ করেন।

তবলার সঙ্গতকার হিসাবে গুপ্ত ভায়ার খ্যাতি কম ছিল না। কোলকাতার ওস্তাদ ওমর খাঁন (সরোদ), সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন এবং এদেশের গুণী ব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় ওস্তাদ হরিপদ দাস, ওস্তাদ চন্দ্রকান্ত সরকার, পন্ডিত রঘুনাথ দাস, শিবনাথ দাস প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের সংগে তবলার সঙ্গত করে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট

এই শ্রীভূমির উর্বর ভূমিতে জন্মলাভ করেই এদেশের অন্যতম মহত্তম সন্তান মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব একটি অন্ধকারময় যুগে তাঁর উদার মনুষ্যত্ববোধ, ধর্ম ও দর্শন চিন্তাদ্বারা চতুর্দিকে আলোকিত করে প্রকাশিত হয়েছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পরিবারস্থ সবাইকে নিয়ে শ্রীহট্ট থেকে নদীয়া জেলার মায়াপুরে চলে আসেন। মহাপ্রভুর জীবনদর্শনে কেবল বাণীপ্রচার ও জ্ঞান বিতরণের নিদর্শনই ছিল না, তিনি সক্রিয় সংগঠন-মাধ্যমে তাঁর নিজ বক্তব্য কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। মহাপ্রভুর কর্মকৃতি তৎকালীন সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নীরব বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। পেশীশক্তির সাহায্যে না নিয়ে কেবলমাত্র প্রেম অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তিনি যে সাম্যবাদ ও সমাজের হিতসাধনের এবং সংস্কারের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন তাকে কোনো অংশেই কোনো বিরাট বিপ্লবের চেয়ে কম বলা যায় না। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করতেন, তাঁর কর্মে তা প্রতিফলিত হত। তাঁর কথা "আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে" তা সব সমাজে সর্বকালে, সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

মহাপ্রভুর কন্ঠস্বর অতি সুললিত ছিল। এদ্ব্যতীত তিনি হরিসংকীর্তনের যে একটি নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তাঁর স্বকীয়তার ছাপ অতি পরিস্ফুট। এই ধরণের কীর্তনে ধ্রুপদ ও টপ্পার কাজ বেশ ভালোরকম প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি কোনো

Dhaka University Institutional Repository

ধ্রুপদীয়ার কাছে তালিম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু, তাঁর রচনায় ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রভাব খুবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথাবদ্ধ সংগীত শিক্ষা হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু তিনি যে ধ্রুপদের উদাত্ত আহ্বান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ও টপ্পার দানা কীর্তনের আসরে ব্যবহার করার উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সবই উচ্চকোটির সংগীত চিন্তার ফল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া তিনি তাঁর বৈপ্লবিক মতপ্রচারে সংগীতকে যে একটি অগ্রণী ভূমিকা প্রদান করেছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

ইংরেজ আমল অর্থাৎ প্রাক্ সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকেই শ্রীহট্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত সমাদৃত হতে থাকে। সাধারণত ঢাকা ও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে সংগীত গুণীরা শ্রীহট্টে কিছু ধনী গৃহকে কেন্দ্র করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচারকার্য শুরু করেন। কিছু জমিদার পরিবার এ বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। প্রখ্যাত সেনীয়া ধ্রুপদীয়া-রবাবীয়া ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ একবার ঢাকা থেকে শ্রীহট্টের একটি জমিদার গৃহে মুজরো করতে এসে তাঁর ভাগিনেয় ওস্তাদ আলতাফ্ আলী খাঁকে রেখে যান। খুব সম্ভবত তাঁরই শিক্ষাধীনে অবিভক্ত মাসুলিয়ার জমিদার নরেন্দ্রলাল দাসচৌধুরী ধ্রুপদ, ধামার ও টপ্পার চর্চা শুরু করেন। পরে অবশ্য তিনি পুর্ববাংলার প্রখ্যাত গায়ক বিপিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (তানরাজ) নিকটও শিক্ষালাভ করেন। এঁদের নিকট শিক্ষালাভ করে নরেন্দ্রলাল অতি সুকণ্ঠ গায়কে পরিণত হন। শ্রীহট্ট জেলার বাইরেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নরেন্দ্রলাল তবলার চর্চাও

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তিনি ঢাকার প্রখ্যাত তালাচার্য। প্রসন্ন বণিক মহাশয়ের কাছে তবলা শিক্ষালাভ করে অতি উত্তম তবলীয়াতে পরিণত হয়েছিলেন। ভালো বাজাতেও পারতেন। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে বেশি সময় নিয়োজিত করায় তবলার চর্চা অতটা করে উঠতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি হবিগঞ্জ নিবাসী শ্রীরামদেব সরকারকে তবলা শিক্ষা দিয়ে অতি উত্তম তবলীয়াতে পরিণত করেছিলেন। রামদেব নানা অনুষ্ঠানে সংগত করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। নরেন্দ্রলালের কণ্ঠসংগীতের ছাত্রদের মধ্যে পুত্র নীতেন্দ্রলাল ও খুড়তুতোভাই জ্ঞানেন্দ্রলাল উত্তম শিক্ষালাভ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মাসুলিয়ার জমিদার পরিবারের আরো অনেকে ভালো গাইতে পারতেন। মাসুলিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসারে অন্যান্য কিছু জমিদার পরিবারেও সংগীতের চর্চা সংক্রমিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীহট্টের কিছু জমিদার পরিবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা শুরু হলেও মৈমনসিংহ জেলার জমিদার পরিবারগুলি এই অনবদ্য শিল্পটির প্রচার ও প্রসারে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং যে পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন তা ঁএরা করেননি। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে উচ্চাঙ্গ সংগীত সচেতনতা প্রধানত মৈমনসিংহ জেলার জমিদারদেরই অবদান সে বিষয়ে শ্রীহট্টের জমিদাররা একটু উন্নাসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মতে সাধারণ লোকের জন্যে উচ্চাঙ্গ সংগীত নয়। তাঁদের ভাষায় 'হাজারি আর বাজারিদের' জন্যই এই বস্তু। অর্থাৎ রাজা মহারাজ ও ফকির নিম্নবিত্ত লোক ছাড়া এ জিনিস চর্চা করলে সিদ্ধাই কোনোদিন আসবে না। জমিদারগুলির মধ্যে মাসুলিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণডোরা, জলসুখা, সিলেট জমিদারবাড়ি (খাজাঞ্চিবাড়ি), কুমার গোপিকারঞ্জন রায় এস্টেট, করিমগঞ্জ এস্টেট, সুনামগঞ্জ, সুখাইর প্রভৃতি জমিদারীগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত উপরোক্ত মনোবৃত্তির জন্যেই শিক্ষিত সমাজে এই শিল্পটি এরকম অপাংক্তেয় ছিল। যাঁরা ব্যতিক্রম করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রচুর বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ব্রাহ্মণডোরার জমিদারবাড়ির শ্রীকরুণাকুমার (বেণীবাবু) চৌধুরী প্রসন্ন বণিকের কাছে তবলা শিক্ষা করে শ্রীহট্টে তবলার বহুল প্রচার করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকুমুদকুমার চৌধুরী (সাধুবাবু) বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্য মাখন চক্রবর্তী ধ্রুপদ, খেয়াল ও তৎসহ পাখোয়াজ বাজিয়ে হিসেবে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'ধল'-এর প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীবিশ্বনাথ রায় প্রসন্ন বণিকের কাছে তবলা শিখে সারা পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি বহু শিষ্য মাধ্যমে তবলার বহুল প্রচার করেন। বিখ্যাত তবলীয়া যোগেশ চক্রবর্তী তাঁরই একজন যোগ্য শিষ্য।

কুমদকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী নমিতা রায় তাঁরই কাছে খেয়াল, ঠুম্‌রিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভাতখন্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ও তাঁর নিকট উচ্চতর সংগীত শিক্ষালাভ করতে থাকেন। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠিত গায়িকা হিসেবে সাধনা করে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'ধল'-এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীবিশ্বনাথ ঢাকার প্রখ্যাত তালাচার্য প্রসন্ন বণিকের নিকট তবলা শিক্ষা করে ওই অঞ্চলে তবলা ও তালাধ্যায়ের বেশ ব্যাপক প্রচার করেছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমসাময়িককালের যন্ত্র শিল্পীদের মধ্যে হবিগঞ্জ শহরের শ্রীদীননাথ ধরচৌধুরী উত্তর সেতারবাদন শিক্ষালাভ করেছিলেন। পেশায় তিনি আইনজীবী হলেও সংগীত শিক্ষায় তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন। তাঁর সেতারবাদনের সঙ্গে বেণীবাবুর (করুণাকুমার চৌধুরী) তবলা সংগত উচ্চাঙ্গ সংগীত শ্রোতা মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। দীননাথ ধরচৌধুরী পুত্র ডাঃ বিনয়েন্দ্র ধরচৌধুরী খেয়াল ও ঠুম্‌রি চর্চা করে খ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বরচিত বাংলা খেয়াল ও রাগপ্রধান গান গেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অনেক রচনা বহু গায়কের কণ্ঠে গীত হয়েছে।

বঙ্গ বিভাগ পূর্ববর্তী সিলেট শহরের খেয়াল ও ঠুম্‌রি গানের প্রচার ও শিক্ষকতার ব্যাপারে কুমুদরঞ্জন গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সংগীত বিনোদ-সংগীতাচার্য শ্রীকুমুদরঞ্জন গোস্বামী। তিনি কেবল কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতেরই সাধনা করেননি। কঠোর সাধনায় কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বাদনেও নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। সাধারণত এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। একই লোক কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে

Dhaka University Institutional Repository

সমান পারদর্শী বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। কুমুদরঞ্জন একজন বিরল সাধক ছিলেন। প্রথম জীবনে উচ্চশিক্ষিত পরিবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি যে অনীহা তখনকার দিনে ছিল, তাঁকে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। শত বাধা তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালে। আদিনিবাস ঢাকার দক্ষিণ লক্ষণাবন্দ থেকে এই গোস্বামী পরিবার শ্রীহট্টে আসেন। গোস্বামী পরিবারে সংগীতের প্রতি বৈষ্ণবসুলভ শ্রদ্ধার অভাব না থাকলেও পারিপার্শ্বিক খুব একটা উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুকুল ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত বাধা তাঁকে পেতে হয়েছিল কিন্তু দৃঢ়চেতা কুমুদরঞ্জনকে তাঁর অভীষ্ট থেকে সরাতে পারেনি। তাঁর প্রাথমিক সংগীত শিক্ষা আরম্ভ হয় শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত সংগীতবিদ্ধান পন্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর নিকট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হয়ে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এবং সংগীতাচার্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বধানে ও শিক্ষাধীনে সাত বৎসরকাল রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা করেন। তারপর লখ্নৌতে বিখ্যাত সেতার বাদক উজির খাঁ-র নিকট কয়েকবৎসর সেতার শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি কলকাতার বিখ্যাত তবলাবাদক ডাব্বুবাবুর কাছে তবলা ও কলকাতায় অবস্থিত গোয়ালিয়রের বিখ্যাত ওস্তাদ মঙ্গীলালজির নিকট উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। এরপর গয়াতে গিয়ে তিনি সোনিজি মহারাজের নিকট হারমোনিয়াম ও পন্ডিত হনুমানদাসজির নিকট এসরাজ শিক্ষা লাভ করেন। মূলত কণ্ঠসংগীতজ্ঞ হলেও সেতার, এসরাজ, তবলা ও হারমোনিয়ামের তিনি একজন প্রকৃত শিল্পী বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এরও পরবর্তীকালে তিনি কিরানা

Dhaka University Institutional Repository

ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক পন্ডিত সুরেশবাবু খানের নিকট খেয়াল গান শিক্ষালাভ করে কিরানা ঘরানার ঐতিহ্য বহন করার যোগ্যতা লাভ করেন। তখন তাঁর গানের আঙ্গিক এবং উৎকর্ষতা এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪১ সালে কলকাতায় নিখিবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তাঁর সংগীত পরিবেশন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে সংগীত বিনোদ ও সংগীত বিশারদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীহট্ট শহরে পিতার নামে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠানটির নাম দেন 'গোবর্ধন সংগীত বিদ্যালয়।' এই প্রতিষ্ঠানকে সমগ্র আসামের প্রথম, প্রামাণ্য ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হত। তৎকালীন আসাম সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতি দিয়ে আর্থিক অনুদানও মঞ্জুর করেছিলেন। তাঁকে সংগীত বিনোদ উপাধি দান করেন আসাম সংস্কৃত বোর্ড। সিলেটের কালচারাল অ্যাসোশিয়েশন তাঁকে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে সিলেটে অনুষ্ঠিত ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন অধিরোহণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সংগীত পরিবেশনে সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সিলেটে তিনি "বর্ষামঙ্গল" উৎসব করান। সেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীঅরুণ নন্দী, শ্রীপ্রাণেশ দাস, শ্রীমতী কল্যাণী চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভাবতী সিংহমজুমদার, শ্রীমতী মাধুরী দেবী,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রমুখ তাঁর নেতৃত্বে সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সুষ্ঠু পরিচালনা ও অপূর্ব সংগীত পরিবেশনায় সর্বসাধারণ মুগ্ধ হন। দেশগৌরব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একবার তাঁর গানে অতি মুগ্ধ হয়ে পত্রদ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তৎকালীন প্রাকবিভাগ আসামের ও সিলেট শহরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি ও প্রসংশাসূচক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তাঁর সংগীত প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টার তুলনা করা যায়। একজন মহৎ সংগীতাচার্যের মতো তিনি সংগীতের শিক্ষা ও প্রচারকার্য চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সময়ে সিলেটে তথা আসামের অন্যান্য স্থানেও অতসংগীতের প্রচলন ছিল না। তিনিই প্রথম জনসমক্ষে ভারতীয় সংগীতের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করেন নিজ কণ্ঠসংগীতের মাধুর্য দ্বারা। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে অনেকেই সাধনা শুরু করেন। অগণিত ছাত্রছাত্রীদের তিনি সাংগীতিক জ্ঞান ও বিদ্যা দান করে কৃতবিদ্য গায়ক ও বাদকে পরিণত করেছেন। সিলেটে সর্বত্র কাছাড়, করিমগঞ্জ এমনকী বর্তমান বাংলাদেশেও বয়স্ক প্রাজ্ঞ সংগীতজ্ঞ তাঁর দীক্ষিত শিষ্য বর্তমান আছেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি সিলেট শহর ত্যাগকরে তৎকালীন আসামের রাজধানী শিলং শহরে স্থায়ীভাবে করতে থাকেন। সেখানকার রেডিও স্টেশনে দীর্ঘকাল চাকুরি করেন স্টাফ আর্টিস্ট ও সংগীত বিশেষজ্ঞ হিসেবে। শিলং শহর তখন উচ্চাঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতের একটি পীঠভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৈমনসিংহের মহাসংগীতজ্ঞ জমিদার দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তখন প্রতিবৎসর গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য সপরিবারে শিলং যেতেন। তখন তাঁদের সংগীত দরবার ইন্দ্রের সভায় পরিণত হত। সেসময় ওস্তাদ মতি মিঞা, ওস্তাদ ইয়ার রসুল খাঁ, (ফুলঝুরি), ওস্তাদ আয়েতালি খাঁ, ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ প্রমুখ সংগীতগুণীরা শিলং-এর আসর মাতিয়ে রাখতেন কিন্তু, কুমুদরঞ্জনের কণ্ঠসংগীতও সেখানে একই রকম সমাদৃত হত।

কুমুদরঞ্জনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুনাম অর্জন করেছিলেন ঁপ্রাণেশচন্দ্র দাস। তিনি কুমুদরঞ্জনের শিক্ষাগুণে এমনিই কৃতবিদ্য হয়েছিলেন যে সমগ্র আসামে তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর অন্যান্য প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী বীণাপাণি রায়চৌধুরী কণ্ঠসংগীতে বর্তমানে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। গুয়াহাটির বর্তমানে শ্রেষ্ঠা গায়িকা অতি সুকণ্ঠী শ্রীমতী মিত্রা ফুকন তাঁর কাছেই অনেকদূর শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি অন্য গুরুর নিকটও শিক্ষালাভ করেছেন। শ্রীমতী মিত্রা দূরদর্শন ও আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পীরূপে অতিখ্যাত হয়েছেন।

কুমুদরঞ্জনের সাংগীতিক ঐতিহ্য তাঁর পুত্ররাও পরবর্তী প্রজন্মের সভ্য-সভ্যাববৃন্দ অটুট রেখে সংগীতের সাধনা করে যাচ্ছেন। তাঁর পুত্র শ্রীইন্দুমাধব গোস্বমী তবলাবাদনে অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

পারদর্শী হয়েছিলেন। কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী কণ্ঠসংগীতে অত্যন্ত কৃতবিদ্য হয়ে শিলং রেডিও স্টেশন থেকে নিয়মিত তাঁর কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেছেন। পৌত্র কৌস্তুভ এই বয়সেই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে পরিগণিত হয়েছেন। তিনি বিশিষ্ট গুণী-শিল্পী পন্ডিত দীননাথ মিশ্রের নিকট শিক্ষরত।

দীর্ঘজীবনে তিনি বহু ছাত্রছাত্রীকে সংগীতের অন্তর্নিহিত বাণীর পথের সন্ধান দিয়ে সারা পুব-বাংলায় একজন সর্বাগ্রগণ্য-প্রাজ্ঞ সংগীতাচার্যের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে যে কেউ মুগ্ধ হয়ে ফেরত গিয়েছেন। সংগীত অন্ত-প্রাণ এই মহৎ সংগীতাচার্য শিলং শহরে ১৯৮০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী দেহরক্ষা করেন। শিলং-এর বঙ্গসমাজ ও তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী তাঁকে অশ্রুশিক্ত চোখে চিরবিদায় দিয়েছিলেন।

সিলেট শহরে নৃত্যশিল্পেরও যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল। সিলেটের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী শ্রবরদা দাসের অবদান এ বিষয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি ভারত বিখ্যাত নৃত্যবিদ ও নর্তনাচার্য শ্রীগোপাল পিল্লাইকে সিলেট অধিষ্ঠিত করিয়েছিলেন। যার ফলে সিলেট, শিলচর ও করিমগঞ্জে বহু উৎসাহী নৃত্যশিল্পী কত্থক, ভাতনাচ্যম, ও কথাকলি নৃত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে যে কয়েকটি পরিবার সংগীতচর্চা, সংগীত বিদ্যোৎসাহিতা ও সংগীত প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে খ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে সিলেট শহরের জমিদার নগেন্দ্র চৌধুরী, ওই শহরেরই অন্যতম জমিদার রাজা

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র কুমার গোপিকারমণ রায়, করিমগঞ্জেরে জমিদার রায় বাহাদুর রমণীমোহন দাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় কারণ তাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রসারের ব্যাপারে প্রচুর সময় ও অর্থব্যয় করেছেন।

সুনামগঞ্জ-সুখাইর-এর জমিদার জ্যোতিন্দ্র চৌধুরী, কলকাতার বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে (কেষ্টবাবু)-র নিকট দীর্ঘকাল ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুম্‌রি ও রাগপ্রধান গান শিক্ষা করেছিলেন। ঢাকাতেও তিনি ওস্তাদ মাহ্‌মুদ হোসেন খাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ও তাঁর তবলীয়া দ্বিজরাজ চৌধুরী বহু আসরে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুদ্ধ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় দীনেন্দ্র চৌধুরী ও রানা চৌধুরী পিতার কাছ থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু শ্রীহট্টে ও নিকটবর্তী জেলাসমূহে উচ্চপর্যায়ের অথচ অবহেলিত লোকসংগীতের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে উৎসাহী ও ব্রতী হওয়ায় তাঁরা লোকসংগীত শিল্পী হিসেবেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। সুনামগঞ্জ শহরের গায়ক শ্রীবিনোদ আচার্য খেয়াল ও ঠুম্‌রি গায়ক হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি কুমিল্লার প্রখ্যাত সংগীত গুণী ও গায়ক ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁর (খস্রু মিঞা) মন্ত্র শিষ্য হিসেবে তাঁর গায়কি বা আঙ্গিক আশ্চর্যরকম আয়ত্ত করেছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার মহকুমা শহর হবিগঞ্জ উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার ও প্রসার বিষয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। হবিগঞ্জের সুরেন্দ্র গোপ প্রাথমিক অবস্থায় কুমিল্লা, মৈমনসিংহ ও ঢাকায় শিক্ষালাভের পর কলকাতায় এসে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে খেয়াল, ঠুম্‌রি ও টপ্পা গানে বিশেষ পারদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। হবিগঞ্জে উচ্চাঙ্গ সংগীত জনপ্রিয় করার বিয়য়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী অনিল রায়, অধীরদেব, আইনজীবী শ্রীক্ষীরোদরঞ্জন রায়, রাকেশ বিশ্বাস, রঞ্জিৎ নাগ প্রমুখ ব্যক্তিরা। তৎকালীন ভারতের বহু বিখ্যাত গায়ক বাদকদের তাঁরা ওখানে মুজরো করে নিয়ে যেতেন এবং ওইভাবে ওখানকার সংগীতে রসিক ও সংগীত প্রেমিক শ্রোতাদের উৎসাহিত করতেন।

তৎকালীন শ্রীহট্টজেলার উচ্চাঙ্গ সংগীতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন প্রখ্যাত সংগীতগুণী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। সংগীত প্রচারের সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে আকৃষ্ট ও আগ্রহান্বিত হন এবং তৎকালীন তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজের সমস্ত-নিগ্রহ ও বাধা উপেক্ষা করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাঠ করতে ব্রতী হন। এই প্রেরণায় তিনি কুমিল্লা আসেন এবং তথায় অগ্নিযুগের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বসন্ত মজুমদার মশায়ের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে কারাবরণ করেন। ওই সময় স্বদেশী সভাসমিতিতে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের দেশাত্মবোধক- সংগীত যুবজনকে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করে তুলত। এই কারণেই বোধহয় তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা প্রফুল্লচন্দ্রকে দিয়ে সভাসমিতিতে গাওয়াতে চাইতেন। পুলিশি অত্যাচারে অতি সুগঠিত দেহ প্রফুল্লচন্দ্রেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটে কিন্তু কারাবাস কালে যে সংগীত শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে তিনি এতদিন বঞ্চিত ছিলেন তার সুযোগ মেলে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে অন্যতম রাজবন্দী ছিলেন বেনারসের বিখ্যাত গায়ক শ্রীশিউপ্রসাদ

Dhaka University Institutional Repository

শর্মাজি। তিনি শর্মাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠগ্রহণ করেন। কারামুক্তির পর তিনি শর্মাজির সঙ্গে কাশীধামে গমন করেন এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে বড়ে রামদাসজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের দুজনের সঙ্গে তিনি উত্তর ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন ও সংগীত পরিবেশন করেন। এই সূত্রে তিনি বহু গুণী গায়ক-বাদকের সঙ্গে পরিচিত ও নৈকট্যের সুযোগ পান। এভাবে তিনি ওইসব সংগীতগুণীর নিকট থেকে বহু উত্তম ‘চিজ’, বা সংগীত রচনা সংগ্রহ করার সুযোগ পান। কিছুকাল পর তিনি কলকাতায় এসে বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (কেষ্টবাবু)-র নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি প্রখ্যাত সংগীত গুণী ওস্তাদ মহম্মদ হোসের (খস্রু)-এর কাছে দীর্ঘকাল সংগীত শিক্ষালাভ করে অতি উচ্চশ্রেণীর সংগীত শিল্পীতে পরিণত হন।

পরবর্তীকালে প্রকৃত মিশনারি উৎসাহ নিয়ে তিনি সিলেট, শিলচর, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ শিলং প্রভৃতি শহরে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার করে বেড়িয়েছেন। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী আজকাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে তাঁর শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী অধীর দেব, শান্তি রায়চৌধুরী, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, বাণী চৌধুরী, মালা রায়, অরুণ দত্তরায়, আরতি চৌধুরী, পশুপতি ভট্টচার্য, সত্যব্রত রায়, রথীন রায় ক্ষীতিশ রায়, বাদল ধরচৌধুরী, সুধাংশু দেবরায়, পরমেশ ধর, শিখা রায়, সাবিত্রী রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানত উচ্চাঙ্গ খেয়াল ঠুম্‌রি ও ভজন গায়ক-শিল্পী হলেও প্রফুল্লচন্দ্র সংগীতের সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। বহু চলচ্চিত্রের তিনি সংগীত পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েক বৎসর মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির "রেকর্ডিং ইনচার্জ" হিসেবে কাজ করেছেন। মেগাফোনে ভারতবিখ্যাত সংগীতাচার্য শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে কর্মরত অবস্থায় তিনি সংগীতাচার্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁন, বেগম আখতার, কমলা ঝুরিয়া, হরিমতীদেবী প্রভৃতির রেকর্ড প্রকাশিত হয়ে সাধরণ্যে তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে।

প্রাক বঙ্গবিভাগ শিলং শহরে তৎকালীন বহু রাজা-জমিদারদের একটি করে গ্রীস্মবাস ছিল। তাঁদের কেন্দ্র করে বছরের একটা সময় তথায় কিছু উচ্চাঙ্গ সংগীত সংগীতগুণীর আবির্ভাব ঘটত। ওই রাজা-জমিদার বাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার মহাসংগীতজ্ঞ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মশায়দের শিলং শহরের 'লাইট মুখড়া' অঞ্চলের 'কেনিল ওয়ার্থ' নামক বাড়ি। গ্রীস্মাবকাশের সময় ওই গৃহ গন্ধর্বলোকে পরিণত হত। বহু উচ্চকোটির সংগীত শিল্পী মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে ওই সময় তাঁদের গৃহে গ্রীস্মাবকাশ যাপনের জন্য যেতেন ও কিছুদিন গ্রীস্মের দাবদাহমুক্ত ওই অঞ্চলে গিয়ে আনন্দে সংগীতচর্চার মধ্যে ডুবে যেতেন। তৎকালীন 'কেনিল ওয়ার্থে' ওইসব আসরের একটিও প্রফুল্লচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

বাদ দেননি। প্রতিদিন সকালবেলা তিনি ওখানে হাজির হতেন এবং ওই সব সংগীতগুণীর কাছ থেকে নানাধরণের 'চিজ' সংগ্রহ করতেন। অবশ্য মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসেবে তিনি সবাইয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই ওই সাংগীতিক প্রভাব শিলং শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ওপরও পড়েছিল। শিলং শহরের যন্ত্রসংগীত প্রচার বিষয়ে ওই শহরে অবস্থিত মোতি মিঞা, ইয়ার রসুল খাঁ, (রবীন্দ্ররাথ 'এর তবলাবাদনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ফুলঝুরি আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি ফুলঝুরি খাঁ নামে বিখ্যাত হন।) ওস্তাদ আয়েতালা খাঁ প্রমুখ সংগীতগুণীদের অবদান যথেষ্ট। এই শিলং শহরে প্রথম ভারতবিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রীবিষ্ণুগোবিন্দ যোগ ও পরে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে প্রখ্যাত বেহালাবাদিকা শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্র শ্রীমৃণাল সেন ও শ্রীমৃন্ময় ধর শিলং-এরই প্রখ্যাত বেহালাবাদক।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জের খেয়াল ও ঠুম্রি গায়ক শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য নিজে সুকণ্ঠ গায়ক হয়েও প্রচুর সংগীতানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। করিমগঞ্জের একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য মশায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উচ্চকোটির নজর রেখেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাঁর অনুরোধে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু খ্যাত নামা সংগীত শিল্পীকে করিমগঞ্জ নিয়ে যান। প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচালনায় সে-সব সংগীত অনুষ্ঠান স্থানীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতপ্রেমিক শ্রোতৃ সাধারণকে মুগ্ধ করে এবং এর ফলে করিমগঞ্জে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার বিষয়েও বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এইসব শিল্পীদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন-সর্বশ্রী নারায়ণ রাও যোশী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খাঁ (খস্রু), তারাপদ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, শচীনদাস মতিলাল ও বীরেশ রায় প্রমুখ শিল্পীরা। এছাড়া সংগীতের প্রচার বিষয়ে করিমগঞ্জের অমর ভট্টাচার্য, শুভেন্দু দাস, অনাদি দস্তিদার প্রমুখের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বেজুড়ার নন্দীবাড়ি, জগদীশপুরের দত্তচৌধুরীদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী রামকানাই দাস

বর্তমান সময়ে সিলেটের বসবাসরত উচ্চাঙ্গ সংঙ্গীত শিল্পী শ্রীরাম কানাই দাস বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী জগতে এক স্বনামধন্য শিল্পী। তিনি ১৩৪২ সালে সিলেটে জন্মগ্রহন করেন তাঁর পিতা স্বর্গীয় রসিক লাল দাস। তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র রায়। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তিনি নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করছেন এবং ঢাকায় নিয়মিত শুদ্ধসংগীত প্রসার গোষ্ঠীর মাসিক ও বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মেলনগূলিতেসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী রামকানাই দাস মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রী পিনু সেন দাস এক তরুন উদীয়মান তবলাবাদক। তিনি পন্ডিত শ্রী সমর সাহার (কলকাতা) কাছে তবলায় তালিম নিচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল

বরিশালে বহু মহৎ বঙ্গসন্তান জন্মগ্রহণ করে তাঁদের কর্মকৃতি দ্বারা সারা বাংলার সমস্যা ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে প্রাক বঙ্গবিভাগ বাংলার মুখ উজ্জল করেছিলেন। কেবলমাত্র স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসেবেই নয়, জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত মহাশয় থেকে শুরু করে ফজলুল হক ও মুকুন্দ দাস এবং মুকুন্দ দাস থেকে শুরু করে মহাস্বাধীনতা সংগ্রামী সতীন সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের কথায় সারা বাংলা জাতিধর্ম পেশা নির্বিশেষে এখনো মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। উপরোক্ত দেশপ্রেমিকদের ছাড়া আরো বহু দেশপ্রেমিকদের ত্যাগের কথা স্মরনযোগ্য। তাঁদের সকলের কথা বলতে গেলে একেবারে মহাভারত রচিত হয়ে যাবে। এই বরিশালে বিদ্যাচর্চার সমস্ত বিভাগে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অগ্রণী ভূমিকার মধ্যে সংগীতচর্চারও উচ্চ পর্যায়ের নিদর্শন ছিল।

বীণকার শ্রীবিষ্ণু ভট্টাচার্য

বরিশালের আদি মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বীনকার শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। তিনি সারস্বত বীণা বাজাতেন। সারা পূর্ববঙ্গে তিনি প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। বরিশালের তৎকালীন সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় তাঁর নাম নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কে তাঁর শিক্ষাগুরু তা জানা যায় না। তবে তাঁর বাদনশৈলী সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে

Dhaka University Institutional Repository

তিনিও বিষ্ণুপুরে অবস্থিত সেনীয়া রবাবীয়া কাশেম আলী খাঁর কাছেই হয়তো ধ্রুপদ ও বীণাবাদন শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর সন্ত-মহাপুরুষদের মতো সাত্ত্বিক জীবনযাপন এবং নারদ সদৃশ মহাসাধকের মতো আকৃতি-প্রকৃতি দেখে অনেকেই তাঁকে প্রেতসিদ্ধ-তন্ত্রসিদ্ধ আখ্যা দিয়েছিলেন এবং বহু অলৌকিক কহিনীর দ্বারা তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। বীণাবাদনে তাঁর দক্ষতার পরিচয় ছাড়াও তার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিণী ছিল এই যে তিনি নাকি আসরের আলো (তিনি বিশেষ করে হ্যারিকেনের আলোই ব্যবহার করতেন- পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদি নয়) খুব কমিয়ে দিয়ে বাজনার একটি পর্যায়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতেন যাতে করে মনে হত যেন তাঁর যন্ত্রের আওয়াজ একটা দুরাগত প্রতিধ্বনির মত শুনাচ্ছে। বহুদূর থেকে আগত তারযন্ত্রের আওয়াজ তিনি এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করে বাড়াতে কমাতে পারতেন যাতে শ্রোতা-সাধারণ মুগ্ধ বিস্ময়ে ভীতসন্ত্রস্তের মতো বসে থাকতেন। এ ব্যাপারটির জন্য শ্রোতারা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী উদ্ভাবন করে প্রচার করে বেড়াতেন। তিনি শৈব-আরাধক ছিলেন। তাঁর বাজনার সময় নাকি মহাদেরের দুই অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গীর আবির্ভাব ঘটত। তাঁরা দুজন নাকি বীণার সঙ্গে পাখোয়াজের সংগীতের তালে তালে নৃত্য করতেন। অনেকেই নাকি তা স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করতেন। এইসব অলৌকিক কাহিনী শিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু একথা অনুমেয় যে তিনি একজন অতি উচ্চ কোটির বীণকার ছিলেন। অনেক সময় তিনি রাগালাপ করে নিয়ে মিঞা তানসেন রচিত ধ্রুপদের বন্দীশগুলি

Dhaka University Institutional Repository

পাখোয়াজের সঙ্গে বাজাতেন। তিনি বিশেষ করে চারতুকের বন্দিশগুলিই এক অতীন্দ্রিয় লোকে যেন চলে যেতেন। বীণাতে সাধারণত যে তার ব্যবহার হয় তা না করে বেশ খানিকটা মোটা তার ব্যবহার করতেন এবং তার জন্য তাঁর বীনার আওয়াজ ছিল সাধারণ বীনার চেয়ে আরও ভারী ও গম্ভীর। বয়ঃবৃদ্ধ অনেক বরিশালবাসীর নিকট এখনও তার প্রায় অলৌকিক প্রতিভার নানা কাহিনী শোনা যায়।

সঙ্গীতাচার্য বিপিন চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতাচার্য বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের নাম বরিশালের কণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে ধরা যায়। তিনি তানরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং তার শিক্ষাধীনে থেকে বরিশাল এবং পূর্ববঙ্গের অনেক মহৎ কলাকারের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছিল। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ময়মনসিংহ প্রবাসী বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিত সেনগুপ্ত (ললিত কবিরাজ) মহাশয় ললিত সেনগুপ্ত বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতি বিজন বালা ঘোষ দস্তিদারের শিক্ষাগুর ছিলেন। তার পুত্ররাও সুগায়কে পরিণত হয়েছিলেন।

এসরাজ বাদক, ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক শ্রীযুক্ত শীতল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত খেয়ালীয়া তারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রী ঊষা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊষা রঞ্জনের পিতৃদেব শ্রীযুক্ত লাল মোহন গোস্বামীও তানরাজের শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়ে অতি উত্তম পর্যায়ের ধ্রুপদীয়া হিসাবে নাম করেছিলেন। তাঁকে সাধারণে লালু গোসাই বলা হত এবং এ নামেই তিনি বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তানরাজ মহাশয়ের সঙ্গীত শিক্ষা ঢাকা ও বিষ্ণুপুরে হয়েছিল। তিনি খেয়াল গায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তানরাজ পূর্ব বাংলার অনেক স্থানেই অনেক ছাত্র শিষ্য তৈরী করেছিলেন। বিশেষ করে ময়মনসিংহ জিলার সঙ্গীত প্রেমিক জমিদার পরিবারসমূহ ময়মনসিংহ রাজ ষ্টেট, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, কালিকাপুর, রামগোপালপুর প্রমুখ জমিদরীগুলির সঙ্গীত প্রেমিক- বিদ্যুৎশাহী জমিদাররা সর্বদাই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাই করে গিয়েছেন।

গৌরীপুর সঙ্গীত দরবারের প্রখ্যাত সঙ্গীত তাত্ত্বিক জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর মতে তানরাজ পদ্মার ওপারের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক হিসাবে বৃত হবার যোগ্য ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে কিছু তরুন কন্ঠসংগীত শিল্পী নিজ নিজ ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জণ করেছিলেন।

তারাপদ চক্রবর্তী

বিপিন চট্টপাধ্যায়ের (তানরাজ) অতি খ্যাত শিষ্য তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এ জন্যে যে সমসাময়িক কালে তাঁর মত সুকন্ঠ গায়ক প্রাক বিভাগ বঙ্গদেশে ছিলনা।

তানরাজ তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রান ঢেলে শিখিয়েছিলেন। এই শিক্ষালাভের জন্যই তারাপদ বাবু তাঁর ফরিদপুরে অবস্থিত নিজ গৃহে অবস্থান না করে বরিশাল শহরে

Dhaka University Institutional Repository

এসে থাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রাকবিভাগ বাংলার শ্রেষ্ঠ সংগীতাচার্য গীরিজাশংকর চক্রবর্তীর নিকট শিক্ষালাভ করে কৃতবিদ্য হন।

চট্টগ্রামে 'আর্যসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান' সংঙ্গীত মহাসম্মেলনে গান করে এবং পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদ, কানপুর ও কোলকাতায় কয়েকটি সঙ্গীত মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি ত্রিশের দশকে শেষ পাদেই সারা ভারতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক আবতাব-ই মৌসুকী ওস্তাজ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব একবার লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রশ্নকর্তা প্রিন্সিপ্যাল পন্ডিত এস এস রতন জনকারের প্রশ্নের উত্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, 'যদি আমাকে ভারতবর্ষের তিনজন শ্রেষ্ঠ খেয়ালীকে নির্বাচন করার ভার দেওয়া হয় তা হলে পশ্চিম বঙ্গের শ্রী তারাপদ চক্রবর্তী নিশ্চিত একজন হবেন। স্বয়ং ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মুখনিসৃত এই কথাটির পর কোন গায়কেরই আর বিশেষ কোন পরিচয়ের অবকাশ থাকে না। কিন্তু সারা জীবনেই তাকে কিছু ঈর্ষাপরায়ণ নিকৃষ্ট প্রতিদ্বন্দীর হীন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে। শেষ বয়সে দিল্লীর সংস্কৃত মূর্খ কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা ঘৃনাভরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ সহজে অনুমেয় তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের নাতির বয়সী ও গুণের দিক দিয়ে নখের যোগ্য নন এমন সমস্ত অবাঙ্গালী কন্ঠসঙ্গীত শিল্পী যখন তার যোগ্যতম সম্মান 'পদ্ম বিভূষন' পেয়ে গিয়েছেন। তখন তাঁকে অনেক নিচুস্তরের খেতাব 'পদ্মশ্রী' দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলো। এ একরকম অপমান করারই সামিল। দিল্লী কর্তাদের এ রকম সুয়োরানী ও দুয়োরানীর সুলভ মনেবৃত্তির কোন নজিরের অভাব নেই।

তারাপদ চক্রবর্তীর ব্যাপারে নয়াদিল্লীর কর্তাব্যক্তিরা যে দুর্ব্যবহার ও অসভ্য ব্যবহারের নজির রেখেছেন তা তুলনা মেলা ভার। তাঁর ন্যাশনাল প্রোগ্রামে গাওয়া আকাশবানীর অতি সফল দুটি রেকর্ডকে তিনি 'পদ্মশ্রী' নিতে অস্বীকার করার শাস্তি হিসাবে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ সন্তানের প্রতি সুয়োরানী-দুয়োরানী সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় দিল্লীর অবাঙ্গালী পদক নির্বাচক মেম্বার কমিটির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, তারা বলতে চান যে, 'তার নাকি হিন্দী ভাষার জ্ঞান ছিল না, তার নাকি কোন শিক্ষা বা তালিম ছিল না' এসবই পরবর্তীকালে অসার বলে প্রমানিত হয়েছে। এ মহাগায়ককে পরবর্তীকালে অনেক দুঃখ পেয়ে চলে যেতে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে কিছু নিকৃষ্ট বঙ্গ সন্তানও তার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। সজনশ্রীকাতর বঙ্গ সন্তানের অভাব কখনো ছিল না এখনও নাই। এ এক বিরাট জাতীয় কলঙ্ক সন্দেহ নেই।

লালমোহন মুখোপাধ্যায়

লালমোহন মুখোপাধ্যায় বিপিন চট্টপাধ্যায়ের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। লালু গোসাই নামে তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছিলেন। লালমোহন বিপিন চন্দ্রের শিক্ষাগুনে বেশ উঁচুদরের ধ্রুপদিয়াতে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত হয়েছিলেন। তিনি খেয়াল গানও উত্তমরুপেই গাইতে পারতেন। তার গৌরকান্তি চেহারা ও সাত্ত্বিকতার জন্যেই সাধারণ্যে তিনি লালূ গোসাই নামে পরিচিত হন।

ঊষা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লালমোহনের সুযোগ্য পুত্র পন্ডিত ঊষা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিজ পিতৃদেব লাল মোহনের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উচ্চ পর্যায়ের খেয়ালিয়াতে পরিণত হয়ে সারা ভারতে সুনাম অর্জণ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি ইন্দোরের প্রখ্যাত সনামধন্য খেয়ালিয়া ওস্তাদ আমির খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থানে কন্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করার দরুন তার খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্থির ধীর গায়নশৈলী সহজেই শ্রোতাদের মন জয় করে ফেলতো। তা ছাড়া তার সঙ্গীত চিন্তা ছিল অতি উচ্চ স্তরের। যে কোন রাগের 'রাগরুপ' কোথায় নির্ভর করে ও তার ব্যপ্তি কোনপথে গেলে হতে পারে এ বিষয়ে তার কোন পরীক্ষা নীরিক্ষার অন্ত ছিল না।

তিনি ছিলেন চব্বিশ ঘন্টার সঙ্গীতজ্ঞ অর্থাৎ তার জীবনে সঙ্গীত ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা যেন ছিলই না। সম্প্রতি তিনি বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। লালমোহন থেকে শুরু করে তার পারিবারিক সঙ্গীত চর্চা তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তার সুযোগ্য কন্যা ডাঃ কনিকা ভট্টাচার্য

Dhaka University Institutional Repository

সুগায়িকা- সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার অন্যান্য সন্তানেরাও অল্প বিস্তর সঙ্গীত চর্চা করে থাকেন।

এসরাজবাদক শ্রী শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার মহারাজ ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও এসরাজ শিক্ষক ছিলেন। শীতল চন্দ্রের বেশীরভাগ সময়ে কেটেছে কোলকাতায় গৌরীপুর দরবারের সাঙ্গীতিক কার্যকলাপে। এসরাজবাদক হিসাবে সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত এসরাজবাদক শ্রী কানাইলাল ঢেঁড়ী ও শ্রীচন্দ্রিকা প্রসাদ দূবেজির সঙ্গে অনেকে তাকে তুলনা করতেন। বিশেষভাবে রাগ রূপায়নে বা আলাপে তাঁর তুলনা ছিল না।

শ্রীমতি বীনাপানি মুখোপাধ্যায়

শ্রীশীতল মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি বীনাপানি মুখোপাধ্যায় সরাসরি শীতল মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে খেয়ালের তালিম নেন। ঐ সময়ে শ্রীমতি বীনাপানি বাংগালী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া বলে পরিচিত ছিলেন। বাংলার বাইরে বহু সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহর করেছেন। তার মধ্যে এলাহাবাদ, কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ. দিল্লী ইত্যাদি স্থানে তিনি গান গেয়ে বেশ প্রসংশিত হয়েছিলেন।

কোলকাতায় তিনি অল বেঙ্গল ও অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে অর্থাৎ তৎকালীন দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। হঠাৎ কোন পারিবারিক কারনে তার সাংগীতিক জীবনে ছেদ পড়ে যায়।

বরিশালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী পান্না লাল ঘোষ

শ্রী পান্না লাল ঘোষ দশের দশকে জন্মগ্রহন করেন। দীর্ঘ-ঋজূ ব্যায়্যামপুষ্ঠ দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। রাখালিয়া মেঠো বাঁশের বাঁশিতে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়েই যেন তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারই নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা গ্রহন- বর্জনের পথ ধরে বাঁশের বাঁশির ফোঁক ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কনসার্ট ইনস্ট্রুমেন্টে পরিনত হয়েছিল।

বাঁশির টোনাল কমপ্যাস বা স্বর পরিধি বাড়ানো এবং কোথায় ফুটো অথবা কি করলে কোন সাঙ্গীতিক অলংকারগুলো সুষ্ঠুভাবে বাঁশিতে বাজানো যেতে পারে তার জন্যে তার পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও প্রতিষ্ঠার কোন তুলনা ছিল না। তার প্রায় একক প্রচেষ্টাতেই বাঁশের বাঁশি রাগ সঙ্গীত পরিবেশনের সম্পূর্ন উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

বংশীবাদনের যে সমস্ত আংগিকের পদ্ধতি আজ অবধি চলছে সবই প্রায় তার অবদান বলা চলে। অনেকে বলে থাকেন তার পূর্ববর্তী বাগুরিয়া পাবনার জমিদার শ্রী গোপাল লাহিরী মহাশয়ের আঙ্গিক ও রূপরীতির তিনি অনুগামী ছিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মশাই বাজাতেন ক্ল্যারিওনেট- একটি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র যার টোনাল

Dhaka University Institutional Repository

কমপ্যাচ যান্ত্রিকভাবেই বর্ধিত ছিল এবং সেই কারনে বাজাবার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী ছিল।

ক্ল্যারিওনের যান্ত্রিক উন্নতি অনেক উঁচু দরের হওয়া সত্ত্বেও তা মেঠো রাখালিয়া বাঁশির মতো এত মধুর আওয়াজ সম্বলিত ছিলনা কারণ ক্ল্যারিওনেট একটি রিট ইনস্ট্রুমেন্ট।

বাঁশের বাঁশির মধুর আওয়াজের এমন একটি সকীয়তা মাধুর্য ও বৈশিষ্ট ছিল যে তাতে সবাই আকৃষ্ট হতেন। অকাল মৃত্যুর জন্য বোধ হয় গোপাল বাবু কোন পরম্পরা সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি অতবড় বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া স্বত্ত্বেও। গোপাল বাবু সঙ্গীতাচার্য বিশ্বদেব চট্টপাধ্যায়, কৃষ্ণ চন্দ্র দে প্রমুখ মহাগায়কদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছন। এত সত্ত্বেও ক্ল্যারিওনেট যন্ত্রটি আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসর থেকে সম্পূর্ন অবলুপ্ত বলে ধরা যায়। অপর পক্ষে পান্না লালের শিষ্য-প্রশিষ্যরা এটি কেবল ধরে রেখেছেন তা নয় এখনকার সময় সব নামী বাসুরিয়াই তার নির্দেশিত পথে তাঁরই আঙ্গিক নির্ভর করেই বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন।

বাঁশিতে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরী রীতির সঙ্গীত পরিবেশন করা ছাড়াও পান্না লালের অবদানের আর একটি দিক উল্লেখযোগ্য। তিনি কলকাতা থেকে বোম্বাই বর্তমানে মুম্বাই চলে গিয়ে সেখানকার ফিল্ম জগতের একজন দিকপাল হয়ে ওঠেন। স্বর্গীয় পান্না লাল বাবু ব্যক্তিগত জীবনেও অতি প্রগতিশীল ছিলেন। তার নিজের বিবাহের ব্যাপারে তিনি যে মানষিক দৃঢ়তার পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন তাতে তার সমাজ সচেতনতার দিক প্রকাশিত হয়েছিল।

ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় শ্রী সুনীল ঘোষ, পান্না লাল ঘোষ, শ্রী নিখিল ঘোষ সবাই সঙ্গীতজ্ঞ।

বরিশালে এ ধরনের পারিবারিক আরও নজির রয়েছে বেশ কয়েকটি পরিবারে কয়েক পুরুষানুক্রমে চর্চার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

সঙ্গীতজ্ঞ যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী

যতীন্দ্র মোহন কেবল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না তিনি বহু যন্ত্র বাজাতে পারতেন এবং নানা বাদ্যযন্ত্রের স্বর পরিধির বিস্তার, তাদের টোনাল কোয়ালিটি উন্নততর করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। বরিশালের প্রখ্যাত বিনকার শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রায়ই তার বরিশাল শহরস্থ গৃহে এসে অবস্থান করতেন। তার নির্দেশ মত তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ্যযন্ত্রাদির উপর করেছেন। তার পুত্র শ্রী অধীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী পারিবারিক চর্চা বজায় রেখে কোলকাতায় এসে ওস্তাদ এনায়েত খাঁ ও পরবর্তী কালে ওস্তাদ বেলায়েত খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেতার শিক্ষা করে বেশ কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত তবলা বাদক পরেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

তাঁর সময়কালে কোলকাতায় তার সমকক্ষ সঙ্গতীয়, তবলিয়া কেউ ছিলেন না। তখনকার দিনের মহৎ শিল্পীরা তবলিয়া-সঙ্গতিয়া হিসেবে তাকেই চাইতেন। তিনি যেকোন তালযন্ত্র, পাখোয়াজ, বাংলা ঢোল ও খোল সমান দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন।

তখনকার মহৎ কলাকারদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী এবং বহিরাগতদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা, ওস্তাদ এনায়েত খা, ওস্তাদ ছোটে খাঁ প্রমুখ সবাই তাকেই সঙ্গতিয়া হিসাবে চাইতেন। তৎকালীন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ খেয়ালিয়া আফতাব-ই-মৌসিকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ তার সঙ্গে গাইতে এতই ভালবাসতেন যে আসরে অন্য তবলিয়া উপস্থিত থাকলেও বলতেন 'আও ঠাকুর তুম ঠেকা লাগাও' পরেশ ঠাকুর নামেই তিনি সঙ্গীত মহলে খ্যাত ছিলেন।

তাঁর সাথসঙ্গত অতিবড় তবলিয়াকেও হার মানাতে পারতো। লয়চক্র যেন তিনি চোখে দেখতে পেতেন। তার পুত্র শ্রী নিমাই ভট্টাচার্য অত্যন্ত কৃতী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কেবল তাল বাদ্যই নয় কণ্ঠসঙ্গীতেও বেশ দক্ষ হয়েছিলেন।

গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের দশটি পুত্রের মধ্যে সবাই সঙ্গীতে কোন না কোন বিভাগের চর্চা করে পারিবারিক এমন নজির

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছিলেন যে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। এঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী অতুলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর, ভুবনেশ্বর, সিদ্ধেশ্ব, বীরেশ্বর, মনোজেশ্বর, সত্যেশ্বর, ও সম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ ও কাশিনাথ মুখোপাধ্যায়।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অতুলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত জগতের এক উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করছেন। তাঁর রাগাশ্রয়ী বাংলা গান বংগ সংন্তানদের ঘরে ঘরে গীত হয়েছে এবং হচেছ। এখনও নজরুল গীতি ও রাগাশ্রয়ী বাংলা গানে তার প্রভাব এ প্রজন্মের শিল্পীদের উপর বেশ ভালভাবেই প্রভাবন্বিত করেছে। সম্প্রতি তিনি অকালে পরলোক গমন করেছেন। তার এই অকাল মৃত্যুতে এই উপমহাদেশের একজন বাংগালী প্র্তিভাবান শিল্পীকে হারাতে হলো। এ ক্ষতি সঙ্গীত জগতে অপূরনীয়।

সঙ্গীতজ্ঞ এ মুখোপাধ্যায় পরিবারের অন্যতম খ্যাতনামা গায়ক

'শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়'

অতি শৈশবেই বরিশালে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় মহাত্মা গান্ধীজীকে বন্দে মাতরম সঙ্গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তার

Dhaka University Institutional Repository

দেশাত্ববোধক গান বহু স্বদেশ প্রেমিককে উৎসাহিত-অনুপ্রানিত করেছেন।

পরবর্তীতে তিনি কোলকাতায় এসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গুরু ছিলেন প্রখ্যাত জমির উদ্দিন খাঁ। সিদ্ধেশ্বর বাবু পরবর্তীকালে খেয়াল, ঠুমরী গানের চাইতে বাংলা গানের বিভিন্ন বিভাগের দিকে মনোনিবেশ করেন। তার খেয়ালিয়া ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ চন্দ্র অবশ্য পরবর্তীকালে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তালাচার্য শ্রী ক্ষিরোদ নট্ট মহাশয়

বরিশালের তালাচার্য শ্রী ক্ষিরোদ নট্ট মহাশয় তার বাংলা ঢোল ও ঢাকের বাদ্যে সারা প্রাক বিভাগ বাংলাকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। দেশ বিভাগের পরও তিনি কলকাতায় এসে কয়েকটি সঙ্গীত মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তার বাদন শৈলী ও নিপুনতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন।

বিশ্বনন্দীত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী সত্যজিৎ রায় তাঁর কয়েকটি চলচ্চিত্রে নট্ট মহাশয়ের ঢাকের বাদ্য ব্যবহার করেছেন। ‘ঢাকের বাদ্য থামলে মিঠে’ একথাকে তিনি অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যে প্রমানিত করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে শুনলেও তার বাজনা একঘেয়েতো লাগতো না বরং বিভিন্ন ছন্দের দোলা মনে লেগে থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

নট্ট কোম্পানীর যাত্রার গান, এ গান শুনে যে কোন মানুষের চোখে জল আসতো। সে ক্ষেত্রে চারন কবি মুকুন্দ দাসের যাত্রা গানের কোন তুলনা ছিল না। যাত্রা গানে রাগের ব্যবহার ছিল। যা উপস্থিত দর্শকদের আকর্ষণ করতো।

শ্রী দীলিপ মুখোপাধ্যায়

অবিস্মরনীয় সঙ্গীতার্য কণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী তারাপদ চক্রবর্তীর প্রিয় শিষ্যরূপে তিনি দীর্ঘ আঠার বৎসর আচার্য দেবের শিক্ষাধীনে থেকে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। তার প্রতিষ্ঠিত ‘সুর ভারতী সঙ্গীত চক্র’ দীর্ঘদিন ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সেবা করে চলেছে।

গঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে দীলিপ কুমার তার শিক্ষা গুরুর মতই গোড়াপন্থী। তিনি তার গায়কী একেবারে তার গুরুর গায়কীর ছবিকে সামনে রেখে করে থাকেন।

সর্বশেষে নট্ট পরিবারের উল্লেখ্য শ্রী পতিত পাবন নট্ট মহাশয়ের আলোচনায় তার বাবা বিখ্যাত হিরন নট্ট (তাল যন্ত্র বাদক) সহ একটি সাক্ষাৎকার দেয়া গেল।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে বরেণ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার ওডিও ধারনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বসবাসরত স্বনামধন্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী, পৃষ্ঠপোষকও উল্লেখযোগ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সাথে 'বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চা' (১৮৫০-১৯৯০) শিরোনামে সাক্ষাৎকার সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

ওস্তাদ বারীন মজুমদার

সামন্ত নকশায় প্রয়াত ফজলুর রহমান খাঁন, ভাস্কর্যে নভেরা, চিত্রাঙ্কনে এস.এম.সুলতান, অভিনয়ে অমলেন্দু বিশ্বাস শিক্ষায় আরজু আলী মাতব্বর, সাহিত্যে সেকেন্দার আবু জাফর শুধু যে অভিধায় অভিসিক্ত তাঁরা শুধু তা ছিলেন না, দেশ প্রেম, সমাজ সচেতনতা, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং কমিটেড অবদানে আমাদের দেশের জন্য এক একজন মহামানব ছিলেন। ঠিক তেমনি বারীন মজুমদারও তাই।

বারীনদার আসল নাম বারীন্দ্র নাথ মজুমদার। সহধর্মিনী ইলা মজুমদার। এক সন্তান মধুমিতা মজুমদারকে দিয়ে পেয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা। তনয়দ্বয় পার্থ মজুমদার ও সুভাশীষ মজুমদার বর্তমানে সঙ্গীত নিয়ে কাজ করছেন।

সামন্ত যুগীয় পারিবারিক পরিবেশ পেয়ে সঙ্গীতে সখের বশে হাতেখড়ি, তারপর নেশা। রাজা নবাব আলী চৌধুরীর লক্ষ্ণৌ 'মুরিস কলেজে' ভর্তি। রুমমেট পেলেন শ্রদ্ধেয় পন্ডিত চিন্ময় লাহিড়ী, পন্ডিত সুনীল বোস, গানের বাড়ী পেলেন পন্ডিত ধ্রুবতারা যোশীর। বারীন মজুমদারের তিনি ছিলেন ছুনুদা। সেখানে সবার সাথে গান শুনতে যেতেন। ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ, ওস্তাদ বুন্দু খাঁ, ওস্তাদ মুসতাক আলী খাঁ, ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ এবং রংগীলা ঘরানার আফতাবে মৌসিকি খাঁন সাহেব ফৈয়াজ খাঁনের মত সঙ্গীত গুণীর সান্নিধ্য পেলেন।

পন্ডিত ভাতখন্ডের সুযোগ্য ছাত্র রতনজনকরের তালিম পেলেও 'প্রেম প্রিয়া' ফৈয়াজ খাঁনের প্রসাদ গুণে তার ছুনুদা (ডি.টি. যোশী) যেমন হয় ওঠেন প্রেমরঙ্গ, তেমনি বারীনদাও ধীরে ধীরে রঙ্গিলা ঘরানার ভাবশিষ্য হয়ে যান।

এ ঘরের তরীকা, ফান্দা, বন্দীশ, সারগাম, তান, গায়কী, সর্বোপরি খড়জে সুর লাগানো 'মুরিস কলেজে' নানা ঘারানার বন্দীশের মাঝে অন্যতম স্থান করে নেয় বারীন মজুমদারের গায়কীতে। সহযোগিতা করেন চীন্ময় লাহিড়ী, ও ঢাকা রেডিওর স্টেশন পরিচালক সুনীল বোস বারীন দা হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে পন্ডিত বারীন্দ্র নাথ মজুমদার।

ডিগ্রী বিশারদের চেয়ে সঙ্গীতের বিশারদ হয়ে ওঠেন তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

মোঘলদের রাজধানী ঢাকা ১৬১০ সালে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সঙ্গীত প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা সর্বজনবিদিত। তবলা ও সেতারের ঢাকা, ধ্রুপদ- ধামারে ঢাকা, কেশব ব্যানার্জীর ঢাকা, রমজান আলীর পাঞ্জাবী রওশন খাঁন, সেতারী ভগবান দাস, তবলিয়া প্রসন্ন কুমার বনিক, টপ্পাবাজ হাবিব মিয়া, খসরু মিয়া, হরিচরণ দাস, গোপী মোহন, হরিমোহন, সর্বজন বিশারদ হৃদয় নাথের ঢাকা, ঢাকায় গানের বাড়ী, তৎকালীন আজাদ সিনেমা হল, জয়দেবপুরের জমিদার বাড়ী, রুপচান লালের জলসা ঘর, শাঁখারি পট্টির আড্ডার শহর ঢাকা- সেই ঢাকায় ১৯৫৭ সালে গাইলেন বারীন মজুমদার। রিয়াজি কণ্ঠ, আগুনের হলকার মত স্বপাঠ, স্থির ও সুরেলা শ্রুতিতে খরজ লাগিয়ে পূনঃরায় ঢাকার সঙ্গীত মহলে হৈচৈ ফেলে দিলেন বারীন দা।

অনেকেই ঈর্শান্বিত হলেন, অনেকেই মুগ্ধ হলেন। সেই সুবাদে ললিতকলা একাডেমীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান হিসেবে যোগদান। কিন্তু বাফা ছেড়ে স্থির করলেন পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়ে নিজেই লক্ষ্ণৌর মতো একটা কিছু করবেন। সাথে ছিলেন সর্বং সহা বন্ধু ও সারগীত শ্রীমতি ইলা মজুমদার। চল্‌ল নতুন পথে হাঁটা। কখন তৈরী হবে ছাত্র, কখন করবেন রেয়াজ।

১৯৬৩ সাল থেকেই চলল কলেজ গড়ার সাধনা। সিলেবাস করলেন অনেক আপোষ করতে হলো সিলেবাস করতে। যাতে নিজ ইচছার বিরুদ্ধেই অনেক ক্রুটি ছিল। সঙ্গীত একাডেমী খুললেন যাতে লেখাপড়া কম হলেও সঙ্গীত শিখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্টিফিকেট কোর্স, শিক্ষক হিসেবে এলেন ওস্তাদ মনজুর হোসেন খাঁন (কন্ঠ), ওস্তাদ মীর কাশেম খাঁন (সেতার), ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁন (সেতার), ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁন (সরোদ), ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খাঁন (তবলা), ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি (তবলা)। নজরুল সঙ্গীতে শেখ লুৎফর রহমান, পল্লী গীতিতে আবদুল আলীম, সঙ্গীত তত্ত্ব ও ইতিহাসে আ.ক.ম. মুজতবা এবং বেহালায় হেমায়েত উদ্দীন (বড়দা)। এর মত সব স্বনামখ্যাত সঙ্গীত পন্ডিত ও গুণীগন।

প্রথম প্রথম নৈশকালীন ক্লাশ হত কাকরাইলের মনোয়ারা শিশুবাগে। সহযোগিতার হাত বাড়ালেন সাংবাদিক পাবনার আবদুল মতিন এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রী প্রয়াত এ.টি.এম.মোস্তফা। বহু ত্যাগ শ্রম ও পৃষ্ঠপোষকতায় সারা পাকিস্তানের বৈরী পরিবেশে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, সেগুন বাগিচার নতুন বাড়ীতে এল। পরবর্তীতে 'কলেজ অব মিউজিক' নামে স্থানান্তরিত হয়ে চলে গেল মীরপুরের কাফরুলে। উল্লেখ্য যে, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র বড়দায় যথাক্রমে মরিশ মিউজিক কলেজ, ভাতখন্ডের বিদ্যাপিঠ, মাধব সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও বরদা মিউজিক কলেজ ওপারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ১৯২৫ সালে ঠাকুরদা সুরেন্দ্র দাস 'আর্য্য সংঙ্গীত সমিতি' গঠন করেন।

'কলেজ অব মিউজিক' নামটিতে কেউ কেউ বিরোধিতা করেন। কিন্তু নামটি রাখার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব ভারত, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। তাতে করে বাঙ্গালীর

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি কমে যায়নি। আলোচনার সাপেক্ষে দেখা যায়, এ উপমহাদেশে সঙ্গীত সম্মেলন করেন ১৯১৬ সালের বরোদার মহারাজা। পরবর্তীকালে দিল্লী, বেনারস, লক্ষ্ণৌ এলাকায় সম্মেলন হতে শুরু করে। পন্ডিত ভাতখন্ডে এই সঙ্গীত সম্মেলনের পথিকৃৎ।

বাংলাদেশে নাটোর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহের ভবানীপুর, মুক্তাগাছা, গৌরীপুরের মহারাজাগণ এবং কোলকাতা ও ঢাকার ধনাঢ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সালে গুলিস্তান সিনেমা হলে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন সহ অনেককে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল।

সেই রাজা মহারাজার ভক্ত নিয়ে বারীন মজুমদার ১৯৬৯ সালে প্রথম 'নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন' সংগঠিত করেন।

তাঁর ডাকে সারা দিয়েছিলেন যাহারা তাঁরা হলেন - ওস্তাদ আমানত আলী খাঁন, ওস্তাদ সালামত আলী খাঁন, ওস্তাদ নাজাকাত আলী খাঁন, ফরিদা খানম, মেহেদী হাসান কন্ঠ সঙ্গীতে, ওস্তাদ নাথু খাঁন সারেঙ্গীতে, ওস্তাদ মীর কাশেম খাঁন সেতারে, ওস্তাদ মনজুর হোসেন খাঁন জলতরঙ্গে, ওস্তাদ শওকত হোসেন খাঁন তবলা লহড়ায়, ইকবাল হোসেন বেহালায়, অংশ গ্রহন করেন।

এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত সন্ধ্যে ৭টা থেকে কারিগরি মিলনায়তনে সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠান চলেছে। ওস্তাদ

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন খাঁ ১৯৭২ সালে সঙ্গীত সম্মেলন করেন। অংশগ্রহনে শিল্পীগণ ছিলেন শরোন রানী মাথুর (সরোদ), মায়া চ্যাটার্জী (কথ্যক নৃত্য) সহ অনেকেই। এটাও তিনদিনব্যাপী হয়েছিল। ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি (তবলা) দুই একটি সম্মেলন করেছেন তবলা শিক্ষালয় থেকে।

১৯৮৬ সালে পূনঃরায় পুরানো ভাবনা নিয়ে 'মনিহার সঙ্গীত একাডেমী' আর একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। ভাতখন্ডের সঙ্গীত বিদ্যাপিঠের পাঠ্য সূচী অনুযায়ী তালিম শুরু করেন নিজের বাসায়।

বারীন মজুমদারের কাছে যারা তালিম নিয়ে বাংলাদেশে যারা স্বনামধন্য শিল্পীর খ্যাতি লাভ করেন তারা হলেন সমীর কুমার দাস, নিতাই রায়, সৈয়দ হাসনা বেগম, প্রয়াত তরুন রায়, খুরশীদ আলম, মোতাহার হোসেন, সেখ সাদী, ইয়াকুব আলী খাঁন, ডালিয়া নওসিন, সাদী খাঁন, সতীন্দ্র হালদার, আবিদা সুলতানা, লতিফা হেলেন, বুলবুল মহলা নবীশ সহ অনেকেই।

সৌম্য দর্শন, দীর্ঘদেহী অমায়িক মার্জিত, মিষ্টি সুরেলা, বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী ওস্তাদ বারীন মজুমদার আজ শয্যাশায়ী। তিনি বর্তমান গনমাধ্যম রেডিও, টিভিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের ত্রুটিপূর্ণ ভূমিকার জন্য মর্মাহত। তিনি বলেন এদেশে এখনো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করার ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। কেননা শ্রোতা তৈরীর দিক থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বহু পিঁছিয়ে। বারীনদার জন্মকাল মূলতঃ ১৯১৯ সাল। সনদপত্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ১৯২১ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে শ্রদ্ধেয় বারীনদার সুস্থতায় ফিরে আসুক বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ।

ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি (তবলাবাদক)

বাংলাদেশের বরেন্য ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি সাহেবের সাথে বাংলাদেশে 'রাগ সঙ্গীত চর্চা' (১৮৫০-১৯৯০) তথ্য জানার জন্য অনুরোধ করলে ওস্তাদজী নিম্ন তথ্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনি সাহেবের বক্তব্য অনুসারেঃ

'১৮৫০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা বা অবস্থান আমার সব জানা সম্ভব নয়। তবে ১৯২৭ সালে জন্মের ১৫ বা ১৬ বছর বাদ দিয়ে যতটুকু সম্ভব তার ভিত্তিতে বলা যায়। সত্যি কথা বলতে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' ছাড়া বাংলার মুলুকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কোন প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল না'।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মনবাড়িয়ার মরহুম ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তানসেন বংশের ওস্তাদ উজির খাঁ সাহেবের কাছ থেকে 'সরোদ এবং সঙ্গীতে' তালিম নিয়ে সেনী ঘরানার পান্ডিত্য লাভ করেন।

বর্তমানে যন্ত্র সঙ্গীতে যেটুকু প্রচলন আছে তার সবটুকু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বংশের।

তবলার প্রসঙ্গে বরিশালের হিরন নট্ট যা 'নট্ট কোম্পানী' নামে বিখ্যাত। বরিশালের অন্তর্গত ঝালকাঠীর হিরন নট্ট মহাশয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

আনখি লাল মিছিরের নিকট তালিম গ্রহন করে বিখ্যাত তবলা বাদকের খ্যাতি পান। মুড়াপাড়ার জমিদার রায়বাহাদুর কেশব চন্দ্র ব্যানার্জী, ঢাকার প্রসন্ন কুমার বনিকের নিকট এবং পরবর্তীতে দিল্লীর মোঘল সভাবাদক ওস্তাদ নাথু খানের নিকট তালিম গ্রহন করেন।

ওস্তাদজী মনি সাহেব ১৯৪২ সালে রায়বাহাদুর কেশব ব্যানার্জীর তবলা বাদন শোনার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৬০ সালে লালকুঠিতে এ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল।

ওস্তাদ সাখাওয়াত হোসেন খাঁ সাহেবের সাথে, ভাওয়ালের অধীপতির কাছে তবলা সঙ্গত করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। অন্যান্য তখনকার তবলা ও পাখোয়াজে প্রসন্ন কুমার বনিক, গোপাল দত্ত এবং নবাবপুরে বসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তবলা ও পাখোয়োজ বাদক ছিল। তখনকার সময়ে জমিদারর অবস্থাপন্ন লোকেরাই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মুক্তাগাছা রাজ পরিবার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যারা ছিলেন উপমহাদেশের এমন কোন গুনী ওস্তাদ, খাঁ সাহেব, গায়ক, বাদক ছিলেন না যে মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে আসেন নাই।

গৌরীপুরের মহারাজা, এখনও তদ্রুপ জ্ঞানীগুনীজন আসতেন। উল্লেখ্য বিখ্যাত সেতারী ওস্তাদ এনায়েত খাঁ সাহেব দীর্ঘ দিন গৌরীপুর অবস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহীতে জমিদার রায় বাহাদুর ধীরেন মৈত্র সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন। তাঁর আমলে 'আষাঢ়ের ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিল এবং পাক্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠান হত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাধিকা মোহন মৈত্র উপমহাদেশে সরোদ বাদক হিসেবে পরিচিতি পান।

দেশ বিভাগের পর রাজশাহীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাঁচিয়ে রেখে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন হরিপদ দাস (খেয়াল)। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর বাড়ীতে দৈনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। সেখানে তৎকালীন বিখ্যাত সেতার বাদক স্বর্গীয় লক্ষ্মী কান্ত দে, বিখ্যাত বেহালা বদক রঘুনাথ দাস, তবলা বাদক অতীন্দ্র নাথ গুপ্ত, হরিপদ বাবুর সুযোগ্য ছাত্র জব্বার সাহেব স্বনামধ্যন্য খেয়াল গায়ক ছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। ১৯৪৮ সালে শ্রদ্ধেয় শৈলেশ সন্যালের সাথে রাজশাহীতে হরিপদ বাবুর বাসায় যাওয়ার সৌভাগ্য ওস্তাদজীর হয়েছে।

১৯৭৩ সালে ওস্তাদ বারীন মজুমদার আয়োজিত 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সম্মেলন' হরিবাবু ও তার ছাত্র জব্বার সাহেব গান করেন। পরে ১৯৮০/৮২ সাল পর্যন্ত ওস্তাদজীর চাকুরীর শেষ জীবন রাজশাহীতে কাটে।

বর্তমানে রাজশাহীতে অমরেশ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখ্য। দেশ বিভাগের পর ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন সাহেব নদীয়া (পশ্চিম বঙ্গ) থেকে রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং অনেক ছাত্র তৈরী করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

আজিজ বাচ্চু উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তার পুত্র রবিউল হোসেন একজন প্রতিভাবানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী এবং 'হিন্দু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের দিক থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে চট্টগ্রাম সবার উর্ধে। তাছাড়া চট্টগ্রামের 'আর্য্য সঙ্গীত' প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে মিহির লালা এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। চট্টগ্রামে যে সকল সাংস্কৃতিক প্র্তিষ্ঠান আছে সেগুলো হলো- 'বাংলাদেশ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' পরিচালক শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া, অগ্রনী সংঘ 'পরিচালক মিহির নন্দী' 'আলাউদ্দিন ললিতকলা একাডেমী' প্র্তিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রুনু বিশ্বাস। 'প্রবর্তক প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রিয়দা রঞ্জন', সঙ্গীত পরিষদ সুর নিকেতন ছাড়া আরও সঙ্গীত প্র্তিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

পাবনায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাবনা রাধানগরের মজুমদার পরিবারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান বারীন মজুমদার সর্বজন বিদিত।

মজুমদার বাড়ীতে আজও একটি মঠ আছে। তার পাশে সুদৃশ্য নাট মন্দির এবং নানা যন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ। বারীনদার বাবা একজন সু-অভিনেতা ছিলেন। তবলা, পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন।

পাবনায় বারীনদার বন্ধুবর গোপাল জোয়ারদার হারমোনিয়াম বাদনে দক্ষ ছিলেন ও নিত্যগোপাল জোয়ারদার ফৈয়াজ খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধেন। পাবনার আর একজন ওস্তাদ নারায়ন চন্দ্র বসাক, তবলা বাদক ছিনেল ধীরেন মৈত্র ও শৈলেশ সন্যাল। তাছাড়া শতু সান্যাল জমির উদ্দিন খাঁ সাহেবের সাগরেদ ছিলেন। সেতার বাদক কালু লাহিড়ী ১৯৪০ থেকে ৫২ সাল তিনি ওস্তাদ আলী আহম্মদ খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

সিলেটের ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ খাঁ ছিলেন গুনী একজন স্বনামধন্য ওস্তাদ।

শিল্পকলা একাডেমীতে উচ্চতর প্রশিক্ষন কোর্স ১৯৮১-১৯৮৪ সালে ওস্তাদজী তাল ছন্দের ক্লাশ নিতেন।

ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনির জন্ম হল ১৯২৭ সালে শাহাজাদপুরে। তার পিতা ছিলেন বৃটিশ ভারতের প্রথম সারির এজকজন ম্যাজিষ্ট্রেট। পরিবারে তিন ভাই ও ছয় বোন। তিনি পিতা মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

পাবনার সুধীর কুমার সাহার কাছে কামরুজ্জামান মনির কাছে তবলার তালিম নেন। তাঁর সঙ্গতের দিক থেকে যে লয় জ্ঞান কিভাবে পরিমিত ও সামঞ্জস্যবোধে তবলার সঙ্গত করতে হয় এ প্রসঙ্গে তালিম পান ; বারীন মজুমদারের কাছে এবং ঢাকায় মরহুম আবদুল গফুর খাঁন এবং খাজা গোলাম মোস্তফার নামও উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ সালে ভারতের বিখ্যাত গুনী ওস্তাদ শওকত খাঁন কাদবীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ কামরুজ্জামান মনির বহুদিনের আসার ফসল হল 'তবলা শিক্ষালয়'। ১৯৭২ সালে যার প্রতিষ্ঠা করেন মৌচাকের গোসাই বাড়ীতে।

এ তবলা শিক্ষালয়ের গুরুত্ব অনেক। কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকার কিছু ছাত্র ছাত্রী তবলা শিক্ষালয় থেকে তালিম নেন।

বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহু সনামধন্য তবলা বাদক আছেন। যারা সরাসরি কামরুজ্জামান মনি স্যারের কাছে তবলা শিক্ষালয়ের মাধ্যমে তালিম নেন।

ওস্তাদজী সঙ্গীত শিক্ষা প্রারম্ভেই তবলার গুরুত্ব আরোপ করেন। 'সুর-তাল-লয়' সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল।

তবল বা অতবল শব্দটি অরবী। প্রাচীনকালে আরব দেশে প্রচলন ছিল। কথিত আছে 'জুবল এর পুত্র তুবল' কর্তৃক যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়।

সম্রাট আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে (১২৯৫-১৩১৬ খৃঃ) হযরত আমীর খসরু তবলার সাজ দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন।

তবলার প্রাথমিক অবস্থায় সর্ব সমেত ৫৮৬টি বোল ছিল। তবলার আদি বোল থেকেই সেতার, সরোদ, বীন ও রবাব যন্ত্রের বানী গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে তবলার ১০টি মাত্র বানী বা বর্ণ প্রচলিত। উপমাহাদেশীয় যাবতীয় সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরুহ। কঠিন সাধনা ব্যতীত একে আয়ত্ব করা সহজ নয়।

মোটামুটিভাবে তিনি উপরের আলোচনাগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশের 'রাগসঙ্গীত চর্চা' (১৮৫০- ১৯৯০) উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী
সম্পাদক শফিউর রহমান

প্রাচীনকাল থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীন বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত চর্চা ও পরিবেশনার দিক থেকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাজা-রাজরা, জমিদার ও ধনী শ্রেণীর কিছু ধনবানদের কথা সঙ্গীত ইতিহাসে দেখা যায়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের অবস্থা প্রতিকূলে চলে যায়। শিল্পীরা সাধারণ শ্রোতাদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর হয়ে পড়েন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা আর্থিক সংকটের সমস্যায় জড়িত হওয়ায় সঙ্গীত সাধনা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম দেওয়া এবং পরিবেশনার ক্ষেত্রে বিরাট বাঁধাগ্রস্থ হন। এমনি সময়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত সাধনা, পরিবেশনা ও প্রচার-প্রসার লক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

'শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠন পৃষ্ঠপোষকতার দায়ীত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন। এ সংগঠনের সম্পাদক হলেন সংগীত প্রেমিক সর্বজন শ্রদ্ধেয় সফিউর রহমান। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ওস্তাদ জাকির হোসেন।

সফিউর রহমান ১৯৫০ সালে ঢাকাতে এসেছেন। তখন তিনি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। তিনি সবসময় চিন্তা করতেন বাংলাদেশী শিল্পীদের কণ্ঠ থাকেনা কিছু দিন পর ঠিক বিকৃতি এসে যায়। কণ্ঠে ঠিকমত আওয়াজ হয় না, উচু স্কেলে গাইতে আরম্ভ করেন, নিচে গাইতে পারেন না এটা তার কাছে মনে হত। ১৯৭৫ সালে মে মাসে একটা সংগঠন তৈরি করেন। তার নাম দেয়া হয় শুদ্ধ সংঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠি। এখানে সাত জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওস্তাদ সৈয়দ জাকির হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, মুফিজুল ইসলাম, ওস্তাদ নাছির হোসেন এবং উষা রহমান ছিলেন এ সংগঠনের সদস্য।

শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোন সংগঠন সেই সময় ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন সংগঠন তো দূরের কথা, উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী বলতে যা বুঝায় তাও পুরোপুরি ছিল না আর যারা দু'চারজন চর্চা করতেন তারা আবার গাওয়ার জায়গা পেতেন না।

প্রথম অনুষ্ঠানে কারা গান করেছেন জানতে চাইলে বলেন তাদের প্রেসিডেন্ট ওস্তাদ সৈয়দ জাকির হোসেন এবং তার ভাই

Dhaka University Institutional Repository

নাসির হোসেন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ অনুষ্ঠানের জন্য তারা স্রোতা খুজতে শুরু করেন। আসলে তিনি মনে করেন স্রোতা না হলে অনুষ্ঠান হয়না তাই স্রোতাদের এক জায়গায় করতে গিয়ে বাড়ীতে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। খাবারের জন্য আট দশ জনকে দাওয়াত দিতেন। আগে গান শুনাতো শিল্পীরা তারপরে খাওয়া দাওয়া হত। এরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠীর পথ চলা আরম্ভ হয়েছে।

১৯৭৫ সাল থেকে ৬/১ কলাবাগান একটি বাসায় তিনি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করেছিলেন। দাওয়াত দিতেন লোকদের খাওয়া শেষ হলে বা আগে অনুষ্ঠান করতেন। এভাবে করতে করতে এক বছর হয়ে যাওয়াতে তিনি ভাবলেন এখন তো কিছু শ্রোতা আসছে কিছু শিল্পী তৈরী করে ভাল ভাবে একটা অনুষ্ঠান করা যায় কিনা। ১৯৭৬ সালের মে মাস থেকে মাসিক অনুষ্ঠান করা শুরু করনে। সেটা শুরু হয় ৬/১ কলাবাগানে। তখন থেকে কিছু কিছু শ্রোতা আসত। তখন শিল্পীরা যে খুব পরিচ্ছন্ন গান করতেন তা নয়। তবে মোটামুটি ভাল করতেন। এর মধ্যে দু'চারজন চর্চা করে তৈরি হয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। আখতার সাদমানী, নিতাই রায়, নারায়ন চন্দ্র বসাক এদের নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন প্রথম। ওস্তাদ বারীন মজুমদারও কলাবাগানে একটি অনুষ্ঠানে গান করেছেন। আর একটা অনুষ্ঠান করেছেন বাংলাদেশ পরিষদে সম্মেলন করেছিলেন সেখানে।

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্র সঙ্গীতে কারা ছিলেন জানতে চাইলে বলেন। আবেদ হোসেন খাঁন, শাহাদাৎ হোসেন খাঁন, তবলায় কিরিটি ভূষন অধিকারী মদন গোপাল দাস। তখন একক পরিবেশন করতেন কিন্তু একক পরিবেশন করার মত অবস্থা কারো ছিল না। তবে তারা যে পারতেন না ঠিক তেমন না। তারা বেশ কিছু শিখেছেন কিন্তু একক পরিবেশনের সুযোগ হয়নি। আস্তে আস্তে তিনি সব জায়গায় বলতে থাকেন। তখন রেডিওর অবস্থা যা ইচ্ছা তাই ছিল। তখন শুধু ঢাকার বাইরে রাজশাহীতে হিন্দু সংস্কৃতির সাথে ১৯৮৫ তে একটা সম্মেলন করেন। সেখানকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা ছিলেন সেখানে অমরেশ রায় চৌধুরী, রবিউল হোসেন, রঘুনাথ দাস(বেহালা), শিবনাথ দাস(বাঁশী), মঞ্জু শ্রী রায় (কণ্ঠ)। সিলেট থেকে রাম কানাই দাস যেতেন, নেত্রকোনা থেকে গোপাল দত্ত আর ফজর আলী বলে একজন ছিলেন, তিনি মারা গেছেন। এই সম্মেলনে তিন রাত এবং সেখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। ঠিক আকবরের রাজ দরবার থেকে সম্মেলনের মাধ্যমে জন সাধারনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরপর তিনটি সন্ধ্যা একটা অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বেশ ভাল টাকা পয়সা খরচ করতে হয় এই টাকা বহন কে করে জানতে চাইলে বলেন।

প্রথম থেকে তিনি নিজেই বহন করতেন, মাঝে মাঝে কেউ দুশ, একশ, পাঁচশ, টাকা দিতেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনকে অনেক দুরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি হয়ে গেছে এই ভাবে করতে করতে তারা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে গেলেন। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের অডিটরিয়াম প্রথম উদ্বোধন হল শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এখানে প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান হবে বলে নির্ধারিত হল।

এপ্রিল মাসে ২৫বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হবে। এই সম্মেলন বাংলাদেশের সব জায়গার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। তাঁদের এই সংগঠনের মুল লক্ষ্য শুদ্ধ ভাবে সঙ্গীতকে প্রসার করা।

বাংলাদেশের বাইরের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন। ডাগর ব্রাদার্স, দেবেন্দ্র মুদ্রেশ্বর আরো কিছু শিল্পী এদেশে এসেছেন।

শিক্ষার্থীদের একক উপস্থাপনার সুয়োগ করার জন্য দুটো সম্মেলন করা হত একটা বর্ষ পুর্তী ও একটা শীতকালীন তিনি চিন্তা করলেন যে মাঝখানে অনেক বড় যার জন্য গ্যাপ পরে যায়। পরে আবার প্রতিভা বিকাশ কার্যক্রম শুরু করেন। সঙ্গীত শিক্ষকদের কাছে বলে দিয়েছেন দুইজন করে শিক্ষার্থী দিতে। এদের বয়স ১৬ থেকে ২৫ এর মধ্যে। এটা করেন ৮বছর। তারপর আবার শুরু করলেন প্রতিভা স্ফুরন কার্যক্রম। এখানে ১৬ বছর পর্যন্ত প্রতিভা স্ফুরন কার্যক্রম এখানে ১৬ বছর পর্যন্ত যত শিল্পী আছে। তাদের দিয়ে গান করাতেন।

আচর্যের বিষয় হচ্ছে ৭ বছরের ছেলে মেয়েরা তানপুরা বাজিয়ে গান করেছে এই অনুষ্ঠানে। শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠীতে গান গাওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে সেটা হারমোনিয়াম ছারা শুধু

Dhaka University Institutional Repository

তান পুরা বাজিয়ে গান করতে হবে। প্রতি বছর বর্ষ পূর্তী ও শীত কালীন অনুষ্ঠান করে কি স্রোতার সংখ্যা কি বেড়েছে বা শিল্পীরা কি অনুপ্রেরনিত হচ্ছে জানতে চাইলে বলেন নিশ্চই অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং স্রোতার সংখ্যাও বেড়েছে। রজত জয়ন্তীতে ৬০ জন শিল্পীদ্বারা গান করানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু ৭০ জনেরও বেশী হয়ে গেছে বলে তিনি জানান দেশ বেশ কিছু শিল্পী তৈরি হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না বুঝে অন্য কোন সঙ্গীত ভাল ভাবে অতস্থ করা যায়না এটা তিনি খুব ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বলে তিনি মনে করেন।

ওস্তাদ শুধু শিখাবে। ওস্তাদরা তাদের সন্তানদের মঞ্চে উঠিয়ে দেয় গান করার জন্য কিন্তু সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা যারা আছে তাদের দায়িত্ব তাদের মত দক্ষ সংগঠনের হাতে।

তিনি মোটামুটি ধারনা রেখেছেন যে কোন শিক্ষক শিখাতে পারে বা কোন শিক্ষক শিখাতে পারে না। এই ধরনের একটি কাজ আপনি নিরবে করে যাচ্ছেন আপনি নির্দিধায় বলতে পারেন দীর্ঘ ৭৫ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত, এর মধ্যে আমাদের দেশে বেশ কয়েকজন সরকার চলে গেছে। আপনি কি অভিমান করে তাদের কাছে কিছু বলেন না তারাও কিছু আপনাদের বলছেন না।

তিনি বলেন শিল্পকলার মধ্যমে একটা ফরম গিয়েছিল তার হাতে সেটাকে পুরন করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কোন উত্তর আজো পাননি। তার মতে এখানে বড় টেবিলের উল্টো দিকে বসে হাত জোর করে কিছু না বললে কোন কাজ হয় না আপনার যে এই

Dhaka University Institutional Repository

চাপা অভিমান এতে করি কি মনে করেন এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে আরো দুরে নিয়ে যেতে পারবেন জানতে চাইলে বলেন তার খুব কঠিন হয়েছে। বেশ কিন্তু লোক সাহায্য সহোযোগিতা করেছেন। কেউ গান করতে জানে কেউ গান করতে জানে না। সি, এ, আমিনুল হক সেতার বাজাতেন। ডাঃ লায়লা খান প্রতি সম্মেলনে এর বেশ কিছু টাকা দেন। শিল্পী বেড়ে যাওয়ায়। ২০ বছর পুর্ব্বে পর থেকে কালেকশনের দিকে ঝুকে পড়েছেন, আয় রোজগার তেমন নেই। যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসে তাদের সম্মানী হিসাবে কিছু দিতে পারেন কিনা জানতে চাইলে বলেন সম্মানী দেয়া সম্ভব হয়না। আসা যাত্তয়ার ভাড়া থাকা খাত্তয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যদি দিতে পারতে তবে তিনি খুব খুশি হতেন বলে মনে করেন। তবুও আমরা.বলব যে তিনি একজন সফল সংগঠক।

এই অনুষ্ঠানটি যদি অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সের মত সরাসরি না হোক ক্যামেরায় ধারন করে প্রচার করার সুযোগ হত তাহলে খুব উপকার হত বলে মনে করেন। রেডিও টেলিভিশনে লিখে ছিলেন কিন্তু নিয়মিত শিল্পীরাই একটি রাগ পরিবেশন করতে সময় পান ছয় মিনিট তাও বেশ কিছু দিন পর পর। এখানকার কর্মকর্তারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গী খুব প্রয়োজন বলে মনে করেন না। বর্তমান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রির কাছে চিঠি দিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ফল পাননি।

রেডিওতে এ গ্রেডের শিল্পীদের সম্মানী ৩৫০ টাকা দেয়। এটা কি যথাযথ বলে মনে করেন জানতে চাইলে বলেন। এটা

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই না। এদিয়ে কিছু হয়না। তবে তিনি যেটা করছেন সরাসরি মানুষের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। রেডিওতে ১৫মিনিট টেলিভিশনে ৬মিনিট সময় দেয়া হয় একটি রাগ পরিচালকের জন্য বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন। এতুটুকু সময়ের মধ্যে কোন কিছুই দেখান সম্ভব নয় সময় আরো বাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে সুন্দরভাবে একটি রাগ গাইতে পারে।

মাসিক অনুষ্ঠানে কতজন শিল্পী নিয়ে গান করা হয় জানতে চাইলে বলেন প্রত্যোক দিনে দুইজন শিল্পী গান করেন।

ধ্রুপদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে বলেন ধ্রুপদে তো এখানে তেমন কেউ নেই। তপন কান্তি বৈদ্য নামে একজন শিল্পী ছিলেন তাকে গান গাইতে বললে সে বলেন টাকা ছাড়া গান গাইবেন না।

রাজধানীতে যারা ওস্তাদ আছেন আক্তার ছাদমনোমী ইয়াসিন খা এরা এই অনুষ্ঠানে গান করেছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন। এরা অনেকই করেছেন ।

আবার কেউ এসে এসে চলে গেছেন কারণ হয়তাবা আমরা তাদেরকে ওস্তাদ বলে পরিচয় করিনি তাছাড়া ওস্তাদ উপাধি দেয়ার লোক তো আমরা নই। সরকার ব্যবস্থা করবে এজন্য। এখানে প্রবীন শিল্পী এই ধরণের কথা লেখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহর দেশের প্রান কেন্দ্র কিন্তু এখানে সঙ্গীতের যে চর্চা করা হয় তার চেয়ে বেশি হয় ঢাকার বাইরে। কিন্তু ঢাকাতে সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে বেশি। এখানে সবাই টিউশনি নিয়ে ব্যাস্ত থাকে। সুবিধা থাকলে এগুতে পারছে না।

একজন টিউটর কি একজন সফল পারফরমার হতে পারে জানতে চাইলে বলেন। তখনই ভাল করতে পারবে যখন সে নিজের চর্চাকে ধরে রাখতে পারবে, তাছাড়া সম্ভব নয়।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করা এটা সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলেন বেশির ভাগ শিক্ষক বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করে। কিন্তু যদি প্রাকটিস ধরে না রাখে তবে বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি বাড়ি যেতে ও পারবেনা এবং সমসস্যায় পরে যাবে। ঢাকাতে কিছু কিছু আছে এরা বাড়িতে গিয়ে শিক্ষকতা করেন না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এভাবে নিধারিত সময় নিয়ে হয়না। একটা ছাত্রের যতক্ষনে “সা” না লাগবে ততক্ষন তাকে করতে হবে তাতে ঘন্টার পরে ঘন্টা বসে থাকলেও।

সফল সংগঠক সফিউর রহমান তার স্ত্রী উশা রহমান তিনিও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এই সংগঠনকে গড়ে তোরায় জন্য । তাছাড়া তিনি প্রায় ১৫ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছেন আমাদের দেশের প্রখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ সৈয়দ জাকির হোসেন এর কাছে এই সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে তার অনেক অবদান রয়েছে।

বর্তমান এই শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোঠিতে অনেক একক পরিবেশনা করেছেন কিন্তু রেডিও টিভিতে করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

এই সংগঠনের মাধ্যমে অনেক শিল্পীরাই জন সম্মক্ষ্যে গান করার সুযোগ পেয়েছেন। কোন শিক্ষক কি এখানে আছে যে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের একটা পর্যায় নিয়ে যেতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, না এখানে শেখাছে ঠিকই কিন্তু একটা পর্যায় গিয়ে তারা আর টিকে থাকতে পারছে না। কারন ক্যাসেট দিয়ে গান করা সম্ভব নয় কিন্তু কৌশল আছে সেগুলো ওস্তাদ ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। এই মুহুর্তে প্রস্তাব দেয়া হল দেশের বাহিরে থেকে ওস্তাদ নিয়ে এসে এখানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবেন আপনাকে আর্থিক সহযোগিতাও করা হল। আপনি কাকে নিয়ে আসবেন জানতে চাইলে বলেন তিনি এটা এখনো ঠিক করেননি। তবে ভারতে অনেকে আছে যাদের পারফরমেন্স ভাল নেই কিন্তু ভাল সেখাতে পারে। তাদেরকে আনলেই ভাল হয় টাকাও কম লাগে।

বিদেশ থেকে শিল্পীরা এদেশে আসলে কি আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের কোন উপকার হয় জানতে চাইলে বলেন তেমন কোন উপকার হয় না কারণ কিছু দিন আগে একজনকে আনলেন তিনি ১৫মিটি মালকোস গাইলেন, আবার ঠুমরী গাইলেন এভাবে সবকিছু মিলিয়ে যাবে কোনটাই ভালভাবে নিতে পারবেনা।

দুই একজন এসেছেন বেশ ভাল যেমন ডাগর ব্রার্স একটা রাগ দুই তিন ঘন্টা ধরে পরিবেশন করেছেন। ভিজি কারনাট খুব ভাল বাশী বাজান এবং আমাদের দেশে বারি সিদ্দিকী তার কাছে শেখানো পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সন থেকে এই সংগঠন এই ধরনের আর কোন সংগঠন আসে পাশে ছিলকিনা জানতে চাইলে বলেন। তখনকার সময়ে তেমন কেউ ছিলনা, তবে নিবেদিতা বলে একটা সংগঠন করেছিল অনেক পরে কিন্তু সেটা এখন আর নেই। সঙ্গীত নিকেতন নামে একটা সংগঠন করেছেন তাও দুইটা একটা অনুষ্ঠান হওয়ার পর আর দেখা যায়না বাবু রহমানের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নামে একটা সংগঠন হয়েছিল তাও নেই। এখানে ঢাকার বৃহৎ দুইটি প্রতিষ্ঠান যেমন ছায়ানট ও বাফা। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন ছায়ানট অথবা বাফা থেকে এখানো কেউ আসেনি যে আমি এ সংগঠনের থেকে গান করব।

১৯৭৫ সন থেকে এই প্রতিষ্ঠান আপনি নতু সহস্রাব্দের প্রথম দিতেই একটি রজত জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছেন। আর এই যে অনেক গুলো অনুষ্ঠান করেছেন তার মধ্যে এমন কোন রাত আছে যে সারা রাত ধরে গান হয়েছে যে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পেরেছেন।

মোশারফ হোসেন গান গাইতেন তার গলা খুব মিষ্ঠি ছিল। খুব ভাল গাইতেন। উনি বেশ কয় একবার এসছেন। তবে রাতের অনুষ্ঠানগুলো খুব ভাল হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তিনি খুব আনন্দিত হন।

রাজধানীতে বাইরে শিল্পীরা আসলে এখান কার শিল্পীদের কেমন দেখা যায় জানতে চাইলে বলেন যে বাইরের শিল্পীরা

Dhaka University Institutional Repository

আসলে এখানকার শিল্পীরা তেমন আসেনা এবং ছাত্র ছাত্রীকে গান শুনতেও বলেনা এটা একটা ক্ষতিকর ব্যাপার। আমাদের ঢাকার শিল্পীদের নিয়ে যখন বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন তাদের খুব আনন্দ হয়। এখান থেকে যারা যায় তারা খুব আদর যত্ন পায় কিন্তু যারা আসে তারা তেমন যত্ন পায়না। কেন যে তারা এভাবে করে বোঝা যায় না। কিন্তু বাইরর শিল্পীরা ঢাকার শিল্পীদের চাই অনেক ভাল গান করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে নাট্য কলা ও সঙ্গীত বিভাগ চালু করা হয়েছে। আমি শ্রী মিন্টু কৃষ্ণ পাল প্রথম গবেসক হিসাবে আপনার কাছে এসছি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সিদ্ধান্তটা কেমন হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে এটা খুবই ভাল হয়েছে। এটা তারা আগে করেননি কেন এইটাই প্রশ্ন। তার পর ইন্ডিয়া থেকে স্কলার সিপ নিয়ে যারা এসেছেন তারা এখানে এসে তেমন চাকুরি পাচ্ছেন না স্কুলে কলেজে এই কোর্স চালু করে তাদের চাকুরি দেয়া উচিৎ। এরা চাকুরি পেলে এদের উৎসাহ বাড়ে। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে যে উদ্যোগ নিয়েছে এতে কোন প্রশ্নই নেই কারণ আমাদের দেশে এই ধরণের উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন। এখানে কন্ঠের উপর জোর দেয়া উচিৎ কে ভাল ছাত্র বা খারাপ ছাত্র তাতে যায় আসেনা। স্যর এবং তাল গান কেমন সেটা ভাল হলেই তাকে নেয়া উচিৎ।

আর ভাল লোক নিয়োগ করা উচিৎ যাতে করে ছাত্র ছাত্রীরা ভাল শিখতে পারে। এই কামনই করছেন তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলতে পরি যে জনাব সফিউর রহমান একজন বিশিষ্ট সফল সংগঠক তার পৃষ্ঠপোষকতার আমাদের শিল্পীদের মেধা বিকামে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ভবিষৎতে দেশের ছাত্র ছাত্রীরা আরো ভাল করুক উন্নতি স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করুক এই বলে শেষ করছি।

ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন (সরোদ বাদক)

ওস্তাদ মোরাবরক হোসেন খাঁন ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁন সাহেবের একজন সুযোগ্য পুত্র। ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন তার অন্যান্য ভাইদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। তার মুলে ছিল তাঁর উচ্চশিক্ষা। তিনি তার বাবার আগ্রহেই উচ্চ শিক্ষার নেয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন।

বাংলাদেশে সঙ্গীতের উপর যে সকল সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে তার অধিকাংশ গ্রন্থই মোবারক হোসেন খাঁন সাহেবের রচিত। আর এ কাজের উপর ভিত্তি করেই তিনি 'একুশের পদক' ও 'স্বাধীনতার পদক' দুটি পুরস্কার পান।

তাঁর যেসব গ্রনন্থাবলী সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পিপাসা মেটাতে সক্ষম সে গ্রন্থগুলি হল কণ্ঠ সাধন, সঙ্গীত সাধনা, বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ, সঙ্গীত মালিকা (৩ খন্ড), আলাউদ্দিন খাঁর পত্রাবলী সহ আরো অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে।

ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন একজন স্বার্থক সুর বাহার বাদকই নন, তিনি শিল্প কলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালকের

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সময়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত শিক্ষা ও পরিবেশনার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিটি শিল্পকলা সহ থানা পর্যায়ে অতিরিক্ত পাঁচটি থানায় শিল্পকলা প্রতিষ্ঠা করেন।

ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন পরিস্কারভাবে একটা দিকেই বেশী জোর দিয়েছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা কার্য্যক্রম যদি গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু না হয় তা হলে আগামী প্রজন্মের সকল ধরনের শিল্পীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই তিনি 'সঙ্গীত কলাকেন্দ্র' নামে একটি কার্য্যক্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃত মন্ত্রনালয় থেকে অর্থ মঞ্জুরীসহ অনুমতির ব্যবস্থা করেন। এ কার্য্যক্রমটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

শিল্পকলা একাডেমী প্রতিবছরই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন করে থাকে। মোবারক হোসেন খাঁন তার বক্তব্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ন দিক আলোকপাত করেন। তা হলো ওপার বাংলা থেকে দক্ষ ওস্তাদদের এনে এপার বাংলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের তালিম দেয়া যেতে পারে। তাঁর সময়ে সগিরউদ্দিন খাঁ (সারেঙ্গীবাদক) সাহেবকে এনে সুদীর্ঘ এক বছর শিল্পকলা একাডেমীর মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেন।

"বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চা" ১৮৫০- ১৯৯০ সালে গবেষণার কাজটির গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ কাজে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অনেক সঙ্গীত সাধক আছেন যারা নীরবে সাধনা করে নীরবেই চলে যান। তাদের সঙ্গীত-জীবন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি না। এ দুরুহ গবেষনা কাজের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতি আমরা একটু হলেও শ্রদ্ধা জানাতে পারবো এবং তাঁদের জীবনী ও সঙ্গীত নিয়ে এ ধরনের গবেষনামূলক 'অভিসন্দর্ভ পত্র' আগামী প্রজন্মের সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অনেকটা পিপাসা মেটাতে পারবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ প্রথমবারের মতো এম.ফিল. কোর্স চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীকে ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রথম গবেষক হিসেবে মিন্টু কৃষ্ণ পালের সর্বাঙ্গীন সাফল্য উন্নতি কামনা করেন।

ওস্তাদ খুরশিদ খান (সেতার)

আমাদের দেশের তার যন্ত্রের মধ্যে সেতার অন্যতম। এয়োদশ শতাব্দীতে বাদশা আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্ব কালে কবিও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু কর্তৃক সেতার যন্ত্রটি আবিস্কৃত ও প্রবর্তিত হয়। কাথিত আছে যে, তিনটি মাত্র তার সংযোগ করে ১৪টি পর্দার সর্বপ্রথম তিনিই এই যন্ত্র সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুণী ও সঙ্গীতবিদগন কর্তৃক ক্রমশ তার বাড়িয়ে সপ্ততন্ত্রী বা সাত তার বিশিস্ট সেতার প্রচলিত হয়। বিভিন্ন শিল্পী তাদের শৈল্পিক গুনাবলী দ্বারা সারা পৃথিবীতে এই তার যন্ত্র (সেতার) জন প্রিয় করে তুলেছেন। নিম্নে আমাদের দেশের প্রখ্যাত সেতার বাদক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর দৌহিত্র ওস্তাদ খুরশিদ খাঁর সাথে সক্ষাৎকারটি নিম্নে দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর আমাদের দেশের রাগসংগীতে যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর জন্যই আমাদের দেশের সেতারকে ধরে রাখতে পেরেছে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা। বিভিন্ন দেশে তাঁর অনেক ছাত্র আছে। ওস্তাদ খুরশিদ খান প্রথমত তাঁর দৌহিত্র তারপর তার ছাত্র।

ওস্তাদ খুরশিদ খান ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সাহেবের ছয় মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বড় সন্তান। তার জন্ম বাংলা ১৩৪২ সালে বঙ্গবিহার সাবডিভিশন ছাদেপুর গ্রামে। তার বাবার নাম রওশদ আলী খাঁ ওস্তাদ আল্লাউদ্দিন খার বাড়ি থেকে মাত্র সাত আট মাইল দুরে ছিল তার জন্ম স্থান । ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ বেশির ভাগ সময় ব্রাহ্মণ বাড়িয়া থাকলেও তাকে সমাধিস্থ করা হয় কুমিল্লায়।

ওস্তাদ খুরশিদ খানের সঙ্গীতে শিক্ষা জীবন শুরু ১২ বছর বয়সে সেই সময়ে তার নানার (ও.আ.খ)যন্ত্রের দোকান ছিল। তখন কারিগার দিয়ে তৈরি করে দেয় হয় একটি সেতার সে সেতার এখনো তার কাছে রয়েছে। তার নানা আয়েত আলী খাঁ বললেন আমি জীবনে অনেকরই নাড়া বেঁধেছি তোর (খুরশিদ খাঁ) নাড়া আমার বড় ছেলে আবেদ হোসেন খাঁ বেঁধে দিবে। আবেদ হোসেন খাঁ তার প্রথম হাতে খড়ি দেয় এবং তাঁর প্রথম গুরু। তখনকার দিনে নাড়া বাঁধার যে প্রথা ছিল সেই প্রথা অনুযায়ী তার নাড়া বাঁধে নতুন কাপড় দিতে হয় মিষ্টি আনতে হয় এবং টাকা দিতে হয়। তখন কার দিনে রূপার টাকা ছিল। তার মামাকে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি টাকা দিয়ে অন্যান্য সব নিয়মঅনুযায়ী নাড়া বাঁধা হল। তখন তার পরিবারের সবাই উপস্থিত ছিল সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হল। নাড়া বাঁধার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার মামা বাহাদুর হোসেন খাঁ, মোবারক হোসেন খাঁ। আবেদ হোসেন খাঁ প্রাথমিক শিক্ষাটা যে প্রথমে সা, পা, র্সা তিনবার করালেন। এটাই তার প্রথম তালিম। তারপর তাঁর নানা আয়েতৎ আলী খাঁ তাকে তালিম দিয়েছেন এক নাগাড়ে সাত আট বছর। শিক্ষার তো শেষ নেই।

তাঁর নানা জীবিত থাকা অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন যায়গায় যন্ত্র সঙ্গীত উপস্থাপন করেছেন। তার স্মৃতিচারনে তিনি বললেন ঐ সময়ে কুমিল্লা মাসিক অনুষ্ঠান হত তখন আমাদের দেশের শিল্পী সুধীন দাস, কুমিল্লার পুলিন্দ দাস সুখেন্দু চক্রবর্তী তারা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গান করতেন। তারা তাঁর ওস্তাদ খুরশিদ খান নানার কাছে অনুরোধ করলেন একটি অনুষ্ঠানে সেতার বাজানোর জন্য। তখন তিনি বলেলন ও কি বাজাবে, তখন তারা বলল ওস্তাদজী ওতো ছোট মানুষ সেভাবেই দেখা হবে। তখন তিনি হাফপ্যান্ট পড়েন। তিনি সেই অনুষ্ঠানে ত্রিতালে ইমন রাগ বাজালেন ।

বেলায়েত হোসেন খাঁ ও তাদের ঘরনা এক কিনা জানতে চাইলে বললেন তারাও সেনী ঘরনা বলে দাবী করে আমরাও বলি সেনী ঘরনা এর মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে বেলায়েৎ হোসেন খাঁ এর ঘরনায় গায়তলি ব্যাপার রয়েছে তিনি বললেন গান বাজনা বলতে একটা ব্যাপার আছে গান ও বাজনা এই দুইয়ের মধ্যে যে

Dhaka University Institutional Repository

ভাল গাইতে পারে সে ভাল বাজাতেও পারে। কার ভিতর থেকে না আসলে গাইবে কিভাবে আর ভিতর থেকে আসবে তার পরতো বাজাতে হবে। তাঁর (খুরশিদ খাঁ) মতে কাদের ঘরনায় কোন গায়কীয় ব্যাপার নেই।

আসামে করিম গঞ্জে একটা ছন্দ ভারতী নামে একটি গানের স্কুল করা হয় । স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার নানার কাছে গেলে তিনি বললেন আমার তো সময় নাই তবে আমার নাতী আছে। তাঁকে নিয়ে যেতে পার তখন সবাই বলল তাকে দিলেই চলবে। তখন থেকে ওস্তাদ খুরশিদ খাঁ সাহেব শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। তার সাথে সাথে শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। করিমগঞ্জে একটানা তিন বছর শিক্ষকতা করেন সেখানে বসে আর তালিম নেওয়া সম্ভব হয়নি। তঁরা মোট শিক্ষাকাল ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত এই সময়টাই তার শিক্ষাকাল। তার শিক্ষা গুরু প্রথমে আবেদ হোসেন খাঁ তারপর নানা আয়েত আলী খাঁ। তারপরে কলকাতাতে মামা বাহাদুর হোসেন খাঁ এর কাছেও তিন বছর তালিম নিয়েছেন। তিনি খুব বিনয়ের সাথে বললেন "তেমন কিছু শিখতে পারিনি তবে যা শিখেছি এই দেশে তাতেই ওস্তাদ হয়ে গেছি। তবে ওস্তাদ হওয়া কঠিন ব্যাপার।"

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা যেমন বিভিন্ন গুনের অধিকারী ছিলেন বিভিন্ন যন্ত্র বাজাতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

দৌহীত্র হিসাবে আপনি কি অন্য যন্ত্র বাজানোর চেষ্টা করেছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন না তবে বাজালেও তার তালিম নেই বা উপস্থাপনার মত না।

আয়েত আলী খাঁ সাহেবের কাছে শেখার সময় ওস্তাদ হিসাবে আচরন বিধি কেমন ছিল জানতে চইলে বলেন, যেমন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে শিখতে গিয়ে রবিশঙ্করকে অনেক বকা এবং মার খেতে হয়েছে। তেমনি সে তাদের মধ্যে যদিও নানা নাতীর সম্পর্ক তবুও তাকে ছাত্র হিসাবে অনেক মার বকা খেতে হয়েছে। যে তালিম টা দিতেনে ঘরে এসে আবার ধরতেন আমি চর্চা করেছি কিনা। না করলে বকতেন। প্রতিদিন তিনি তিন চার ঘন্টা নিয়মিত চর্চা করতেন। তবে চর্চার কোন নির্ধারিত সময় ছিলনা তার ইচ্ছা মত তিনি চর্চা করে নিতেন।

সেতার চর্চায় যে আঙ্গিক গানগুলো ব্যবহার করা হত তার সাথে ধ্রুপদের মিল আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন তার মতে ঠিক ধ্রুপদের অঙ্গগুলো সেতারে হয়না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমতা প্রতিয়মান হয়। সেতারে আলাপ করে ধ্রুপদে করা হয় আলাপ সেতারে করা হয় এবং ধ্রুপদেও আলাপ করে জোরটাও সেতারে করা হয় ধ্রুপদে করা হয়। তাদের ঘরনায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা সাহেব খরজ পঞ্চ ব্যবহার করতেন। তবে কিছুটা ধ্রুপদের কাজ করার জন্য সেতারের পরিবর্তে সুর বাহার ব্যবহার করা হত। সেতারে তালে আমার আগে জোর বিস্তার করলে ধ্রুপদের সাথে আঙ্গিকে মেলে অনেকটা। সেতারে গতে জখন

Dhaka University Institutional Repository

আসে তখন তাল ব্যবহার করা হয়। দুইটা গৎ আছে মজিদ খানী ও রেজা খানী খান গৎ। রেজাখানী মধ্যালয়ের গৎ মজিদ খানী গৎ হল তিমালয়ের গৎ।

ওস্তাদ বেলায়েত হোসেন খাঁ যে গায়কীতে গান করতেন যেমন বাজনা ছেড়েদিয়ে পাওয়া শুরু করে দিতেন। কিন্তু খুরদি খাঁ সাহেবের যে ঘরনার ছিলেন এ ঘরনায় এ ধরনের কোন রেওয়াজ ছিলনা। কিন্তু তাদের ঘরনায় ওস্তাদ গেয়ে গেয়ে শিক্ষাতেন। গান হল কন্ঠে প্রকাশ করা এবং বাজনা হল হাতে প্রকাশ করা। এখানে বেলায়েত হোসেন খাঁ সাহেবের ঘরানা থেকে আলাদা করা যায় তবে তাঁর খুশিদা খাঁ একটা সুরকে মাধ্যমে করে নেন এখানে কোন বানী থাকেনা। বনী বসালেই গান হয়ে যায়। ওস্তাদ বেলায়েত হোসেন খা সাহেব এরা গানের মুখরা বাজায় আর তারা এটাকে বন্দেশ করে নেয়। তাহলে দেখা যায যে তার। যেটা গৎ বাজাচ্ছেন সেটা শুধু সুরের কম্পজিশন যাচ্ছে আর বেলায়েত হোসেন খাঁ সাহেব তাদের ঘরানায় গানের বানী বসিয়ে নেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে যিনি পরিচিত তিনি হলেন রবি শংকর। তার অনেক উপস্থাপনা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার অনেক সময় অপেক্ষা করেছি যে বাজনা ছেড়ে দিয়ে রবি শংকর কখনো গান করেন কিনা, কিন্তু না তা তিনি করেননি কারণ তাদের ঘরনায় বাজনা চেড়ে দিয়ে গান করার বেওয়াজ ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ঘরনায় যে এতগুলো বানী ছাড়া কম্পজিশন আছে , সেগুলো কি যুগ যুগ ধরে কিভাবে চলে আসছে জানতে চাইলে বলেন স্বরলিপি আকারে শেখানো হত। যখন কাউকে শেখান হত মুখে সরগাম করে যেমন নিরে গা ক্ষা দানি র্সনি ধাপা ক্ষাগারে সাে সে যন্ত্রে আবার সেগুলো বাজাত। যখন একটি গৎ বাজান হয় তখন গৎ টাকে মুখে বলে দেয়া হয় যেমন গা গারে গাক্ষা পক্ষ নিধা গারেসা এখানে পিয়াকি নাজারিয়া এটা আর দরকার হচ্ছেনা। তবে বলা যায় কিছু স্বরের সমন্বোয়ে একটা কম্পজিশন এটা বেরায়েত হোসেন খা সাহেবের ঘরনা থেকে খুরশিদ খান যে ঘরনায় থাকে তার থেকে আলাদা করে দেয়।

সেতারে প্রথম তালিম দেয়া হয় মধ্যালয়ে তার পরে মজিদ খানি ঘরনা আসেন। কোন কোন তালে বাজানো। হয় জানতে চাইলে বলেন অনেক তালে বাজানো হয়। যেমন-ঝাঁপ তাল , রূপক একতাল, আড়া চৌতাল ইত্যাদি ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেব ও এটা ব্যবহার করেছেন। সেতার বাজাতে গিয়ে তালে আড়ি কুআড়ি আছে যা ধ্রুপদের সাথে মিল আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন সেতারে দ্বিমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করা হয ধ্রুপদে ঠিক তেমনি ছন্দ ব্যবহার করা হয়।

সঙ্গতের ব্যাপারে যেমন দুই ধরণের সঙ্গত প্রচলিত আছে সাথ সঙ্গতও পর সঙ্গত। সাথে সাথে যেটা বাজানো হয় সেটাকে সাথ সঙ্গত বলা হয় ও পরে পরে যে সঙ্গত করা হয় তাকে পরসঙ্গত বল হয় বা সওয়াল জবাব বলা হয়। যেমন আমি

Dhaka University Institutional Repository

বাজালাম‘পামা গারে’ সানি্ সা তবলাবাদক বাজালেন ‘ধেরে ধেরে কেটে তাক’। একজন কথা বললে সাথে সাথে বললে সে কথা ভাল লাগে না। পরে পরে যেমন ভাল শোনা যায় । ঠিক তেমনি এখানে পরে পরে বাজালে চমক সৃষ্টি করা যায়।

কণ্ঠ সংগীত দেশের বাহিরে যতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই যন্ত্রসংগীত। এই সময়ে সবাই সুরকে ভালবাসে, কেউ সুরের চঞ্চলতাকে বাল বাসে। আবার কেউ বিলম্বিত ঢিমা সুরকে ভালবাসে। আবার কেউ দুঃখের গান, কেউ আনন্দের গান পরিবেশন করেত ও শুনতে ভালবাসেন।

আমাদের দেশের বাইরে উচ্চাঙ্গ সংগীতে গানের কথা নিয়ে বিভ্রাট লেগে যায়। বিদেশীরা এ দেশের গানের কথা স্পষ্ট না বুঝায় গানকে ভালভাবে আত্মস্ত করতে পারে না। তাই কণ্ঠ সংগীতে জনপ্রিয়তা আছে তবে সে রকম নয়।

ওস্তাদ খুরশিদ খাঁন সাহেব আসামে যাওয়ার আগে রেড়িওতে অনুষ্ঠান করেছিলেন ঢাকা বেতারে। তার সমসাময়ী কালে মীর কাশেম সাহেব, খাদিম হোসেন খাঁন এরা সেতার বাজাতেন। তাছাড়া মঙ্গল চন্দ্র দাস রেডিওতে চাকুরী করতেন এবং সেতার বাজাতেন।

তার সঙ্গীত প্রতিযোগিতার কথা জানতে চাইলে বলেন তার জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন দিল্লীর অলইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায়। এটা ১৯৫৫ সালের দিকে অনুষ্ঠিত হয়। তখন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আসাম থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন। সে সময়ে আসামের মধ্যে তিনি প্রথম হন। আসামের সরকার তাকে প্রতিয়োগিতায় অংশ গ্রহন করার জন্য দিল্লীতে পাঠান।

তখন অলইন্ডিয়া রেডিওর সংগীত পরিচালক ছিলেন পন্ডিত রবি শংকর। ২২ টি প্রবিন্স থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে ৪৪ জন প্রতিযোগির সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন। সেখানে বিচারক মন্ডলিরা ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, এসএম রতন জনকার এবং সুরেশ চক্রবর্তী।

কোন কোন সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেছেন জানতে চাইলে বলেন ১৯৫৫সালে দিল্লীতে এবং ১৯৫৭ সালে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। সেখানে সাত দিন ব্যাপী সম্মেলনের এক দিন উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। সেখানে শিল্পীরা ছিলেন রামেন্দ্র সুন্দর বন্দোপাধ্যায়, তারা পদ চক্রবর্তী, প্রসুন ব্যানার্জী,কৃষ্ণা গঙ্গপাধ্যায় এরা ছিলেন কণ্ঠ সংগীতে এবং শিশির কনাধর, আলী আকবর খাঁ ও নিখিল ব্যানার্জী এরা ছিলেন যন্ত্র সংগীতে।

পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠীত হয় আর্ট কাউন্সিলে। তারপর অনুষ্ঠান করেন অল পাকিস্থান সম্মেলনে, সেখানে শিল্পীরা ছিলেন ছোট গোলাম আলী, মেহেদী হাসান, ইকবাল বানু, সেতারী কবির খাঁ, নুরজাহান প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ টেলিভিশনে ঢুকেছেন ১৯৬৪ সনের ১৫ই নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে বাংলাদেশ দলের সাথে চীনে এবং কানাডায় সরকারী সফরে যান। বাংলাদেশের শিল্পীদের বিদেশে জনপ্রিয়তা কেমন জানতে চাইলে বলেন কোন অথিতি আসলে আমরা এমতেই সবাইকে ভাল বলি। কিন্তু আমি কি পারি সেটা আমিই জানি।১৯৭৮ সনে কানাডা, ১৯৭৯ সনে উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাক সরকারী সফরে যান। এছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে লন্ডনে গেছেন ছয় থেকে সাত বার। ১৯৮২ সনে জামার্নীতে একক ভাবে সেতার বাজানোর জন্য আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময় তবলা সংগতকারী হিসাবে ছিলেন মদন গোপাল দাস, ওস্তাদ সাখাওয়াৎ হোসেন, আলী হোসেন এবং আরো অনেকে।

তার মতে ছোট থেকেই বড় হওয়া যায়। দেশে যদি কোন ছোট শিল্পী না থাকতো তবে বড় শিল্পী কেউ থাকতো না। লক্ষ লক্ষ শিল্পীরা যদি সেতার না বাজাতো তবে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ বেলায়েত হোসেন খাঁ এরা বড় সেতারি হতেন না। ছোটরা আছেন বলেই তারা বড় হয়েছেন।

বাংলাদেশে কোন একক প্রতিষ্ঠান করেছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন তার একক কোন প্রতিষ্ঠান নেই তবে ১৯৬৪ সাল থেকে ছায়ানটে শিক্ষকতা করে এসেছেন। তার উত্তরাধিকারী কেউ আছে কিনা যানতে চাইলে তিনি বলেন তার সত্যিকারের শিষ্য বলতে যাদের বুঝায় তারা অনেকেই দেশে নেই। আবার যারা আছে ছেড়ে দিয়েছে শেখ কামালকে তিনি সাত বছর সেতার

Dhaka University Institutional Repository

শিখিয়েছিলেন সে তো বেঁচে নেই। অনেকে লন্ডনে চলে গেছে। তার মধ্যে ভানু মল্লিক, সাদাআনদ আলী, রিনাত ফৌজিয়া আরো অনেকে।

তার দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে মোরশেদ খান অপু আমেরিকাতে সেতার বাজায়, ছোট ছেলে মোশারফ খান তপু সেতার শিখছেন। বড় মেয়ে তসলিমা ও ছোট মেয়ে সুমনা। এরা কেউ সংগীতের সাথে জড়িত নহে।

সুরের ব্যাপারে East & west-এর কিছু জিনিস আমরা ব্যবহার করি। যেমন রিদমে কর্ডিং ব্যবহার করি। এ সম্বন্ধে তিনি বললেন তবে ওখানকার সাথে এখানকার তেমন মিল নেই।

বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের কেমন আগ্রহ আছে জানতে চাইলে বলেন আমি ছায়ানটের সংগীত বিদ্যায়তনের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারন কেউ চর্চা করতে চায় না। আমি কোলকাতায় তিন বৎসর ছিলাম। প্রতিদিন বার ঘন্টা চর্চা করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে এসে তা কোন কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এখানে এসে বাঁচার তাগিদে কমার্শিয়াল বাজাতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে তার কাছে মনে হয়। আমার ছেলে আমাকে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে বলে কি পেয়েছ এ দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করে॥ তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয় নিজের জন্য করি।

Dhaka University Institutional Repository

এঅবস্থার জন্য কে দায়ী জানতে চাইলে বলেন দায়ী কমবেশী সকলেই। দেশের সরকার মুখে মুখে কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছু করছে না।

রেড়িওতে একজন ক বিভাগের শিল্পীকে একটি অনুষ্ঠান করলে সম্মানি দেওয়া হয় মাত্র ৩৪০ টাকা। এ সময়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন এ টাকা দিলে কিছু করা সম্ভব না। কাজে আমাদের অন্য চিন্তা করতে হয়।

বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গীতের এ দুরাবস্থার জন্য কিভাবে সমাধান করা যায় প্রশ্ন করলে বলেন আমাদের দেশে গানের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলোকে সচেষ্ট হতে হবে। যেমন চারটি গানের মধ্যে একটি গান ক্লাসিক্যাল ঢঙে করতে হবে। আমাদের দেশে নকল সুরের প্রবনতা বেশী । এদের মধ্যে সকীয়তার অভাব। বাংলাদেশের বেতারে ক্লাসিক্যাল উপস্থাপনার সময় ধরা হয় ১৫মিনিট। এ সময়টা খুবই নুন্যতম। পরিবেশনার দিক থেকে রাত সাড়ে দশটায় বাংলাদেশ বিটিভি যে রাগ লহরী নামে যে অনুষ্ঠানটি দেখানো হয় সে সময়টিও শ্রোতা ও দর্শকদের প্রতিকূলে। তাই বিটিভির প্রভাতের অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা করতে পারে এবং অনুষ্ঠানের প্রচারের দিক থেকে আরো অধিক অনুষ্ঠান প্রচার করা উচিত।

আমাদের দেশে সেতারের পরবর্তী প্রজন্মে সেতার বাদক হিসেবে নুন্যতম আশা করাটাও দূরাশা। এটাই বাংলাদেশের জন্য একটা সেতার যন্ত্রী অভাবের এক পূর্বাভাস। তবে বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত সেতার ও সরোদ শিল্পী শাহাদাৎ হোসেন খাঁন (সরোদ), সমীর দাস (সেতার), ইউসুফ খাঁন (সরোদ), আলাউদ্দিন মিয়া (বেহালা), ফিরোজ খাঁন (সেতার)।

ওস্তাদ শাহাদাৎ হোসেন খাঁন (সরোদ বাদক)

ওস্তাদ শাহাদাৎ হোসেন খান এই উপমহাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত সরোদ বাদক। তাঁর বাবা ওস্তাদ আবিদ হোসেন খাঁন একজন প্রতিষ্ঠিত সেতার বাদক। তার সাত বছর বয়সে দাদু ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ একটি সরোদ বানিয়ে তার হাতে তুলে দেন। তখন থেকেই তাঁর তালিম শুরু হয়। অবশ্য তাঁর শিক্ষা গুরু হলেন পিতা ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁন।

দিন রাত অক্লান্ত রেয়াজ করে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সান্নিধ্যে তালিম নিয়েছেন।

সেতার ও সরোদ- এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় জানতে চাইলে তিনি বলেন সেতারের শব্দ মেয়েলী অর্থাৎ মেয়েদের হাতের চুরির শব্দের মতো। আর সরোদ শব্দের মধ্যে একটা গম্ভীর পৌরুষত্বের ভাব আছে। উভয় যন্ত্রেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলাপ, বিস্তার, বান্দিশ, তান, বাট, জোর, ঝালা, গৎ বাজানো হয়।

ওপার বাংলার বিখ্যাত সেতারী বেলায়েত হোসেন খাঁ সাহেবের সাথে আলাউদ্দিন খাঁ ঘরানার পার্থক্য কোথায়, তা হলো বেলায়েত হোসেন খাঁ এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র নিশাদ খাঁ, ইরশাদ খাঁ,

Dhaka University Institutional Repository

এঁরা গায়েকী অঙ্গে সেতার বাজান। অর্থাৎ বাজনার সাথে সাথে মুখে বন্দীশের বানী গেয়ে থাকেন। কিন্তু আলাউদ্দীন খাঁর ঘরানায় এই নিয়মটি নেই। তার বক্তব্যে এটাই পরিস্কার বোঝা যায় যে, গায়কী অঙ্গে গান করে উপস্থিত শ্রোতাকে একটা লঘু অঙ্গে ও ভাবে ভাবান্বিত করা হয়। এতে করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শুদ্ধতা ক্ষুন্ন হয়।

শাহাদাৎ হোসেন খাঁন এই উপমহাদেশের বাইরে অর্থাৎ ১৯৮৫ সনে সুইডেনে তার পরিবেশনায় উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

কোলকাতা, সুইডেন, চীন, আমেরিকা সহ বহু অনুষ্ঠানে সরোদ বাজিয়ে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন।

'গুরুমূখী ও প্রাতিষ্ঠানিক' শিক্ষার মাধ্যমে সঙ্গীত শেখার ক্ষেত্রে গূরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি বলেন ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্পূর্নভাবে গুরুমূখী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজা বাদ্শাদের দরবারী সঙ্গীত, জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরবর্তীতে জনসাধারনের উপর নির্ভরশীল এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা হারায়। এসব কারনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলোকে নতূন একটি শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু নিসন্দেহে বলা যায় রাগ সঙ্গীতের ভিতর রাগের যে রূপ-ভাব তুলে ধরতে গেলে বা শিখতে গেলে গুরুর মুখ থেকেই শেখা সম্ভব। সেক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের কোর্স পদ্ধতি ও কিছু বই পুস্তকের উপর নির্ভর করে সত্যিকার অর্থে একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হওয়া যায় না।

ওস্তাদ সাহাদাৎ হোসেন খাঁন বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর কন্যাদ্বয়ও সেতার ও সরোদে তালিম নিচেছন। ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁ সাহেব বাংলাদেশে সঙ্গীত চর্চার উপর একাধিক বই লিখেন। তার উল্লেখিত বইটি হলো 'সুর লহরী'।

এ প্রজন্মের শিল্পীদের সঙ্গীত চর্চা ও পরিবেশনার দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন সকল ধরনের শিল্পীকেই, প্রারম্ভে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেয়া ও নিয়মিত চর্চ্চা করা উচিত।

ওস্তাদ শেখসাদী খান (ব্রাহ্মন বাড়ীয়া)

সুর সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভ্রাতা ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ সাহেবের চতুর্থ পুত্র সেখ সাদী খাঁন (বেহালা)।সেখ সাদী খাঁন খুব ছোট বেলা থেকেই একটু সতন্ত্র ছিলেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ঘরানায় সরোদ, সেতার, সুরবাহার নিয়ে তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন ধ্রুপদী শিল্পী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁন (সরোদ), অন্নপূর্ণা দেবী (সেতার), জামাতা পন্ডিত রবি শংকর (সেতার), খুরশীদ খাঁন (সেতার), শাহাদাৎ হোসেন খাঁ (সরোদ),

Dhaka University Institutional Repository

মোবারক হোসেন খাঁন (সুর বাহার) ও ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁন সেতার ও সরোদ বাজিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু সেখ সাদী খাঁন ব্যতিক্রমর্ধী যন্ত্র বেহালা শেখার জন্য তালিম নেন। উল্লেখ থাকে যে, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন যে যন্ত্রটি বাজাতেন সে যন্ত্রটি মনে হতো তাঁরই যন্ত্র।সে ক্ষেত্রে শেখ সাদী খাঁন এই অনুপ্রেরণায় বেহালা শিখতে শুরু করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো এই বেহালা যন্ত্রটিতে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশনা বেশীদিন চালিয়ে যেতে পারলেন না। স্বভাবতই তাঁর শিল্পী স্বত্ত্বায় আঘাত হেনেছিল জীবন নির্বাহ করার এক দুশ্চিন্তা। কেননা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এসময়ে সাধারণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারছিল না। তিনি বেহালা হাতে লঘূ সঙ্গীতের সুর তুলে এবং বহু প্রতিষ্ঠিত গীতিকারের গানে সূরাপিত করে স্বনামধন্য সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে বর্তমানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'আমার এই দু'টি চোখ পাথরতো নয়'

- সুরকার শেখ সাদী খাঁন

শিল্পী সুবীর নন্দীর কণ্ঠে এ গানটি এ উপমহাদেশের শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। সেখ সাদীর সুরে বাংলাদেশের ও কোলকাতার যেসব গুনী শিল্পীরা গান গেয়েছেনঃ সুবীর নন্দী, রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, ফেরদৌসী রহমান, কুমার বিশ্বজিৎ সহ এ প্রজন্মেও অনেক

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীরা, কোলকাতার শিল্পীদের মধ্যে মান্না দে, সতীনাথ মূখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, মানবেন্দ্র মূখোপাধ্যায় ও কুমার সানু।

সুরকার সেখ সাদী বক্তব্যে জানা যায় রাগ সঙ্গীতকে আধুনিক গানে প্রয়োগ করতে গেলে রাগ সঙ্গীতে একটা পরিস্কার ধারনা থাকার দরকার আছে। সেখ সাদী যেহেতু সুর সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বংশীয়, সেক্ষেত্রে আধুনিক গানে সুর করতে গিয়ে গানের বানী ও সুরের একটা সুন্দর সমন্বয় করতে পেরেছেন। 'আমার এ'দুটি চোখ পাথরতো নয়' - এ গানে নট ভৈরব রাগের ব্যবহার দেখিয়েছেন। ওপার বাংলার গানের সুর ও বানীর সমন্বয়ে রাগ সংগীত অভিজ্ঞ শিল্পীগণ তাঁদের পরিবেশনায় দীর্ঘদিন শ্রোতাদের কাছে স্মরনীয় হয়ে আছেন। এ প্রশ্নের আলোকে সেখ সাদী মূল্যবান বক্তব্য হলো গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর দক্ষতার দ্বারাই সম্ভব এ ধরনের শিল্পকে সৃষ্টি করা। এ ধরনের শিল্পীর অভাব আমাদের দেশে খুব বেশী।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সকলে সঙ্গীতের ভিত্তিস্থল। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীরা ভিত (Root) শক্ত না করে সঙ্গীত পরিবেশনায় আসে। তাতে করে রাগাশ্রিত কারুকাজ সম্পন্ন আধুনিক গান করানো কঠিন হয়ে পড়ে। সব ধরনের শিল্পীদেরই উচিৎ রাগ সঙ্গীত প্রারম্ভেই শেখা ও নিয়মিত চর্চা করা।

সেখ সাদী খান বাংলাদেশ চলচিত্রের একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক। তিনি একাধিকবার চলচিত্র সঙ্গীত পরিচালনায়

Dhaka University Institutional Repository

পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে সঙ্গীতে অনার্স কোর্স ও গবেষনামূলক কাজের প্রসংশা করেন।

ওমর ফারুক

আমাদের দেশের অনেক বড় বড় শিল্পীরা জম্মগ্রহন করেছেন। সঙ্গীতে জগতে অনেকেই আমাদেরকে অনেক কিছু দান করে গেছেন। আমাদের দেশের মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় মহিয়ান করে রেখেছেন। আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এমনই একজন প্রগতিশীল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী তিনি একদিকে সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার এবং গ্রন্থ প্রণেতা। যার নাম ওমর ফারুক। তিনি বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গীত বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে অসীন রয়েছেন। নিম্নে তার সাথে বাংলাদেশের রাগ সংগীত চর্চার প্রক্ষাপটে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার নিয়ে কিছু কথোপকথোন উপস্থাপন করা হলো-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে গবেষনার যে মহতি উদ্যোগ নিয়েছে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাইলে বলেন গবেষনার ব্যাপারটাতো সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের দেশে বিশেষ করে রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে প্রচার ও প্রসারের লক্ষে এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রয়োজন সাংঘাতিক। এর কারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলো সকল সঙ্গীতের গুরু। উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রত্যেকটি শিল্পীর জন্য জানা অপরিহার্য। এর কারণ হলো উচচাঙ্গ উপকারিতার বিশ্লেষন করলে আমরা জেনে যাব।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখলে কণ্ঠ হয় বলিষ্ঠ, কণ্ঠের কারুকাজ হয় উন্নত। তাল লয় শিল্পীকে পাকাপোক্ত করে তোলে। গান গাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্বাসকে করে নিয়ন্ত্রিত। আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে। স্বরলিপি ও ঔপপত্তিক বিষয়কে করে সমৃদ্ধ। সবচাইতে বড় যে ব্যাপারটি করে সেটি হচ্ছে আমাদের রুচিকে করে উন্নত। রাগ সংগীত জানা শিল্পীদের সমাজে হয় সমাদৃত ও সম্মানিত।

উচ্চাঙ্গী সঙ্গীতের ভিত্তি যে শিল্পীর যত শক্ত সে শিল্পী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ততবেশী অবাধে বিচরণ করতে পারে। তবে শিল্পী যে ধরনের গানই করুক না কেন তাঁকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতে হবে।

আমাদের দেশে দেখেছি যারা নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক গান করে তারা নিদিষ্ট একটি সময়ের পর আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করেনা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন যদি কোন শিল্পী মনে করেন শুধু সারেগামা চর্চা করবে কিন্তু কোন রাগচর্চা করবে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সে কোন একটা রাগের আওতায় চর্চা করছে। তাই না জেনে করার চেয়ে জেনে করাটাই বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত দিক সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯৪৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। কলকাতায় তাঁর শৈশব কাল কেটেছে। শিয়ালদায় তিনি পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীতে সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। তার বড় খালা আশরাফী খানম তখনকার সময়ে সেখানে থাকতেন। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের তত্ত্বধানে টুইন কোম্পানিতে বার বৎসর বয়সী

Dhaka University Institutional Repository

কুমারী বেবী নামে এক শিল্পী কবির এলো ঐ পূর্ন শশী এবং পথিক বন্ধু এসো এসো এ দু'টি গান রেকর্ড করেন। সে সময়ে তিনি এই রেকর্ড বাজিয়ে শুনতেন। তাঁর মা গান শুনতেন, গান করতেন এবং রেকর্ড সংগ্রহ করতেন। ছোট খালা আফসারী খানম ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁনের কাছে গান শিখতেন। তখন তার বয়স দশ বৎসর।

উচচাঙ্গ সঙ্গীত তিনি না বুঝলেও উচচাঙ্গ সঙ্গীতের যে মূল্য আছে তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তখন তাঁর মা সেতার শিখতেন। তখন ওস্তাদ বলতেন "ইয়ে হায় সুর ভূপালী" তাছাড়া তার বড় খালা ওস্তাদ বালির কাছে গান শিখেছেন। উচচাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পারিবারিকভাবেই গড়ে ওঠেছে। তবে তার বাবার সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহ ছিল না এবং আপত্তিরও ছাপ পাওয়া যেতনা।

তাঁর সঙ্গীত জীবনের প্রথম গুরুকে এবং কার কার কাছে তালিম গ্রহন করেছেন জানতে চাইলে বলেন তাঁর প্রথম গুরু ওস্তাদ গফুর খাঁ। প্রথমত তাঁর বড়বোন ওস্তাদ গফুর খাঁর কাছে গান শিখতেন কিন্তু ধৈর্য ধরে শিখতে না পারায় তিনিই শিখতে শুরু করলেন। কাদের বক্স সাহেবের শিষ্য ছিলেন আবার ওস্তাদ গফুর খাঁ। তিনি খুব ভাল গান করতেন। তার কাছে ভূপালী ও বৃন্দাবনি সারং শিখেছেন। ওস্তাদ গফুর খাঁ কাছে দুই বছর তালিম নিয়েছেন। তারপরে তিনি আগ্রা ঘরনার ইউসুফ খাঁন কোরেশির নিকট তালিম গ্রহন করনে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘারানা সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন একটি দেশে বংশপরম্পরা ভাবে যে সঙ্গীত চর্চা হয়ে আসে তাকে ঘরানা বলা হয়। প্রত্যেক ঘরনার নিজস্ব একটা ঢঙ আছে, যা অন্যের সাথে মিলবে না।

বাংলাদেশের কোন ঘরনার প্রচলন আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, আসলে আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কোন ঘরনার ছাপ পাওয়া যায় না। আমরা সবাই মিশ্রভাবে গান বাজনা করি। তার গান শিক্ষার বয়স পঞ্চাশ দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে পুরো ষাট দশক গান শিখেন। কোরশির কাছে শিখার পর দীর্ঘদিন ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিনের কাছে গান শিখেছেন। তিনি তাঁর পরে গিরিজ শঙ্কর চক্রবর্তী এবং জামিনী গঙ্গোপাধ্যায় কাছে গান শিখেছে। ওমর ফারুক সাহেব ব্যবহারিক দিকগুলো তার (মুন্সী রইসউদ্দিন) এর কাছেই শিখেছেন। গাওয়ার ঢংঙ অনুসরন করতেন কোরশী সাহেবেরটা। তবে একাধিক ওস্তাদের কাছে শিখতে যাওয়ায় নির্দিষ্ট কোন ঘরনার ছাপ পাওয়া যায় না।

তাঁর পরিবেশনার ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন কলেজে পড়া অবস্থায় তিনি গান শিখেছেন। তার আগে তিনি প্রথম বেতারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন খেলা ঘরের মাধ্যমে। নটরডেম কলেজে পড়া অবস্থায় তিনি শিক্ষা সপ্তাহে উচচাঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন এবং সেখানে তিনি প্রথম হন। সেই প্রতিযোগিতায় বেতারের এ.আর.ডি নাজমুল আলম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে রেডিওতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব দিলেন। তাঁর পর তিনি ওস্তাদ রইসউদ্দিনের কাছে অনুমতি নিয়ে ১৯৬৪ সাল থেকে রেডিওতে গান করতে শুরু করেন।

রেডিওতে গান করা ছাড়া সুরকার হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। তাছাড়া রেডিওতে 'ক্যাজুয়াল প্রডিউচার' হিসাবে কাজ করেছেন। টেলিভিশনের জন্ম লগ্ন থেকেই তিনি টেলিভিশনের সাথে সম্পৃক্ত।

তার উল্লেখযোগ্য কিছু সুর করা গান সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি বলেন আব্দুল জব্বারের গাওয়া 'একটি মনের আশিস তুমি' এ গানটি 'ঘনিঝর' ছায়া ছবির গান। এই ছবিটির সংগীত পরিচালকও ছিলেন তিনি। এ ছাড়া নিনা হামিদের গাওয়া পল্লীগীতি "বনের পাখি ছাইরা বাসা"। তারপর সৈয়দ আব্দুল হাদির গাওয়া "অ তে অজগর" ফেরদৌসি রহমানের গাওয়া "বন্ধু এমনি কেন নিদয়া হইলারে" ঢেউ দিওনা জলে প্রাণসজনী।

ছাত্রছাত্রী কারা জানতে চাইলে বলে বন্ধু হলেও মাহমুদুনবী তার ছাত্র, আরতীধর, শামীমা ইয়াসমিন দিবা দুইবার নতুন কুড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন সে তার ছাত্রী। সুনিল কুমার মন্ডল।

আপনি কখন রেডিওতে প্রথম গান করেন তখন আর কারা কারা ভাল গান করতেন জানতে চাইলে বলেন খেলাঘরের মাধ্যমে রেডিওতে গান করেন। তখন ঘুরি বেগম নামে একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী রমজান আলী সাহেব সারেগী বাজাতেন লতাপাত হোসেন গুলমুহাম্মদ ওস্তাদ মাস্তান গামা মোহাম্মদ হোসেন খসরু

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদৌসী রহমান, জাহানারা বেগম, আবাআলম, প্রমুখ শিল্পীরা খুব ভাল গান পরিবেশন করতেন।

ধ্রুপদ গায়ক কেউ ছিল কিনা জানতে চাইলে বলেন মোহাম্মদ খসরু ও গোল মোহাম্মদ ধ্রুপদ গাইতেন। কিন্তু রেডিওতে টেভিতে কেউ গান করেনি।

যন্ত্র সঙ্গীতে কারা ছিলেন জানতে চাইলে বলেন মীর কাশেম খাঁ, ওস্তাদ আবেদ হোসেন খাঁ, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ, সেতার বাজাতেন। বেহালায় মতিমিয়া তবলায় ওস্তাদ শাখাওয়াৎ হোসেন খাঁন।

ওস্তাদ ওমর ফারুক উচ্চাঙ্গীতের উপর উপপত্তিক বিষয় সহ এবং ব্যবহারিক দিক দিয়ে ছোটদের উপযোগী করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যা আমাদের অনেক উপকার আসবে।

সর্বশেষে বাংলাভাষায় যে খেয়াল রচনা করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যুগে যুগে যারা রাগ সঙ্গীত চর্চা করেছেন তাদের মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তাহলে তারা বাংলাভাষা গাইবে। তবে হিন্দী ও উর্দু ভাষায় যে ভাবে খেয়ালকে প্রকাশ করা যায় কিন্তু সেভাবে সম্ভব নয়।

শ্রী পতিত পাবন নট্ট (বরিশাল)

আমাদের দেশের অনেক সঙ্গীত গুণী ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, যাঁদের সঙ্গীত-জীবন সম্বন্ধে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

জানি না। বরিশালের কৃতী সন্তান স্বরগীয় হিরন নট্ট (তবলা ও পাখোওয়াজ বাদক) তার কৃতী সন্তান পতিত পবন নট্টের সাথে তাঁর বাবার সঙ্গীত-জীবন নিয়ে নিম্নে আলোচনাটি তুলে ধরা হলো।

হিরন নট্ট ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১৯৮৫ সনের ১৬ই মার্চ তিনি ঝালকাটি পাঞ্জপুতী গ্রামে মৃত্যু বরন করেন। তাঁর বাবার নাম শষীভূষন নট্ট। তিনি নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। হিরন নট্ট তিনি যাত্রা দলে তবলা বাজাতেন। বয়স যখন সাত বৎসর তখন থেকে যাত্রা দলের সাথে সম্প্রক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানে বসে শিখেছেন। তখন ফোকরা গান গাওয়া হত এই গান ত্রিতাল, একতাল, চৌতাল ও ধামারে গাওয়া হত। তিনি একদিন এক গায়কের সাথে বাজাতে বসলেন। তখন গানে ও বাজনায় বিভেদ হল এবং তর্কাতর্কী হল। তখন তিনি বাসা থেকে পালিয়ে বেনারস চলে গেলেন তবলা শেখার জন্য। তখন কাশিতে বসে আনখির অল মিশ্রের কাছে চার বছর শিখেছেন। তার পর আবার চলে আসলেন কলকাতায়। সেখানে আজিম খাঁ নামক ওস্তাদের কাছে তালিম নেন। সেখানকার নাম ছিল ধর্মতলা, তিনি খুব বড় মাপের একজন ওস্তাদ ছিলেন। নয় মাত্রার নসরুখ তালটি তিনি আবিষ্কার করেছেন ২/২/২/৩ ছন্দের নিবদ্ধ এই তালে। হিরন নট্ট মহাশয়ের মনে ইচ্ছা তিনি একটু ভাল তবলা বাজাবেন। আনখি লাল মিসরের দিদিমা আবার খুব ভাল তবলা বাজাতেন। তখন তিনি (হিরন নট্ট) তবলার বায়ার কাজ তেমন ভাল ভাবে করতে পারতে না। তারপর তার (আনখি লাল মিশ্র) দিদিমা তাকে বায়ার কাজ শিখেয়ে দিতেন। আনুখি লাল

Dhaka University Institutional Repository

মিশ্রের কাছে চার বছর তালিম নেওয়ার পর দেখলেন, তখনকার দিনে খাঁ সাহেবদের বেশ নাম ছিল, যদি খাঁ সাহেবদের চরণ ধুলি না পাত্তয়া যেত তা না হলে বড় শিল্পী হওয়া যেত না। তাই তিনি ওস্তাদ আজিম খাঁ কাছে তবলায় তালিম নিলেন।

পতিত পবন নট্ট বার চৌদ্দ বছর বয়সে তার বাবার এই সুন্দর বাজনা গুলো শুনতেন। কিষান মিশ্র, বিশ্বজিৎ চট্রোপধ্যায় তারাপদ চক্রবর্তী এবং হিরন নট্ট এক সাথেই গান বাজনা করতেন। বেতারে কখনো তবলা বাজান নাই। তবে বিভিন্ন সম্মেলনে বাজিয়েছেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে এদেশে আসেন। তখন শশীভূষন নট্ট বয়সে বাড়ী হয়ে যাওয়ায় তখন হিরন নট্ট "নট্ট কোম্পানী" পরিচালনার ভাড় গ্রহন করেন।

তাঁর (হিরন নট্ট) তৈরী কোন ছাত্র আছে কিনা যানতে চাইলে বলেন সুনীল আচার্য্য বলে একজন ছিলেন এবং গিরিজ কুমার দাস আর কোলকাতার অনেকেই ছিল তাদের নাম জানা নেই। তিনি তবলার সাথে সাথে লালমোহন গোসাইয়ের কাছে পাখোয়াজ শিখেছেন। তার চার ছেলে পভিত পবন নট্ট শংকর নট্ট, সমীর বরন নট্ট ও শেখর চন্দ্র নট্ট। তার এক বোন খুলনা বেতারে নজরুল সংগীত করেন। ঝালকাঠি থানার পাঞ্জীপুত গ্রাম কীর্ত গোসাই লেনএ বসবসা করেন এবং তার বাবা হিরন নট্ট এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

ঢাকারতে বারীন মজুমদার(কন্ঠ) তাছাড়া বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সেতার বাজাতেন তাদের সাথে বেশ ভাল সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। ঘরনার দিক দিয়ে ওস্তাদ আজিম খাঁ ছিলেন দিল্লি ঘরনার এবং আনাখি লাল মিশ্র ছিলেন বেনারস ঘরনার। তাই দুই ঘরনার মিশ্রন হয়ে যায়, যার জন্য তার মধ্যে নিদিষ্ট কোন ঘরনার পরিলক্ষিত হয় না।

প্রখ্যাত তবলা বাদক রাধাকান্ত নন্দী তাদের (পতিত পবন নট্ট) আত্মীয়। তার আপন কাকার মেয়েকে রাধাকান্ত নন্দীর ছোট ভাই নীলকান্ত নন্দীর কাছে বিবাহ দেন। এইচ. এম.ভি একবার রেকর্ডিং এ তরুন রায়ের আধুনিক গানের সাথে তবলা বাজালেন রাধাকান্ত নন্দী। তখন তিনি (পতিত পবন নট্ট) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি খুব অসাধারণ তবলা বাজাতেন। যা অন্যান্য তবলা বাদকদের থেকে অন্যরকম ছিল। তাঁর কাছ থেকে কিছু তবলা বাজানো কৌশল জেনে নিয়েছিলেন তিনি ।

পতিত পবন নট্ট তার বাবার কাছেই তালিম নিয়েছেন। অন্য কারো কাছে তালিম নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন সঙ্গীতের ব্যাপারে ছোট হোক বা বড় হোক যার কাছে ভাল কিছু আছে সেগুলোই গ্রহন করা যায় । যারা গুণী তাদের কাছ থেকে সব সময়ই শেখার আছে। যেমন তাঁর ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ নট্ট সে বাংলাদেশ টিলিশিমনে নতুন কুড়ি প্রতিযোগিতায় একবার তবলা বাজানোতে দ্বিতীয় এবং জাতীয় শিশু প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাকে কোলকাতায় শংকর ঘোষের কাছে তবলা শিখানোর জন্য পাঠাই। সেখান থেকে সে ভাল আরি কুআরি এবং আরো ভাল কিছু শিখেছে, সেগুলোকে তিনি তার ছেলের কাছ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সংগ্রহ করেন। সে হিসাবেও তিনি (তার ছেলে) তার গুরু বলে মনে করেন।

পণ্ডিত পবন নট্ট এখন তাঁর বয়স চুয়ান্ন বছর। তার কোন ছাত্র আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, খুলনা বেতারে চারজন ষ্টফ তবলা বাদক তাঁর ছাত্র যেমন ঃজগন্নাথ চক্রবতী, জয়দেব চক্রবর্তী' গোলক চন্দ্র রায় এবং দীপক চন্দ্র দাস । তবলা ছাড়া আর কি যন্ত্র বাজান জানতে চাইলে বলেন, তবলা ছাড়া তিনি পাখোয়াজ বাজান। তবলা ও পাখোয়াজের মধ্যে কোনটা বাজাতে বেশি পছন্দ করেন। তিনি বললেন পাখোয়াজই তার সবচাইতে বেশী ভাল লাগে। বর্তমানে পাখোয়াজ বাজান এমন কেউ আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, আমাদের সমসাময়ীক কালে তেমন কেউ ছিল কিনা তা তাদের জানা নেই তবে বর্তমানে অনেকে ভারত থেকে পাখোয়াজ শিখে এদেশে আসছেন।

রেডিও ও টেলিভিশনে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের জন্য যে সময়টা দেওয়া হয় সেটা কি যথাযথ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে টিভি এবং রেডিওতে আরো বেশী সময় দেত্তয়া উচিৎ। তাছাড়া সময়ের অভাবে সঠিক ভাবে কোন কিছু প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়ীকতার প্রবনতাটাই বেশী। আমি জন্মসূত্রে একজন হিন্দু। বাবা বলতেন পশ্চিমাদের আর্শিবাদ পুষ্ট না হয়ে কেউ আজ পর্যন্ত বড় হতে পারেনি। যার জন্য আমাদের দেশে বড় মাপের ওস্তাদ কেউ হয়ে উঠেতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

তার ভাই শংকর নট্ট, বাংলাদেশ বেতারে তবলা বাজান। তার ছেলে কজন জানতে চাইলে বলেন, তিন ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলে তারক নট্ট, তারপরে বিদ্যুৎ নট্ট, এবং ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ নট্ট।

তিনি বেতার তবলা বাজন কিনা জানতে চাইলে বলেন তিনি বরিশাল বেতারে পাখোয়াজ, তবলা ও ঠুমরী পরিবেশন করেন। যদিও তিনি তবলা বাজান কিন্তু প্রথমে গান শিখেন। তার বাবা বললেন, যে তবলা তো বেশ কঠিন পরিশ্রম তুমি তবলা না শিখে গান শিখ। তিনি তখন গান শিখলেন হেমন্ত কুমার সিং এর কাছে। তিনি আবার ধ্রুপদ গাইতেন। বড় কর্তা (শোচন দেব বর্মম)এর শিষ্য। তার গলার সমস্যার জন্য তিনি গানকে তেমনভাবে ধরে রাখতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ সঙ্গীতে যে অনার্স, মাষ্টার্স এবং সঙ্গীত বিষয়ে গবেষনার উদ্দ্যেগ নিয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন এউদ্যোগ খুবই ভাল হয়েছে এবং আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা সঙ্গীতে খুব ভাল করার সুযোগ পাবে বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অবস্থা জানতে চাইলে বলেন গান এবং বাজনার মূল ধারা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখনকার দিনে কেউ চর্চা করতে চায় না। গানের এবং গুণী শিল্পীদের কোন কদর এদেশে নেই। দুঃখ করে বললেন আমরাতো গ্রামেই। গ্রামে বসে আমরা বিভিন্ন ভাবে অবহেলিত

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছি। আমাদের মত যারা অবহেলিত হচ্ছে তাদেরকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান সময়ে সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত ব্যবস্থা করার অনুরোধ রাখছি।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী রিনাত ফৌজিয়া (সেতার বাদক)

রিনাত ফৌজিয়া ওস্তাদ মোবারক হোসেন খাঁন সাহেবের একমাত্র কন্যা ওস্তাদ আয়াত আলী খান সাহেবের নাতনী। মহিলা সেতার বাদক হিসেবে এ প্রজন্মে রিনাত ফৌজিয়ার সেতার পরিবেশনা উল্লেখযোগ্য।

তিনি ওস্তাদ খুরশীদ খাঁন সাহেবের কাছে তালিম নেন। অবশ্য তার বাবা মোবারক হোসেন খান সাহেবের অনিচছা সত্ত্বেও সেতারে তালিম নেন। তিনি তার একমাত্র পুত্রকেও সেতার যন্ত্রটি শেখানোর ইচছা প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

'বাংলাদেশে রাগ-সঙ্গীত চর্চা' (১৮৫০-১৯৯০) শিরোনামে এসময়ের বহু পূর্বে চর্যাগীতি, গীতগবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, মঙ্গল কাব্য ও শাক্ত পদাবলীতে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে রাগের ব্যবহার দেখা যায়। সেই জন্যে বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চা (১৮৫০-১৯৯০) আলোচনার সুবিধার্থে রাগ সঙ্গীতের প্রাচীণ যুগটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই শিরোনামে গবেষনামূলক কাজটি মূলতঃ জটিল। সর্বোপরি বাংলাদেশ নামে যে ভূখন্ড তা ১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দেশ বিভাগের পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান নামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত ছিল।

১৯৭১ সালের অসম রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালী পেল বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ড। ভৌগোলিক দিক থেকে এ ভূখন্ডে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতো। তাতে করে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চা ব্যাহত হতো। কেননা সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশের দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা প্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করে আসছে। সেক্ষেত্রে প্রাচীন রাগের মধ্যে 'বঙ্গাল রাগটি'র নিদর্শন উল্লেখযোগ্য।

বাঙালীর নব জাগরনের পথিকৃৎ, রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), রঘুনাথ রায়, রামশংকর ভট্টাচার্য ও রামমোহন রায় এই চার জন প্রতিভাধর বাংলা সঙ্গীতের সাথে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সমন্বয়ে ঘটান। যার ফলশ্রুতিতে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে একটি 'ঘরানা' উল্লেখ আছে।

১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি হলে জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রটি সীমিত হয়ে পড়ে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যায় জড়িত হন। তাতে করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা প্রসারের ক্ষেত্রে এক বিরাট বাঁধা আসে। তা সত্বেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা থেমে থাকেনি।

সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (ব্রাহ্মনবাড়িয়া) বাংলাদেশের ভাব মূর্তিকে ভারতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলী আকবর খাঁ, জামাতা রবি শংকর সেতার ও সরোদ যন্ত্রটি বাজিয়ে বিশ্বে ভারতীয় সঙ্গীতের মাহাত্ম ও গুরুত্ব সুচারুরূপে উপস্থাপন করেন। তাতে করে এই উপমহাদেশের অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বের দরবারে আর্থিক সচছলতা ও সুনামের প্রতিষ্ঠা পাচেছন।

Dhaka University Institutional Repository

'ঘরানা' শব্দটি থেকে বোঝা যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের নিজস্ব ঘরকে। আগ্রা ঘরানা, রঙ্গিলা ভরানা, ফরুখাবাদ ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, কিরানা ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা ও পাতিয়ালা ঘরানা- এমনি সব ঘরের ওস্তাদগণ নিজস্ব ঘরের বাইরে নয়। অর্থাৎ বংশের ভিতরেই সঙ্গীতে তালিম দেওয়া ব্যাপরটিতে সীমাবদ্ধ রাখতেন। সেক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর বংশের বাইরে (রক্ত সম্পর্ক ছাড়া) প্রতিভাবান শিল্পীদের তালিম দিয়েছেন। জামাতা পন্ডিত রবিশংকর, নিখিল ব্যানার্জীর মত শিল্পীদেরও তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে তথা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্তমানকালে এ 'ঘরানা' পদ্ধতি বিলুপ্তির পথে। কেননা প্রতিষ্ঠিত অনেক ওস্তাদদের সঙ্গীত পরিবেশনায় 'মিশ্র ঘরানার' প্রভাব দেখা যায়। গুরুমূখী সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে ১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পথে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত সম্মেলনে, 'বেতার ও টেলিভিশনে' সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। তাতে করে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের রাগরূপ ও ভাবের ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু 'কম্পিউটার যুগে' সঙ্গীত শ্রোতাদের সঙ্গীত শ্রবণে অস্থিরতা, যা দীর্ঘ সময় নিয়ে রাগ সঙ্গীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে শিল্পীরা বাধাগ্রস্থ হন। এ সকল অসুবিধা এ ব্যস্ততম যুগে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন সময়ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে সুবিধা। তাই কোর্স পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীগন শিক্ষা নিতে বেশী আগ্রহী হন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ বারীন মজুমদার এই চিন্তা চেতনা নিয়েই সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দানে আগ্রহী ছিলেন!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ বর্তমান যুগের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির আলোকে সঙ্গীতে অনার্স ও গবেষণামূলক কোর্স চালু করেছেন। তাতে করে সঙ্গীত শিল্পীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রটি বিস্তৃতি লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ

একবিংশ শতাব্দীর পূর্বে, ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন রাজা-বাদশা ও জমিদারগন, পরে গণমাধ্যম ও জনসাধারণের উপর শিল্পীরা নির্ভরশীল হওয়ায় সঙ্গীতে প্রচার ও প্রসার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন।

সর্বোপরি ‘ঘরানা’ ব্যাপারটি ‘মিশ্র ঘরানায়’ পরিণত হয়েছে। কেননা বর্তমানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনায় বিভিন্ন ঘরানার প্রভাব দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

ক্রঃ নং	বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	সঙ্গীত মালিকা	মোবারক হোসেন খান	ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮	মোঃ ইব্রাহীম পরিচালক, বাংলা একাডেমী
২.	বাংলা গানের ধারা	ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী	মার্চ-১৯৯৩	আল মাহামুদ পরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা - একাডেমী
৩.	আলাউদ্দিন খাঁঃ জীবন সাধনা ও শিল্প	অরুন কুমার বসু কঙ্কন ভট্টাচার্য	জানুয়ারী-১৯৮৯	সনৎ কুমার চট্টপাধ্যায়, সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৪.	চর্যাগীতি প্রসঙ্গ	সৈয়দ আলী আহসান	ডিসেম্বর-১৯৮৫	কামরুজ্জামান খাঁন, পরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৫.	কীর্তন খগেন্দ্র নাথ মিত্র	খগেন্দ্র নাথ মিত্র	বৈশাখ - ১৩৮৯	শ্রী জগদানিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্ব ভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭
৬.	ধ্যান শান্তি আনন্দ	রামকৃষ্ণ সংঘের সন্যাসীবৃন্দ	মে-১৯৯৩ ষষ্ঠ সংস্করণ	স্বামী সত্যব্রতানন্দ ১ উদ্বোধন লেন বাগ বাজার, কলিকাতা- ০০০০৩

Dhaka University Institutional Repository

৭.	সঙ্গীত দর্পন	মোবারক হোসেন খাঁন	জুন-১৯৯৯	গোলাম মঈন উদ্দিন, পরিচালক, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।
৮.	বাঙ্গালী রাগ সঙ্গীত চর্চা	দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৭৬ ইং	ফার্মা কে.এম এল, (প্রাঃ)লিঃ ২৫৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা।
৯.	বাংলা গানের বিবর্তন প্রথম খন্ড	ডঃ করুনাময় গোস্বামী	জুন-১৯৯৩	গোলাম মঈন উদ্দিন পরিচালক পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১০.	গঙ্গীতকোষ	ডঃ করুনাময় গোস্বামী	ফেব্রুয়ারী-১৯৮৫	মোঃ ইব্রাহিম পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।
১১.	হিন্দুস্তানী সঙ্গীত পদ্ধতি নবম খন্ড	পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ন ভাতখন্ডে	পৌষ ১৩৯৮বাংলা	রেনুকা সাহা ২০ কেশব সেনস্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০০৯
১২.	পূববাংলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা	অজয় সিংহ রায়	জানুয়ারী-১৯৯৬	প্রিয়ব্রত দেব প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ ৭ জহর লাল নেহেরু রোড, কলিকাতা- ৭০০০১৩

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	একুশের স্মারক গ্রন্থ'৯৭	আশফাক-উল-আলম ও প্রমুখ	জুন-১৯৯৭	আশফাক-উল-আলম পরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৪.	আবহমান বাংলা	মুস্তফা নুরউল ইসলাম	ফেব্রুয়ারী-১৯৯৩	মোঃ আমিনুল হক ভবন ৪২, সড়ক ১ বনানী, ঢাকা।
১৫.	গানের ঝরনাতলায়	মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী	ফেব্রুয়ারী-১৯৯৭	অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা।
১৬.	শ্রুতিনন্দন	অজয় চক্রবর্তী	জুলাই-১৯৯৯	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।
১৭.	ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলী	মোবারক হোসেন খাঁন	মার্চ-১৯৮৪	আল মাহামুদ ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
১৮.	কুদ্‌রত্ রঙ্গি বিরঙ্গী	কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বৈশাখ-১৪০৪	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কোলকাতা- ৭০০০০৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯.	মজলিশ	কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	জানুয়ারী- ১৯৯৭	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কোলকাতা- ৭০০০০৯
২০.	সঙ্গীত চিন্তা	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	বাংলা- ১৩৭৩	শ্রী জগদদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা- ১৭
২১.	শিল্পকলা ষান্মাষিক বাংলা পত্রিকা	আজাদ রহমান	জুন- ১৯৯৯	আখতারুন্নেছা পরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
২২.	দেশ পত্রিকা	৫১ সংখ্যা ৫৬ বর্ষ	২৮অক্টোবর ১৯৮৯	সাগরময় ঘোষ আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০০১
২৩.	দেশ পত্রিকা	১৪ সংখ্যা ৬৬ বর্ষ	মে- ১৯৯৯	সাগরময় ঘোষ আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০০১
২৪.	শারদীয়া মনোরমা	প্রতিভা বসু প্রমুখ	১৪০৫ বাংলা	দীপক মিত্র প্রকাশনা লিঃ ২৮১ মুনিগঞ্জ, এলাহাবাদ- ২১১০০৩

Dhaka University Institutional Repository

২৫.	সুন্দরম্ ত্রৈমাসিক পত্রিকা	মুস্তফা নূরউল ইসলাম	গীত সংখ্যা ১৪০৩	প্যাপিরাস ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহ্বাগ, ঢাকা।
২৬.	বেতার বাংলা	ফজল এ খোদা	১-১৫ অদ্র ১৪০৩	বেতার বাংলা বেতার প্রকাশনা দপ্তর, ১২১,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ , ঢাকা।
২৭.	সানন্দা মাসিক পত্রিকা	সম্পাদনায় অর্পনা সেন	২৬ মে ১৯৯৫	আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
২৮.	সানন্দা	সম্পাদনায় অর্পনা সেন	বার্ষিক সংখ্যা	আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
২৯.	ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি	সুকুমার রায়	২য় মুদ্রন ১৯৮৮	ফার্মা কে.এম. এল প্রাঃ লিঃ ২৫৭ বি বিপনি বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০১২
৩০.	রাগ সঙ্গীতের ইতিহাস	গোলাম মোস্তফা	মে-১৯৭৮	রাবিয়া মোস্তফা ২/ই-১ গভঃ ষ্টাফ -কোয়ার্টার গ্রীন রোড, ঢাকা- ৫

Dhaka University Institutional Repository

৩১.	শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠী	সম্পাদনায় শফিউর রহমান	২৪ তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন	৪৪/৫ লেক সার্কাস নীচতলা, কলাবাগান, ঢাকা- ১২০৫
৩২.	গুনীজন সম্মাননা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উৎসব ৯৯	সম্পাদকঃ ডঃ তসিকুল ইসলাম রাজা	এপ্রিল- ১৯৯৯	ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন স্মৃতি সংসদ রাজশাহী
৩৩.	ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন স্মৃতি পদক- ৯৮	সম্পাদকঃ ডঃ তসিকুল ইসলাম রাজা	ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৮	কানুমোহন গোস্বামী ষষ্ঠীতলা, রাজশাহী।
৩৪.	২২তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন- ১৯৯৭	শুদ্ধসংগীত প্রসারগোষ্ঠী	জানুয়ারী- ১৯৯৭	সম্পাদক শফিউর রহমান
৩৫.	২৪তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন- ১৯৯৯	শুদ্ধসংগীত প্রসারগোষ্ঠী	জানুয়ারী- ১৯৯৯	সম্পাদক শফিউর রহমান
৩৬.	২৩ তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন- ১৯৯৭	শুদ্ধসংগীত প্রসারগোষ্ঠী	ডিসেম্বর- ১৯৯৭	সম্পাদক শফিউর রহমান
৩৭.	দ্বিশততম অনুষ্ঠান পূর্তি উপলক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উৎসব	শুদ্ধসংগীত প্রসারগোষ্ঠী	জানুয়ারী- ১৯৯৪	সম্পাদক শফিউর রহমান